রাজনারায়ণের কলকাতা

অমরেন্দ্র দাস

সম্পাদনায়—শ্রীমতী শিউলি দাস

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা—৭০০০০৯

"Ambition, the desire of active Souls
That pushes them beyond the bound
of Nature
And elevates the Hero to the Gods"

সম্পাদিকার ভূমিকা

বিশেষ তথ্যবহুল গবেষণামূলক গ্রন্থে ভূমিকা লেখার রেওয়াজ চিরকাল চলে আসছে, এ গ্রন্থও সেই পর্যায়ভুক্ত। আর সেই গ্রন্থের সম্পাদনা ও ভূমিকা লেখার গুরুদায়িত্ব আমায় দেওয়া হয়েছে। লেখালেখির ব্যাপারে চিরকালই একটা আলসেমি পেয়ে বসে, তার ওপর প্রাচীন কলকাতার ওপর এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ। প্রাচীন কলকাতার ওপর অনেক বই এ পর্যন্ত বেরিয়েছে তার কিছু কিছু পড়ার সৌভাগ্য এই লেখিকার হয়েছে। যে গ্রন্থ সম্পাদনা করলাম, তার প্রায় সব লেখাগুলিই সম্পূর্ণ নূতন, আর যিনি এর প্রতিটি লেখা লিখেছেন তাঁর অধাঙ্গিনী হিসাবে পাশে পাশে থেকে বহু তথ্য ও বিষয় অন্বেষণে কখনও গ্রন্থাগারে, কখনও পথের নিশানা ঠিক করতে সঙ্গে গিয়েছি। তখন দেখেছি লেখকের একটু তথ্য সংগ্রহের জন্যে কি অনলস পরিশ্রম, যেন মনে হয়েছে প্রাচীন কলকাতার সেই অতীত কাহিনী পুরোপুরি সংগ্রহ না করতে পারলে তাঁর লেখা সম্পূর্ণ হবে না, ফাঁক থেকে যাবে। আর তারও প্রমাণ পেয়েছি যখন লেখাটি কোন পত্রিকায় বেরিয়েছে। ভূরি ভূরি প্রশংসায় কান পাতা যায়নি। লেখকের দিকে তাকিয়ে আমার গর্বে বুক ফুলে উঠেছে।

সেই গ্রন্থের আজ ভূমিকা লিখতে বসেছি। এতে আমার ভূমিকা খুবই নগণ্য। এ গুরু দায়িত্ব লেখক ও প্রকাশক দুজনে মিলে আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এ দায়িত্বের বোঝা যে কত ভয়াবহ সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

আনাড়ীর হাতে যেমন বাদ্যযন্ত্র তুলে দিলে সে বাদ্যযন্ত্রের যেমন নাকাল হয়, এই গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে আমারও তদরূপ অবস্থা হয়েছে। লেখাগুলির গুরুত্ব বিবেচনায় সাজানো একটা প্রধান কাজ ছিল, সে কাজ ছাপার পর মনে পড়ল, আর লেখকও আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিলেন না। সম্পাদক যখন পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তাঁর যে কি দায়িত্ব এ বই সম্পাদনা করতে গিয়ে তা উপলব্ধি করেছি।

বর্তমানের কলকাতায় বসে সেকালের কলকাতা যেন শুধু বিস্ময়ই জাগায়, কি ছিল আর কি হয়েছে? পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। এই গ্রন্থের লেখাগুলি ও তৎসংলগ্ন চিত্রগুলি আমাকে বার বার বিস্ময় জাগিয়েছে, কত

দ্রুতই এ শহর বদলে গেছে। আজকের রূপসী, যৌবনবতী, সালংকারা, লাবণ্যময়ী কলকাতা যেন বেশি দিন তার দুঃস্থ অবস্থা ভোগ করে নি। অবশ্য এর জন্যে ঋণী আমরা ইংরেজের কাছে। ইংরেজ সেদিন যদি একবারও ঘুনাক্ষরে জানত, একদিন তাদের এই বিশিষ্ট শহর ছেড়ে চিরজীবনের জন্যে বিদায় নিতে হবে, তাহলে হয়ত কলকাতা উন্নয়নের জন্যে এতো তৎপর হত না। সবই ভাগ্য! যে বৃটিশ সূর্য কখনও অস্ত যেত না, সেই বৃটিশ সূর্য আজ অস্তমিত। সবই কালের খেয়াল! এর জন্যে আক্ষেপ করলে হবে না।

আমরা আজ পরাধীনতার নাগপাশ মুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়েছি কিন্তু এই স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে কম লড়াই করি নি। আজ দেশ স্বাধীন কিন্তু ইতিহাস তো হারিয়ে যায় নি? লড়াইয়ের সেই ইতিহাস এই কলকাতার বুকে ভুরি ভুরি আছে। সেই ইতিহাসেরই কিছু টুকরোর সন্ধানে এ গ্রন্থ কাজ করেছে। এমন অনেক নিদর্শন চোখে পড়ে যা কেন কি, কি জন্যে এখানে আছে, এসব প্রশ্নের উদয় হয়। লেখকের অনুসন্ধিৎসা সেই নিদর্শনের ওপর আলোকপাত করেছে। যেমন 'একটি মসজিদের কথা' লেখার মধ্যে অধুনা সুবোধ মলিক স্কোয়ার আগে যার নাম ওয়েলিংটন স্কোয়ার ছিল, সেখানে একটি মসজিদ আছে। কেন এই মসজিদ? পথচারী চলতে চলতে কি এ কথা ভাবেন না? সেই ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে উক্ত লেখাটি। 'ডিঙা ভাঙা লেন'। কোথায় ছিল এই লেন? পৌর প্রতিষ্ঠান আজও অনেক পথের নাম পালটাচ্ছেন, একদিন এগুলিও হবে ইতিহাস। ক্রীক নামটা কেন হল? ক্রীক মানে খাল। ক্রীক রো'য় খাল ছিল এ যে ভাবা যায় না। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের পূর্ববর্তী নাম রাণী মুদিনীর গলি ছিল। রাণী মুদিনী নাম কেন হল? ইংরেজরা হঠাৎ রাণী মুদিনীর ওপর প্রসন্ন হল কেন? উপন্যাসের মত এক রোমান্সের কাহিনী ইঙ্গিত করে। প্রবন্ধ যাঁরা রচনা করেন তাঁরা এ সব গল্পকথার ধার ধারেন না কিন্তু লেখকের কলম ও দৃষ্টিভঙ্গি এমনই ব্যতিক্রম যে প্রাচীন কলকাতার তথ্য ভারাক্রান্ত লেখনী হলেও সরস কলমের গুণে ও বলার ভঙ্গিতে গল্প পড়ার মেজাজ এনে দেয়।

রসা রোড দিয়ে আমরা সবাই যাই কিন্তু রসা পাগলা ডাকাতের কথা কি একবারও ভাবি? সেই রসা পাগলা ডাকাত ইংরেজের কাছে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। একটা কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এই চালাক জাত ইংরেজ এদেশের লোককে দুরকম ভাবে শায়েস্তা করত, দুর্বলকে বেত্রাঘাত ও সবলকে স্তুতি। দুজনেই বশ হয়ে যেত।

এ তো গেল পথের প্রসঙ্গে এ গ্রন্থের বর্ণনা। তাছাড়া আছে আরও উল্লেখ যোগ্য রচনা, ট্রামের তিন পর্যায়। এই লেখাটি লিখতে তৎকালীন ইংলিশম্যান পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগারের এসপ্লানেড পত্রিকা বিভাগে পত্রিকা ঘাঁটাঘাটির সময়ে এই লেখিকা লেখকের সঙ্গে ছিল, ১৮৭৩ সালের ইংলিশম্যান পত্রিকা দেখতে গিয়ে পত্রিকার কপিগুলি শেষ স্পর্শে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। পত্রিকার গ্রন্থ-গারিককে বলতে শোনা গেল, আপনার কাজ হয়েছে তো, ও চুলোয় যাক্। এমনি কত টুকরো টুকরো ঘটনা। ট্রামের জন্ম ইতিহাস লেখা হবে শুনে ট্রাম কোম্পানীর পাবলিক রিলেশন অফিসার যেন লাফিয়ে উঠলেন, মশাই আমাদের কোন জন্ম ইতিহাস নেই, লিখুন, লিখুন। তাঁরা যেটুকু পারলেন সাহায্য করলেন। তবে সে সাহায্য এত সামান্য যে সমুদ্রে একফোঁটা আতরের মতই মনে হয়।

আরও অনেক নতুন ধরণের লেখা এ গ্রন্থে আছে। এ দেশে কবে ফোটোগ্রাফি এল। ফুটপাতের আত্মকাহিনী, নিমতলার ঘাট, কড়ি থেকে কবে টাকা হল, সাঁ-খুশী থিয়েটার ও মিসেস লীয়ের কাহিনী, সে যুগে ইংরেজ প্রধানরা নারী নিয়ে কেমন হাঙ্গামায় পড়ত এবং তার খেসারত আদালতে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা দিত। সে যুগে পঞ্চাশ হাজার টাকা কম টাকা নয়। ইংরেজের বিলাসের আর একটি অঙ্গ হিসাবে ভৃত্যবিলাসের বর্ণনা। খানসামা, জমাদার, খিদমতগার, হুক্কাবরদার। এদের ছবিও এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ছবির প্রসঙ্গে এলে এই বলতে হয়, বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড কোম্পানী প্রায় লেখার ছবি দিয়ে লেখককে সাহায্য করেছেন। সাহায্য ও উৎসাহ অনেকেই দিয়েছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, যুগান্তর পত্রিকার সাময়িক সম্পাদক খ্যাতিমান লেখক শ্রীপরিমল গোস্বামী, তিনি নানাভাবে সাহায্য ও লেখাগুলির প্রায় সাময়িকীর পাতায় না ছাপলে লেখক উৎসাহিত হয়ে হয়ত লিখতেন না। এরকম সাহায্য আনন্দবাজার পত্রিকার সাময়িকী সম্পাদক খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীরমাপদ চৌধুরী, বসুধারার শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী, জনসেবকের শ্রীশান্তি কুমার মিত্র এ ছাড়া অমৃত বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব ম্যাগাজিন আরও অনেক পত্রিকা এর জন্যে স্মর্তব্য। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

লেখাগুলির সবই দশ বারো পনেরো বছর ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার আশু ইচ্ছা থাকলেও নানা

কারণে তা আড়ালে থেকে গিয়েছিল। বার বার লেখককে সে সম্বন্ধে স্মরণ করালেও সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এমন কতকগুলি লেখা পাঠকের আড়ালে থেকে যাচ্ছে এটা এই লেখিকার কিছুতেই মনঃপুত হচ্ছিল না, একরকম এই লেখিকার তারাতেই ও বর্ণালীর প্রকাশক শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষের দর্শনেই এই গ্রন্থ প্রকাশ হল। আর সম্পাদনা আমাকেই করতে হল। এ গ্রন্থের লেখাগুলির যে ক্ষমতা তার এক কানাকড়ি যদি এই সম্পাদিকার থাকত তাহলে হয়ত সে ধন্য হয়ে যেত। তবে সে পরোক্ষভাবে ধন্য এ গ্রন্থ সম্পাদনা করে। অপরিণত হাতে যেটুকু ভুলত্রুটি হল সে সম্পাদিকার প্রাপ্য তবে প্রুফের ভুল ও ছাপার ব্যাপারটির জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী প্রুফ রীডার আশা করি এ গ্রন্থ অনুসন্ধানী ও গবেষকদের তথ্য সংগ্রহে প্রচুর সাহায্য করবে, ও রসজ্ঞ পাঠককে করবে খুশি।

'রাজনারায়ণের কলকাতা' এই নাম দেওয়ার তাৎপর্য সে যুগে রাজনারায়ণ বসুকে Grand father of Indian Nationalism বলা হত। সে সময়ের কলকাতারই নানান কাহিনী। তাই রাজনারায়ণ বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতার দানস্বরূপ এই নাম রাখা হল।

আমরাও তো চিরকালই ভোলার জাত। অর্থাৎ মনে প্রাণে ভাবপ্রবণ। যখন যাকে নিয়ে নাচি, নাচি। যখন যা নিয়ে নাচি, নাচি। তারপর ভুলে যাই। রাজনারায়ণ বসুর প্রসঙ্গেই এ কথা এসে গেল। এই রাজনারায়ণ বসুর কথা বিপ্লবের ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে অনেকের ভীড়ে পেয়ে যাই কিন্তু আমরা কি জানি, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন ঘোষের মধ্যে বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন এই রাজনারায়ণ বসু? ওঁরা তাঁর দৌহিত্র। এই রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুরে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় জাতীয় গৌরবেচ্ছা সম্পাদনা সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের চাকরী ছেড়ে মেদিনীপুরে সরকারী জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন সুরা নিবারণী সভা। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণে গগনেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, নবগোপাল মিত্রের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বাদেশিকদের সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বছরেই নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠা করেন প্যাটিয়টল এসোসিয়েশন তাতে সাহায্য করেন রাজনারায়ণ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেইজন্যে তার প্রতি দেশবাসী হিসাবে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গ্রন্থের নাম দিয়ে তাঁর কৃতী জীবনের

প্রতি শ্রদ্ধা জানান হল। আশা করি সুধী পাঠকও জানাবেন। রাজনারায়ণ বসুর ওপর ব্যাপক কিছু লেখা হোক লেখকদের কাছে জানালাম প্রার্থনা। নমস্কারান্তে সম্পাদিকা—

শিউলি দাস।

১৮।২।৭৬

কলকাতা-১৪

যে সব নিবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে : পৃষ্ঠা

যে সব চিত্র এতে স্থান পেয়েছে ঃ

কালীঘাটের গঙ্গা। এপারে চেতলা, ওপারে কালীঘাট। কালীঘাটের এ পুল আজ আর নেই। নিবন্ধ: কালীঘাটের ঘর সংসার দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৪৪। ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় তখন জেনারেল পোষ্টাফিস তৈরি হচ্ছে। লাটভবন দাঁড়িয়ে আছে। হাইকোর্ট বাড়ী তখন হয়নি। রেড রোড তখন সরম্যানস্ ব্রীজ।

ফোটো : বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

ঘোড়ার ট্রাম, স্টীম ট্রাম তখন এসেছে। চিত্রে তা দেখা যাচ্ছে। ১৮৭১ সালের পরের এসপ্লানেড। সেদিন কে. সি. দাসের দোকান ছিল না কিন্তু এসপ্লানেডে পুকুর ছিল। পুকুরের জল খেত সাহেবরা। ধর্মতলা স্ট্রীটের শুরুতে একটু লক্ষ্য করলে টিপু সুলতানের ছেলে গোলাম মহম্মদের মসজিদটা দেখা যায়। কিন্তু ধর্মতলা ষ্ট্রীট কি দেখা যাচ্ছে? নিবন্ধ: ধর্মতলার ঐতিহ্য দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ২৯।

ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড সৌজন্যে।

আজকের ওল্ড কোর্ট হাউস আর সেদিনের ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট চেনাই যায় না।

ফোটো : বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।
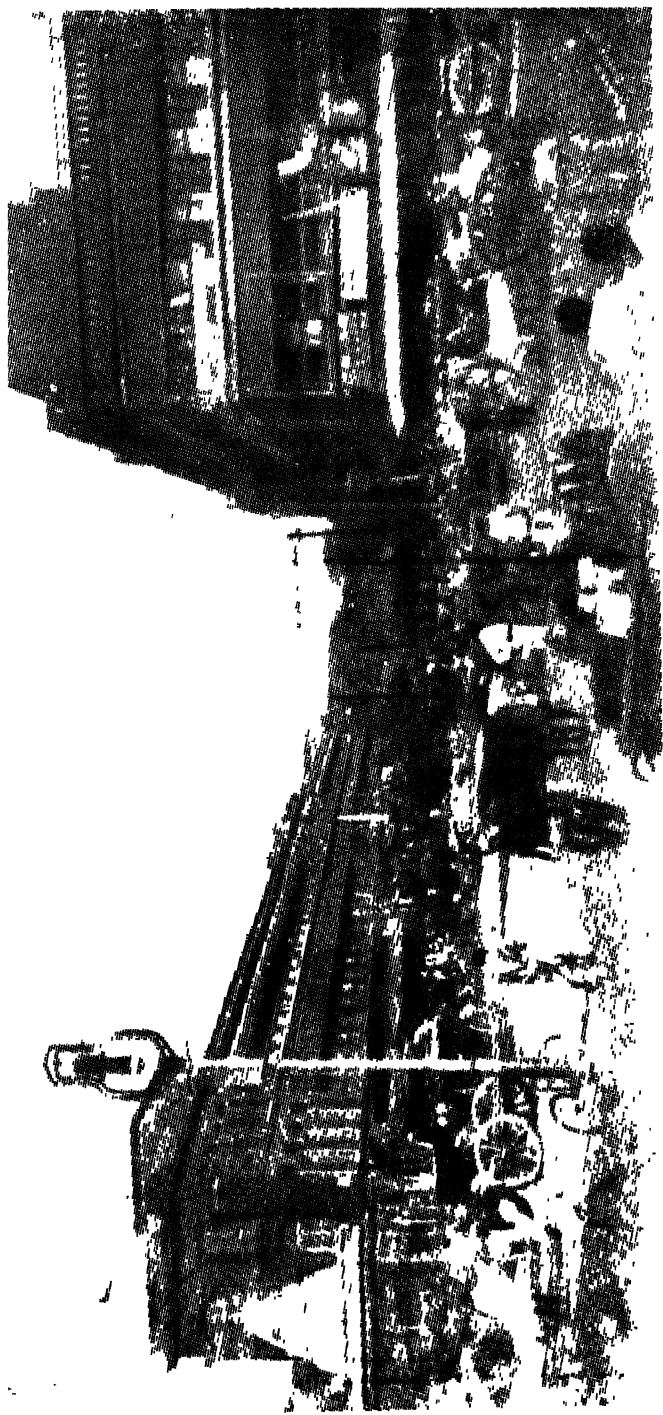
আজকের মহাত্মা গান্ধী রোড। সেদিনের হ্যারিসন রোড। এই হ্যারিসন রোডেই প্রথম ইলেকট্রিসিটি এসেছিল। চিত্রটি বড় বাজারের শেষ, হাওড়া ব্রীজের সামনে। দেখা যাচ্ছে পাল্কী, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ট্রাফিক পুলিশও দেখা যাচ্ছে কিন্তু মোটর গাড়ী নেই। অন্ধকার পেরিয়ে আলো দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১নং

ফোটো : বোন অ্যাণ্ড শেফাডের সৌজন্যে।

এসপ্লানেডের পুকুর। তখনও কলকাতায় অনেক বাড়ী হয়ে গেছে।
ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।
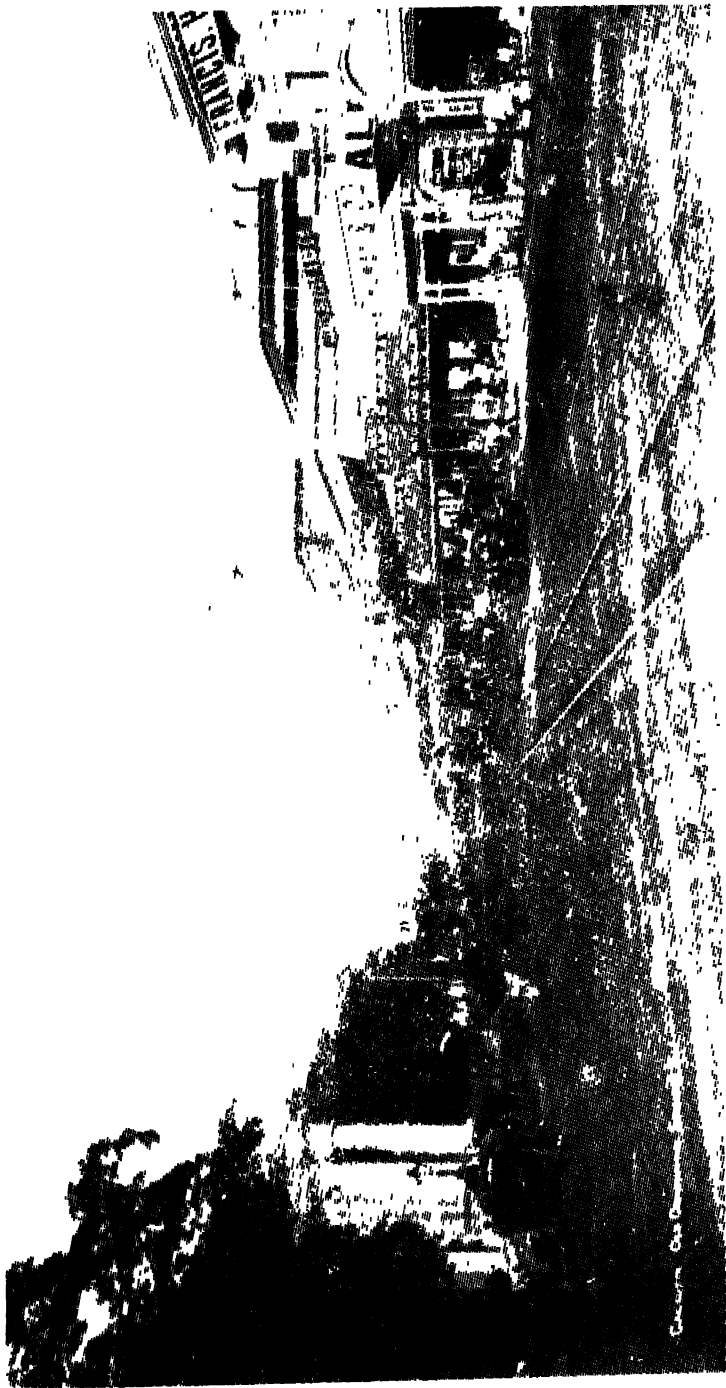
চৌরঙ্গীর একটি চিত্র।   ফোটো : বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।
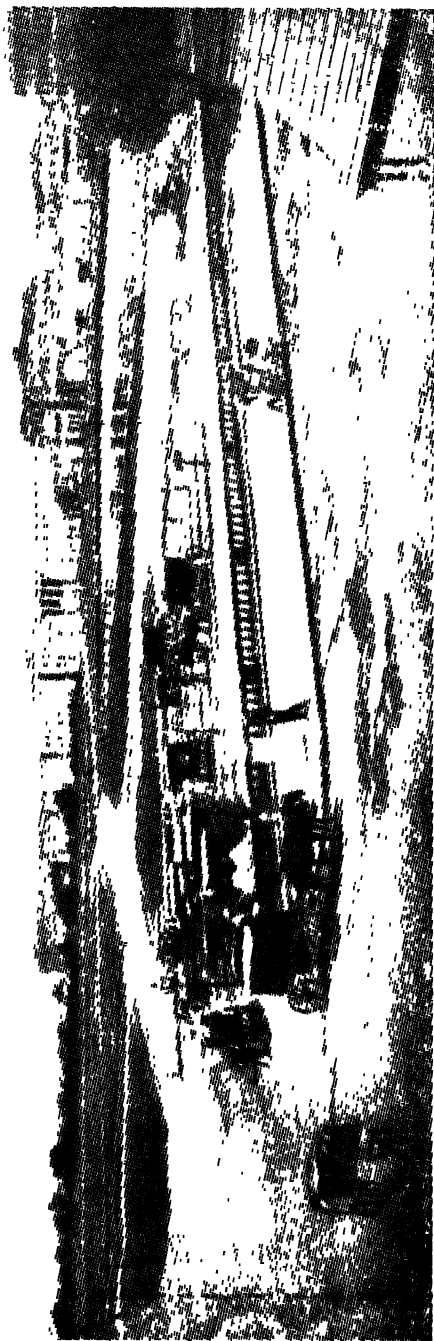
১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের এসপ্লানেড। এস, এন, ব্যানার্জি রোড থেকে গঙ্গার দিকের যে পথ, সেই পথটির সামনে পাল্কী ঘোড়ার গাড়ী। চিত্রে পাল্কী ও ঘোড়ার গাড়ী দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে এসপ্লানেডের সামনে পুষ্করিণী, যা এখন অদৃশ্য। দূরে আরও দৃশ্যমান, কার্জন পার্ক ও গভর্ণর হাউস। ফোটো ঃ বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

আউটট্রাম ঘাটের সামনের পথ। আজ যেখানে বাস দাঁড়ায়। সেদিন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন গঙ্গার নির্মল বায়ুই প্রধান ছিল। আর জাহাজ দাঁড়াত ঘাটের কিনারায়। সেই জাহাজ থেকে নামত ইংরেজরা। নেমে শহরের মধ্যে ছড়িয়ে যেত। সময়টা ১৭২৭ সাল।

ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।
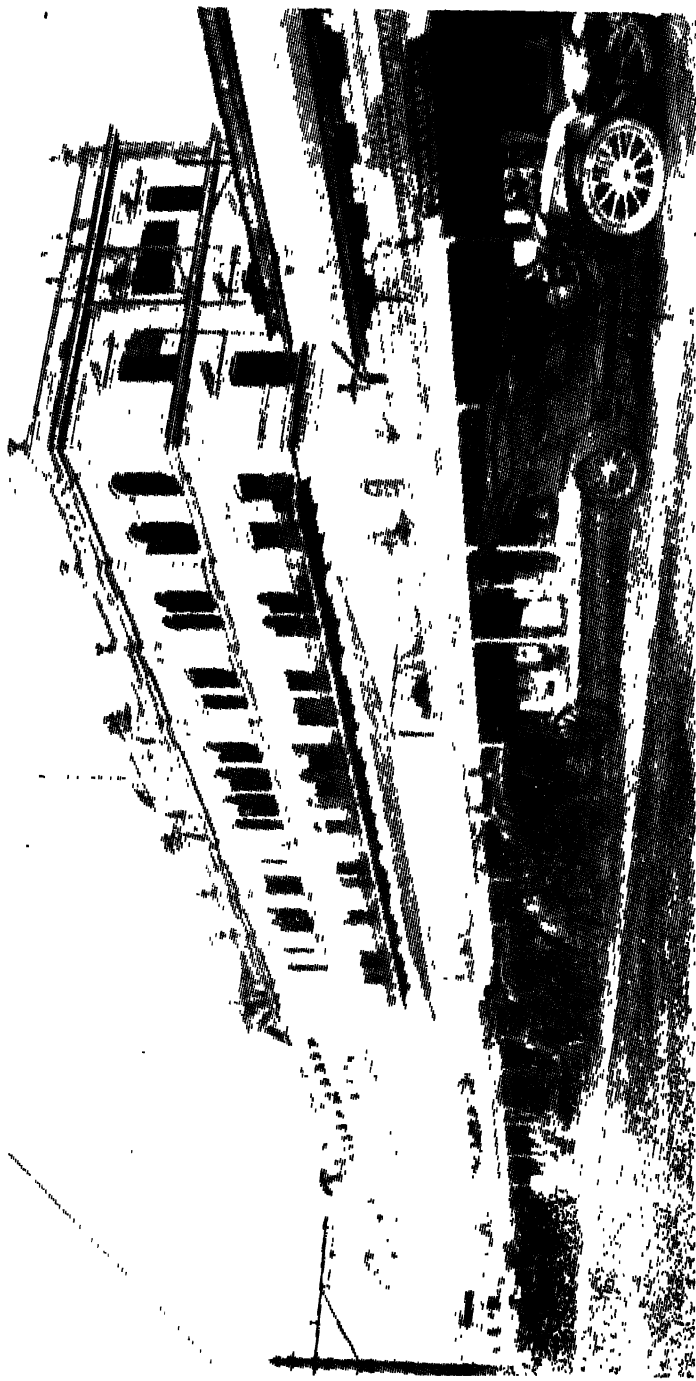
সেদিনের 'গ্রাণ্ড হোটেল' আজও তেমনিভাবে দৃশ্যমান। কলকাতা পালটেছে কিন্তু এই বাড়ীটি পাল্টায়নি। চিত্রটিতে লক্ষ্য করবার মত অজস্র ফিটনের মধ্যে একখানি অতি অদ্ভুত মোটর গাড়ী। আর এইখানি নাকি প্রথম কলকাতায় এসেছিল। এসেছিল বলা ভুল, তার আবির্ভাব ঘটেছিল।

অনেক আধুনিক ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট কিন্তু অদ্ভুত দুখানি মোটর গাড়ী দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় এ মোটর আজকের নয়।

ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

এই চিত্রটির বিশেষত্ব হোয়াইটওয়ে লেডল কোম্পানীর দুখানি বাড়ী। বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড প্রথম এখানেই ছিল, তারপর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে চলে যায়। ফটোগ্রাফি প্রথম এলো কলকাতায় দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ১১৫।
ফোটো : বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।
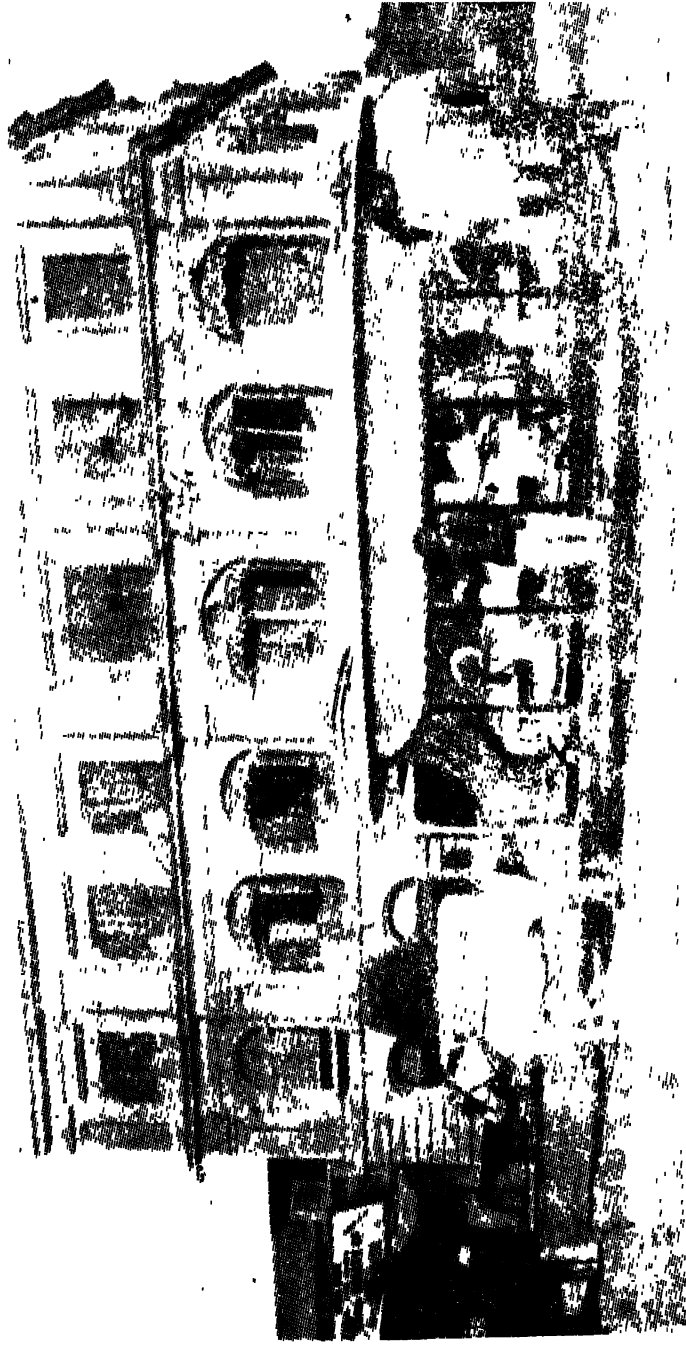
১৮৭৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী প্রথম কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলা শুরু হয়েছিল। এই দিনটি বলতে গেলে ট্রাম কোম্পানীর প্রথম জন্মদিন। চিত্রে দেখা যাচ্ছে একশ বছর আগের একটি যাত্রীবাহী ট্রাম। আজকে আশ্চর্য নয় কি? নিবন্ধঃ ট্রামের তিন পর্যায়, পৃষ্ঠা ৬৬। ছবিঃ ট্রাম কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।
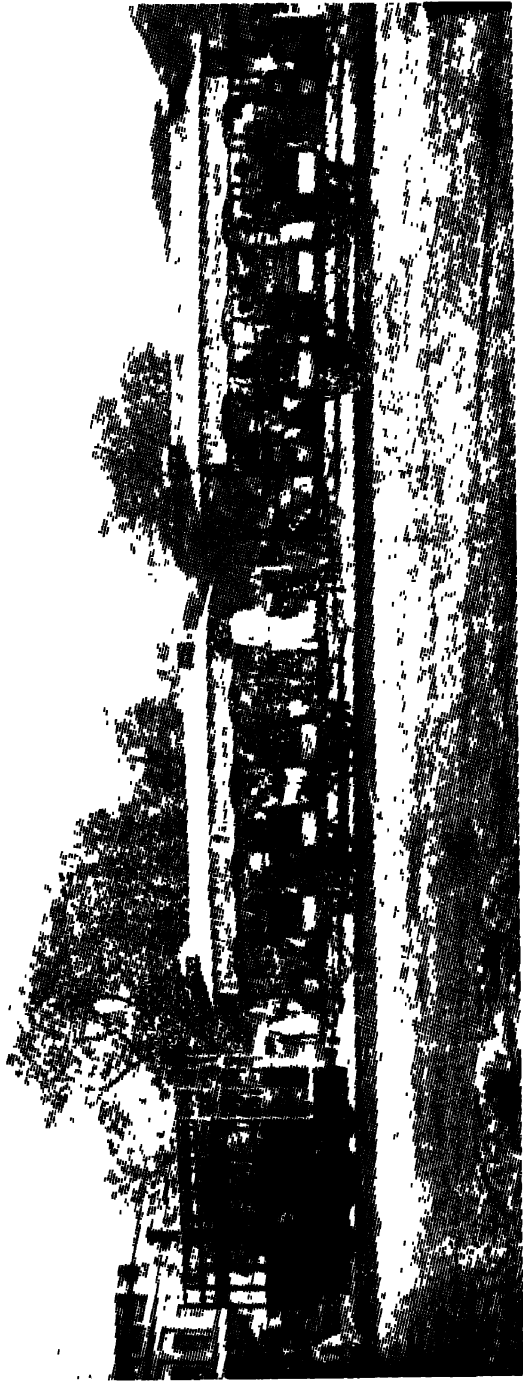
দ্বিতীয় পর্যায় এসেছিল ষ্টীম ট্রাম। চিত্রে দেখা যাচ্ছে খিদিরপুর থেকে এসপ্লানেড এর গন্তব্যস্থান। প্রথম পর্যায় ঘোড়ায় টানা ট্রামের পর এর উন্নতি অধিক যাত্রীবাহী কিন্তু এও বেশীদিন চলে নি, কারণ শহরবাসী প্রতিবাদ করে, ভীষণ শব্দ তাদের সুখশান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। ট্রামের তিন পর্যায় লেখা দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৬৬।
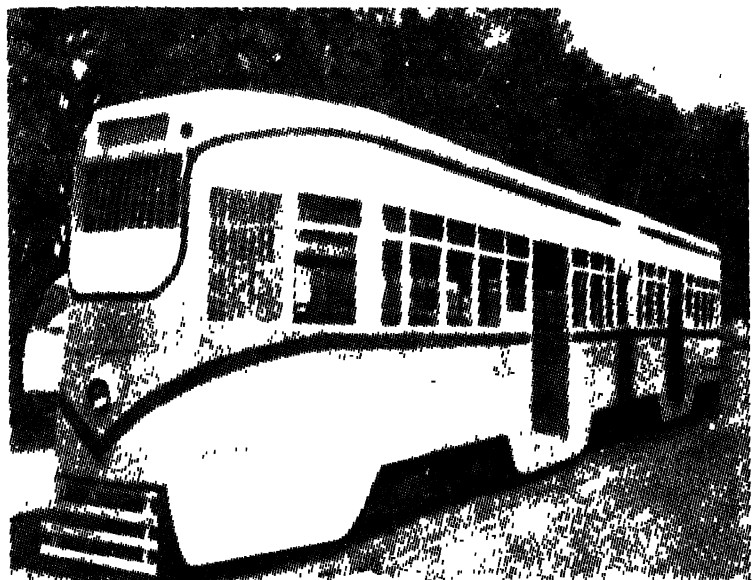
ফটো : ট্রাম কোম্পানীর সৌজন্যে

আজকের বিদ্যুৎচালিত ট্রামও যদি কখনও লুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে কি এও ইতিহাস হবে না? ট্রামের তিন পর্যায় লেখা দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৬৬।

ফটো: ট্রাম কোম্পানীর সৌজন্যে।

কড়ির বদলে টাকা পয়সা লেনদেন। চিত্রটি ১৭৫৮ সালের সময়কার। কেন না সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে কড়ির ব্যবহার উঠে যায়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে কড়ি বদলকারী কড়ি বদলে টাকা দিচ্ছে। সে সময়ে মানুষের পোষাকও সে যুগকে মনে করিয়ে দেয়। 'কড়ি' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৮৫। ফটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড।

এটা কি চৌরঙ্গীর রাস্তা? কিন্তু আজকের চৌরঙ্গীর সঙ্গে যে মেলে না। ঐযে দেখা যাচ্ছে মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ, গভর্ণর হাউস। দূরে আবার দেখা যাচ্ছে জেনারেল পোষ্টাফিস সবে তৈরী হচ্ছে। তাহলে কোন্ সালের এ চৌরঙ্গী? পাঠক—সালটা খুঁজে বার করুন। ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড।

বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড ফোটোর কল নিয়ে প্রথম এ শহরে আসেন। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের কয়েকজন বীরের ছবি এঁরাই তোলেন। ফোটোগ্রাফি প্রথম এলো কলকাতায় দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৫১।

ফোটো : বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

ইংরেজদের বিলাস জীবনের একটি নমুনা। সেটি ভৃত্যবিলাস। এদেশ যেমন জয় করেছিল, তেমনি ভোগ করেছিল নানাভাবে। এক একজন পদস্থ ইংরেজদের শতাধিকের ওপর ভৃত্য থাকত। আর তাদের নামের তালিকাও অদ্ভুত। খানসামা, জমাদার, খিদমতগার, হুকা-বরদার …প্রভৃতি। চিত্রে চারজন সেইরকম ভৃত্যকে দেখা যাচ্ছে। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রায় একরকম। হাজার হোক তারা তো সাহেব বাড়ীর ভৃত্য, পোষাক তাদের খোলতাই হবে না? লেখকের রচনা দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ১৫৯। ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

আজকের বাংলার গ্রাম নয়, ১৭৩৯ সালের বাংলার গ্রাম। গৃহস্থ বাড়ীর গরুগুলির চেহারা দেখুন। সেদিনও খেতে পেত না, আজও পায় না। কিন্তু গৃহস্থদের জন্য কি না করে! সেদিনের বাংলার গ্রামের সঙ্গে কি আজকের বাংলার গ্রামের কোন অমিল আছে? পাকা বাড়ীর সংখ্যা বেড়েছে বটে, আলো এসেছে, গ্রাম সংস্কার
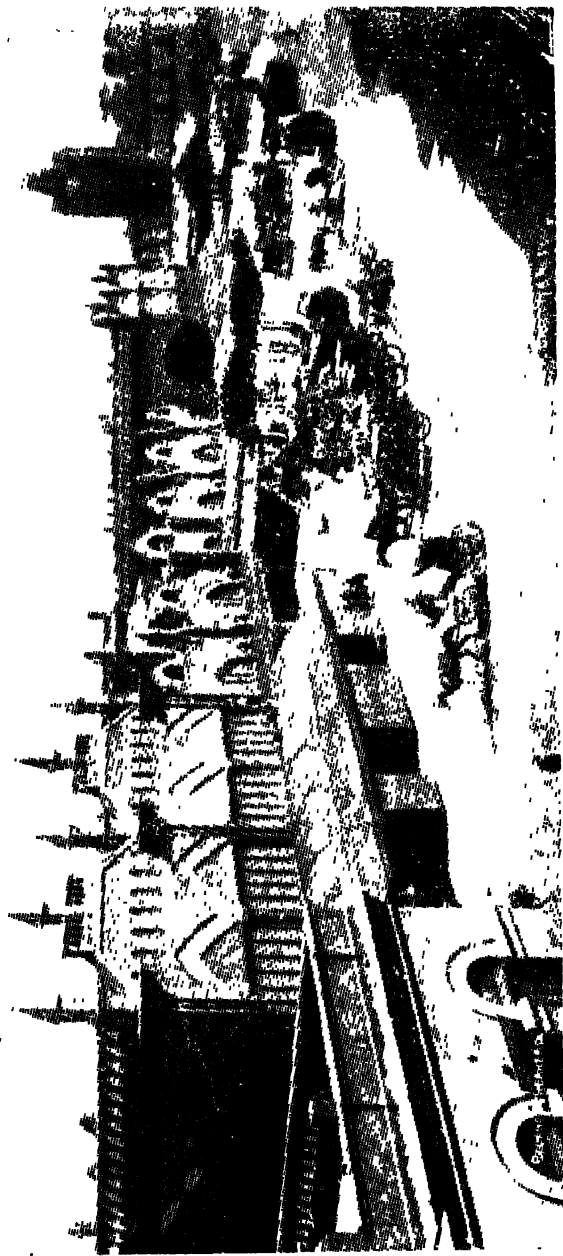
এখন সবাই বলে নিউ মার্কেট। কেউ কেউ বলে হগ্ মার্কেট কে এই হগ সাহেব? চিত্রটি ১৮৭৪ সালে তোলা। তাকিয়ে দেখুন কোনো মোটর গাড়ী নেই। তখন মোটরগাড়ী কোথায়? রচনা, স্যার স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৭৫। ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

এই গাড়ীর নাম পুসপুস। খানিকটা টাঙ্গার মত ধরণ। কিন্তু ঘোড়া টানে না, মানুষ টানে। ১৮০৪ সালে পণ্ডিচেরীতে প্রথম চালু হয়েছিল। তারপর চলেনি বলে থেমে যায়। কলকাতায় কখনও আসে নি। তখন
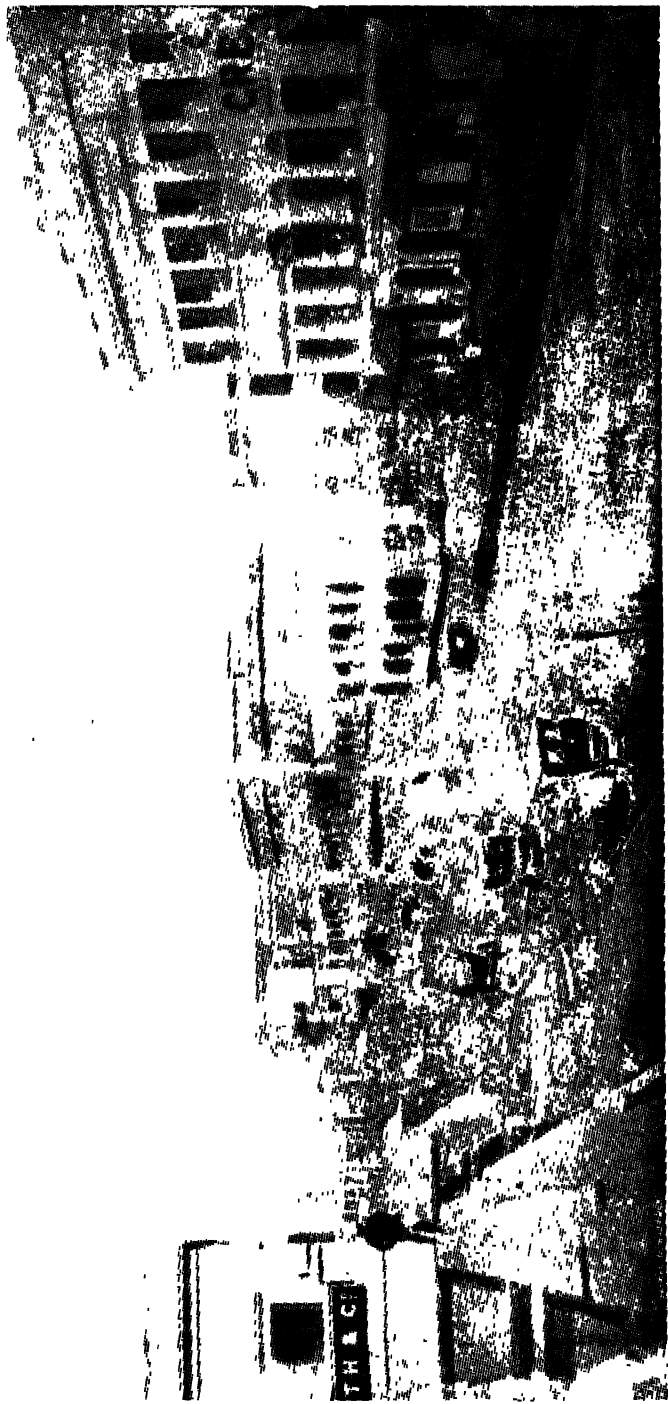
ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট। ১৭৪১ সালের ছবি। আজকের এই পথের সঙ্গে কি মেলে? ঐযে দূরে দেখা যাচ্ছে সেণ্ট এনড্রুচ গীর্জা যা আজও আছে, আর পাশে 'গ্রেট ইস্টার্ন' হোটেল। এই হোটেলের পাশের গলিটিই ছিল রানী মুদিনীর গলি। রানী মুদিনীর গলি' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ২৫। ফোটো: বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ডের সৌজন্যে।

একমাত্র প্রমাণ একটি মসজিদ। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের (আগেকার ওয়েলিংটন স্কোয়ারের) ধার ঘেঁষে এখনও জেগে আছে। পথ চলতে চলতে অনেকেরই হয়ত মনে হয় এখানে কেন এই মসজিদ? অনেকে হয়ত প্রশ্নের সমাধান করেন— স্কোয়ারে মুসলমানেরা বেড়াতে এলে প্রার্থনা করার সময় পায় না বলে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু তাহলে হিন্দুরা দোষ করল কি? তাদের জন্যও একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা উচিত ছিল? কিন্তু না। মন্দির বা মসজিদ কোনটাই ঐ জন্যে প্রয়োজন হয়নি। মসজিদ করার প্রয়োজন হয়েছিল, এখানে জলের ট্যাঙ্ক ছিল। এবং পাম্পিং ষ্টেশনে মুসলমানদের সর্বদা থাকতে হত বলে তাদের সুবিধার জন্য একটি ছোটখাট মসজিদ তৈরী করা হয়েছিল। এখন সবই লুপ্ত। জলের ট্যাঙ্ক উঠে জনসমাবেশের ক্ষেত্র হয়েছে, কিন্তু মসজিদটি লুপ্ত হয়নি। মসজিদটি ভেঙ্গেচুরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েও আবার নতুন করে জাগিয়ে রাখা হয়েছে। জাগিয়ে রেখেছে আশেপাশের মুসলমানেরা। তারা ধর্মকে শুধু জাগিয়ে রাখেনি, জাগিয়ে রেখেছে ইতিহাস।

একমাত্র এই মসজিদই প্রমাণ করে—এখানে জলের ট্যাঙ্ক ছিল। ১৮৭৬-১৮৮৮ সালের মিউনিসিপ্যালিটির কার্য-বিবরণী থেকেও জানতে পারা যায় কিছু। আর কিছু অনুমান করা যায় স্কোয়ারের তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উচ্চতা দেখে। স্কোয়ারের মাঝখানে যে ফোয়ারাটি থেকে সদাসর্বদা জল গড়ায়—তা থেকে কিছু কি অনুমান করা যায় না? এখানে তারও আরও আগে সল্ট লেকের জল প্রবাহিত হত। জায়গাটিকে ক্রীক খাল বলা হত। ডিঙিগুলো এখানে এসে কোন অলৌকিক উপায়ে ধ্বংস হয়ে যেত, এইজন্যে এই জায়গাটিকে "ডিঙাভাঙা" বলা হত। তবু কিছুই বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—এই অচেনা শহরটি একটু একটু করে পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে!

তাই সম্পূর্ণ প্রমাণ দিয়েই আজকের 'কলকাতাবাসীকে বিশ্বাস করাতে হয় যে এখানে আজকে যা আছে দুদিন আগে তা ছিল না। এসব সৃষ্টি সম্পূর্ণ নতুন। কলকাতা শহর সম্পূর্ণ নতুন শহর। এর গায়ে কোন প্রাচীনত্বের ছাপ নেই। জবচার্ণক কবে এসেছিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট কি খুব বেশী দিনের? পলাশী যুদ্ধের ইতিহাস যতদূরই মনে হোক সে খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়।

ইংরেজ এল এখানে বাণিজ্য করতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট। তারপর দেশের সর্বাধিপতি হল পলাশী যুদ্ধের পর। দেশ হল বিদেশীর করায়ত্ত। একটা দেশের পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুরি ভুরি পরিবর্তনে আশ্চর্য লাগে। বোধ হয় এ দেশের পরিবর্তন একটু দ্রুতই হয়েছিল।

তাই দ্রুতই এ শহরের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ইংরেজ বাহাদুর। তখন কলকাতাতেই ইংরেজের সব। ইংরেজ নিজের থাকবার জন্যেই ভাল ভাল ব্যবস্থার খসড়া করতে লাগল। নতুন নতুন সুখ, নতুন নতুন সুবিধে। নেটিভদের অসুবিধে হলেও তাদের সুখ-সুবিধে দরকার। কারণ তারা এখন রাজা।

সিপাই বিদ্রোহের পর ইংরাজদের টনক নড়ল, কলকাতার স্বাস্থ্যোন্নতির সুব্যবস্থা করতে হবে। ড্রেন ও কলের জলের ব্যবস্থা করলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়। কলকাতায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা ছত্রিশ জনেরও বেশী। ইংরাজের চেয়ে নেটিভদের সংখ্যাই বেশী। ডালহৌসীর স্কোয়ারের মত চৌরঙ্গীতেও গোটা কুড়ি পুকুর ছিল। নেটিভদের মৃত্যুহার দেখে ইংরাজরা শিউরে উঠল। ভয় হল যদি তাদের হয়? শেষকালে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েডে মরতে হবে? মন্ত্রণাসভা বসল। খসড়া হল পরিশ্রুত জল সরবরাহ করা হবে। সে জল প্রথমে পাবে ইংরেজ তারপর নেটিভ। ৬০ লক্ষ গ্যালন জল সরবরাহের খরচ পড়বে সাতান্ন লক্ষ টাকা। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক।

নেটিভরা টাকা দিতে চাইল না। তারা বলল—কলের জল আমরা খাব না। টাকাও আমরা দেব না। জাতধর্ম আমাদের যাবে। ইংরাজ কান দিল না সে সব কথায়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। করবেই তারা। কিন্তু পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হবার আগেই ক্লার্ক মারা গেলেন, ভার পড়ল উইলিয়াম স্মিথের ওপর।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ। প্রথম জলপান করল কলকাতাবাসী। আজকের কলকাতায়

পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করপোরেশনের নয় ইংরাজের। ইংরাজরাই সৃষ্টি করেছিল এই উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু সেদিন ইংরাজ নিজের সুবিধের জন্যে মাথা ঘামিয়েছিল—নেটিভদের জন্যে নয়। ইংলিশ চ্যানেলের পথে ব্রিটেন থেকে এল, পাম্পিং ষ্টেশন, জলবাহী পাইপ এবং অন্যান্য পাইপ ও যন্ত্রপাতি।

কলকাতায় হল জলের কেন্দ্র। পরিশ্রুত জল জমা হবে টালার ট্যাঙ্কে ও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাঁধানো ট্যাঙ্কে। তার আগে ফলতায় জল তুলে থিতানো হবে Settling Tank-এর মধ্যে। তারপর সেই Filtered জল পাঠানো হবে দুই ট্যাঙ্কে।

ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সাতান্ন লক্ষ টাকার পরিকল্পনা সমেত ইংলণ্ডে গেলেন। সেখানে কাজের জন্য ঠিকাদার, ইঞ্জিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করলেন। সেখানে ক্লার্ক সাহেব যে ইষ্টকনির্মিত পাইপের ব্যবস্থা করলেন তাতে ফলতা থেকে টালা পর্যন্ত চব্বিশ ঘণ্টায় নব্বুই লক্ষ গ্যালন জল পাম্প করে পাঠানো হবে; কিন্তু ক্লার্ক মারা যাবার পর সে পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেল। পরিবর্তে উইলিয়াম স্মিথ বিয়াল্লিশ ইঞ্চি মাপের ঢালাই লোহার পাইপের ব্যবস্থা করলেন। তার ভেতর দিয়ে যাবে ষাট লক্ষ গ্যালন জল—সেই ব্যবস্থাই বহাল রইল।

গঙ্গা থাকতে ফলতায় কেন জলের কেন্দ্র হল? কাশীপুরেও তো হতে পারত? কিন্তু তখন মিউনিশিপ্যালিটির তৎকালীন রাসায়নিক মত প্রকাশ করেছিলেন—কাশীপুরের কাছে হুগলী নদীর জল বছরে চার মাস পানের যোগ্য থাকে। কলকাতা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ষ্টেশন করলে ইচ্ছাপুর ও বারাকপুর অঞ্চলের ইংরাজ সৈন্যরা জল পেত না। তাই ফলতায় হল জলকেন্দ্র। আর পাম্পিং ষ্টেশন হল টালা ও ওয়েলিংটনে। টালা ও ওয়েলিংটন থেকে যত বড় বড় লোহার পাইপ মাটির তলা দিয়ে ডালহৌসি, গভর্ণমেণ্ট হাউস, চাঁদপাল ঘাট, লালবাজার, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী প্রভৃতি ইংরাজ-বসবাস অঞ্চলের দিকে গেল। আর নেটিভরা জলপান করতে লাগল—পথের ধারে লোহার সিংহের মুখ-মার্কা দাঁড়ানো কল থেকে। (এখনও মাঝে মাঝে পথের ধারে সিংহওয়ালা মুখের দর্শন পাওয়া যায়।) অবশ্য নেটিভদের ঘরে ঘরে কানেক্‌সন নেবারও অধিকার ছিল। কিন্তু ব্যয়বহুল।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পাম্পিং ষ্টেশন তৈরী করা হয়েছিল—ইংরাজদের নিজের সুবিধের জন্যে। কারণ এইখান থেকেই ইংরাজ-অঞ্চলে জল সরবরাহের সুবিধা। তা ছাড়া ওয়েলিংটনে ভূনিম্নের ট্যাঙ্কের আয়তন আশী

লক্ষ গ্যালন জল ধরার উপযোগী। টালার ট্যাঙ্কে জল ধরত মাত্র দশ লক্ষ গ্যালন। ওয়েলিংটনের পাম্পিং ষ্টেশন থেকে জল উত্তর কলকাতায় যাওয়ার জন্যে পাইপগুলো মেলানো ছিল কিন্তু যেত না। কারণ এখান থেকে ইংরাজদের বাড়ীতে জল যাবার পাইপগুলি ছিল বড়। ইংরাজ-বিশেষজ্ঞ এই চালাকিটি সুকৌশলে সম্পন্ন করেছিলেন। মোট কথা, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক ইংরাজদের জন্যেই হয়েছিল। এ কথা কলকাতার আদমসুমারী ইংরাজী গ্রন্থের সংকলন-কর্তা মিঃ এ কে রায় বলেছেন।

সেদিনের সব কিছুই আছে। নেই শুধু ওয়েলিংটন স্কোয়ার ট্যাঙ্ক। ১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে চার লক্ষ অধিবাসীর জন্য দৈনিক ষাট লক্ষ গ্যালন পরিশ্রুত জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। আজ এত বছর পরে দৈনিক সাত কোটি গ্যালন জলসরবরাহ হচ্ছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েক কোটি অধিবাসীর জন্য। শুধু পাইপগুলোয় কয়েক সহস্র জোড়াতালি পড়েছে মাত্র।

আজ সেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) ভ্রমণবিলাসীদের ভ্রমণ ক্ষেত্র। কলকাতা শহরের জনসমাবেশের একমাত্র ক্ষেত্র। কালের কি অদ্ভুত খেয়াল? ইতিহাসের কি অদ্ভুত বিচার? এখন কাউকে গল্প করলে সে হয়ত রাঁচীতে পাঠানোর তোড়-জোড় করবে। কিন্তু তাকে বিশ্বাস করানর জন্যে ঐ মসজিদই একমাত্র সম্বল। ঐ মসজিদের জন্ম তারিখ খুঁজতে গেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং ষ্টেশনের ইতিহাস বেরিয়ে পড়বে। একটি জন্মের সঙ্গে আর একটি জন্মের সূচনা।

অমৃত, ১৯শে জুন ১৯৬২

মামলা ও মোকদ্দমার ব্যাপারটা সাধারণতঃ বড় গোলমেলে। উকিল, মোক্তার ছাড়া বোঝে না। কিন্তু অপরাধ খুবই সহজে করা যায় এবং তা আইনের যে কোন ধারায় পড়তে পারে। অপরাধ সম্বন্ধে সবারই কিছু না কিছু সন্ত্রস্তভাব আছে। বাসে ও ট্রামে ধূমপান করলে আইনতঃ দোষনীয়। কিন্তু যখন আইনের বলে এর কণ্ঠরোধ করা হয় নি তখন যে-কেউ যতখুসি অপর যাত্রীর অসুবিধা করে ধূমপান করেছেন। তখন নীতির প্রশ্ন এসে বিবেকের সচেতনতাকে নাড়া দেয়নি।

তাই আইন মানুষকে আজ যে সভ্যজগতে রক্তচক্ষু দেখিয়ে সর্বদা শাসাচ্ছে, এ কথা খুব সহজেই বলা যায়। সেই আইন ও তার আদালত এই কলকাতায় কবে এল সেই নিয়ে প্রশ্ন। আইনের সংজ্ঞা দেওয়ার প্রশ্ন নয়। এক কথায় বলা যায়, এ সহর যবে থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হল তখন থেকেই আইন ও আদালত। তার আগের কোন ইতিহাস যোগাড় করতে গেলে পঙ্কোদ্ধারই হবে, মিলবে না কোন সঠিক তালিকা, কারণ তখন এ সহরের কোন ইতিহাসই লিখিত ছিল না।

এ সহরের প্রথম আইন ও আদালত সম্বন্ধে বলতে গেলে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ব্যাপক আলোচনা হবে না, শুধু মোটামুটি একটা ধারণা লিপিবদ্ধ করেই শেষ করতে হবে। হাইকোর্ট সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত সহরের আইন ও আদালত, তার বিচার ও সাজার নমুনা কিরূপ ছিল সেটিই লক্ষ্য করবার মত। বেশ কৌতুকপ্রদ সে ইতিহাস।

ডালহৌসির কাছে নিশ্চয় আপনার যাওয়া আছে। সেখানে যদি না গিয়ে থাকেন তাহলে বুঝব আপনি সহর কলকাতার বাসিন্দা নন। বাসিন্দা না হলেও একবার যদি কলকাতায় বেড়াতে আসেন তাহলে নিশ্চয়ই ডালহৌসী গিয়ে লালদীঘি দেখবেন এবং তার পাশে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট আপনার চোখে পড়বে। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটের মাথার কাছেই রাইটার্স বিল্ডিং। আপনার প্রয়োজন সেখানে একদিন না একদিন হবেই সুতরাং আপনার

দেখা হয়ে যাবে সেই ঐতিহাসিক পথটি। সেই ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটেই প্রথম কোর্ট স্থাপিত হয়েছিল ১৭২৭ সালে, তার নাম "মেয়র্স-কোর্ট" বা "ওল্ড কোর্ট"। এখন সেস্থান অধিকার করে সেণ্ট এনড্রু গির্জা দাঁড়িয়ে আছে। সেই অবলুপ্ত কোর্ট বাড়িটি ব্রোচিয়ার সাহেবের তৈরী। এই মেয়র-কোর্টে বিচার করবার জন্যে একজন মেয়র ও ন'জন অল্ডারম্যান নিযুক্ত ছিলেন। এঁদের বিচারই চূড়ান্ত ছিল না। আপীলের মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন প্রেসিডেণ্ট-ইন্-কাউন্সিল বা স্বয়ং কলকাতার গবর্ণর সাহেব। ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে যে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার হত, সেগুলিই মেয়র সাহেব করতেন। মেয়রের নিচেই ছিলেন জমীদার সাহেব। তিনি একাধারে কালেক্টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট্। এই জমীদার বাঙ্গালী জমীদার বা ভূম্যধিকারী নন। ইনি কোম্পানী বাহাদুরের সেকালের সিবিলিয়ান।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হলওয়েল সাহেব বহুদিন জমীদারের কাজ করে গিয়েছেন, আশা করি তাঁকে কেউ বিস্মৃত হন নি। তিনি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার দুর্নাম কীর্তনে শ্রেষ্ঠপুরুষ। তাঁরই কল্পিত সৃষ্টি 'অন্ধকূপ হত্যা'-র কাহিনী বিস্মৃত হবার নয়। এঁরই দুই সহকারী ছিলেন, গোবিন্দরাম মিত্র ও নন্দরাম সেন। এই গোবিন্দরাম মিত্রই 'ব্লাক্-জমীদার' নামে প্রসিদ্ধ। কোম্পানীর জমীদারির প্রাপ্য খাজনা প্রজার কাছ থেকে আদায় করতেন জমীদার। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে সমস্ত ছোট খাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা হত, তারও বিচার করে দণ্ডাজ্ঞা দিতেন তিনি। সামান্য অপরাধের দণ্ডবিধানে তাঁর সরাসরি ক্ষমতা ছিল। কিন্তু যখন কোন আসামীর চরম বা প্রাণদণ্ডের আদেশ হত, সে সময়ে তাঁকে প্রেসিডেণ্ট সাহেবের মত নিতে হত। তবে সাধারণ দণ্ড অর্থাৎ বেত্রাঘাত, কয়েদ করা প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি সর্বৈব ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। একাধারে তিনি জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার। এই সাহেব-জমীদারের একজন এদেশীয় সহকারী বা ডেপুটি ছিলেন তিনিই 'ব্লাক জমীদার'। ইনিও ফৌজদারী বিভাগে শাসনকর্তৃত্ব করতেন, দস্তুরমত কোর্ট-কাছারি বসত। ব্লাক জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের বড়ই দোর্দাণ্ড-প্রতাপ ছিল। তিনি তাঁর উপরওয়ালাদের বড় একটা ভয় করতেন না। তাঁর প্রচণ্ড-শাসনে চৌরঙ্গীর জঙ্গলে ও কলকাতার নির্জনতর স্থানসমূহের ডাকাতরা বড়ই জব্দ হয়েছিল। ভয়ে জড়সড়। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, একবার তারা লোক চিনতে না পেরে খোদ মিত্রজার পাল্কী ঘেরাও করে। শেষে তারা যখন শুনল যে, সে পাল্কী মিত্রজার তখন "এ যে ডাকাতের বাবার

পাল্কী! ছেড়ে দে" বলে সরে পড়ল। এটা গল্পই হক্ বা জনপ্রবাদই হক্ সেকালের ইংরাজী অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী যে জবরদস্ত হাকিম হতে পারত তার অনেক প্রমাণ আছে।

ভারতের নানাস্থানে কোম্পানীর কুঠী ছিল। মাদ্রাজ, বোম্বাই, সুরাট, বালেশ্বর ও বাঙ্গলার নানাস্থানে বিশেষতঃ পাটনা, মালদহ, কাশিমবাজার, কলকাতা প্রভৃতি কেন্দ্রে তাঁদের কুঠীতে অনেক ইংরাজ কর্মচারী কাজ করত। এদের মধ্যে অনেকে "সিভিল ও ক্রিমিন্যাল" উভয় শ্রেণীর অপরাধ করত। কিন্তু এদের শাসনকর্তা হচ্ছেন কোম্পানী বাহাদুর। তখন কোম্পানী ইংলণ্ডের সম্রাটের কাছে চার্টার বা সনন্দপ্রাপ্ত বণিকসমিতি ছাড়া আর কিছু নয়। এজন্য এদেশে ইংরাজদের বিচারকার্যে ইংলণ্ডীয় আইন প্রচলন করবার জন্যে কোম্পানীর বিলাতের ডাইরেক্টারেরা বিলাতের পার্লামেণ্টের কাছে তিনবার সনন্দ প্রার্থনা করেন। ১৬৬১, ১৬৮৩ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের তিন সনন্দের বলে তাঁরা এদেশে আদালত স্থাপনের অনুমতি পান। এইজন্য সেকালের কলকাতায় মেয়র-কোর্ট, কোর্ট-অব-আয়ার-এণ্ড-টারমিনার, কোর্ট-অব-রিকোয়েষ্টস্ প্রভৃতি নানা নামধারী আদালত স্থাপিত হয়। লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি পর্যন্ত এইভাবেই বিচার কার্য চলে এসেছিল। তখনকার সরকারী আদালত, নবাব নাজিমের খাসে। তবে তাতে ইংরাজের কতক কর্তৃত্ব চলত। এতে বিচার সম্বন্ধে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা হতে আরম্ভ হয়। শেষে সম্ভবতঃ ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের চার্টারে সুপ্রীমকোর্টের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সময় থেকে কলকাতার শাসনব্যবস্থা যেন একটু পাকা রকমের হতে থাকে। ওয়ারেণ হেস্টিংস বাঙ্গলা ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের এবং বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম গবর্নর জেনারেল বা লাটসাহেব হলেন। তাঁর অধীনে একটি মন্ত্রীসভাও স্থাপিত হল। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান-জজ বা চিফ্‌জষ্টিস ও তাঁর সহযোগীরা বিলাত থেকে নিযুক্ত হয়ে এদেশে বিচার বিতরণে এলেন। সুপ্রীমকোর্টের উদ্দেশ্য ছিল—"To Protect natives from oppression and to give India benefits of English Law" অর্থাৎ এদেশীয় লোকদের অত্যাচার থেকে রক্ষা ও তাদের ইংলণ্ডীয় আইনের স্বত্ব ও সুবিধা প্রদান।

সুপ্রীমকোর্টের প্রথম জজ ছিলেন স্যর এলিজা ইম্পে। বিচারক হিসাবে ইম্পের নাম স্মরণীয় এইজন্যে যে তাঁরই অধীনে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়েছিল। ইতিহাস এই দুজন স্মরণীয় ব্যক্তিকে কখনও বিস্মৃত হবে

না। ইম্পের বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয় তবে এই বললে অত্যুক্তি হবে না, ইম্পে ছিলেন বন্ধুভাগ্যে ভাগ্যবান। ওয়ারেণ হেস্টিংস যেমন তাঁর বন্ধু ছিলেন, ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি উইলিয়াম কাউপারও ছিলেন ইম্পের সহাধ্যায়ী। ইম্পে সুপ্রীমকোর্টের চিফ্ জষ্টিসগিরি করা কালীন দুটি অপরাধ করেছিলেন, একটি মহারাজ নন্দকুমারের নামে জাল-মোকদ্দমা ও অপরটি 'পাটনাকজ্' বলে পরিচিত। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে স্যর গিলবার্ট ইলিয়াট (পরে লর্ড মিণ্টো) হাউস অব কমন্সের কাছে ইম্পেকে "ইমপিচ" বা অভিযুক্ত করবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইম্পে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে হাউস-অব-কমন্সের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্যে আইনের কুটতর্কে ও ভাষার ইন্দ্রজালে এমনি তেজগর্ভ বক্তৃতা করেন যে হাউস-অব-কমন্স তাঁদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেন। বিলাতের তদানীন্তন বিখ্যাত আইনজ্ঞ পণ্ডিত লর্ড ম্যান্সফিল্ড ইম্পের সঙ্গে করমর্দন করে বলেন—"So Sir Elizah, you have passed safe over the coals". (Impey's Memoirs. P. 295)

বস্তুতঃ সুপ্রীমকোর্ট ছিল বলেই পরে হাইকোর্টে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হয়নি। প্রত্যক্ষ কার্যক্ষেত্রে সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে অনেক গলদ ছিল। গবর্নরের কাউন্সিল ও সুপ্রীমকোর্ট উভয়ের মধ্যে কে বড় এই নিয়ে ক্ষমতা প্রকাশে মহাবিপত্তি উপস্থিত হল। উভয়েই স্ব স্ব প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। নন্দকুমার এই সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বলি হয়ে করাল চক্রনেমিপৃষ্ঠ হয়ে ইহলোক থেকে অপসৃত হয়েছেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও কাউন্সিল ও সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা নিয়ে এই বিবাদ মেটে নি।

হাইকোর্ট প্রসঙ্গে আসার পূর্বে সেকালে আইনের দণ্ডবিধানের কতকগুলি নমুনা দেওয়া দরকার। সেকালের বিচারও যেমন অদ্ভুত ছিল তার সঙ্গে সাজাও ছিল অদ্ভুত। সেকালের আইনের চক্ষে চুরী, জাল প্রভৃতি অপরাধ, নরহত্যার চেয়েও গুরুতর বলে বিবেচিত হত। হাত পুড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা সকল অপরাধেই ছিল। তুড়ুম Pillory-র ব্যবস্থা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এক আইন দ্বারা উঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের গেজেটে কতকগুলি অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা নিম্নবর্ণিতরূপে দেওয়া হয়েছিল—"(১) টমাস ফরেষ্ট—একজন গোরা। অপরাধ দুর্ব্যবহার ও গুণ্ডামি। দণ্ডাজ্ঞা—জেলের মধ্যে গোপনে বেত্রাঘাত ও আটক। (২) কানাই দে—অপরাধ—হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক থেকে মোহর চুরী। ১০ই তারিখ

পর্যন্ত জেলে থাকবে। এর পর বড় বাজারের দক্ষিণ দিকে নিয়ে গিয়ে চাবুক মারতে মারতে উত্তরদিক পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত সশ্রম কারাবাস। (৩) সেখ মহম্মদ—অপরাধ মানুষকে ছুরি মারা। হাত্ পুড়িয়ে দেবার পর এক বৎসর জেল। (৪) স্বরূপ পোদ্দার, মোহন সিং, গঙ্গারাম ও রামজয়। অপরাধ—জাল-টাকা চালান। দণ্ডাজ্ঞা—৪ঠা জানুয়ারী পর্যন্ত অপরাধীরা জেলে থাকবে, তারপর লালবাজারে তাদের নিয়ে গিয়ে দুঘণ্টাকাল দণ্ডকাষ্ঠ (Pillory)-তে আবদ্ধ রাখা হবে। তারপর ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তাদের পুনরায় জেলে আটক রেখে বড়বাজারের দক্ষিণদিকে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করা হবে। এইভাবে বাজারের উত্তরদিক পর্যন্ত চাবুক লাগাতে লাগাতে আনা হলে ও দুদিন এইভাবে চাবুক খেলে, তাদের পুনরায় জেলে আটক করা হবে। এদের মধ্যে, যাদের দীর্ঘকাল মেয়াদের হুকুম হয় নি—তাদের একসিক্কা টাকা জরিমানা ও পাঁচ হাজার টাকার মোচলেখা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। (৫) পার্বতী বেশ্যা—অপরাধ —চোরাই মাল রাখা। ৮ই আগষ্ট অবধি জেলে আবদ্ধ থাকবে। তারপর বড়বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত্রাঘাত করে এক টাকা জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেওয়া হবে। (৬) জোসেফ লেপারুজ—অপরাধ—হত্যা ও নৌকালুঠ। দণ্ড—মৃত্যু। ফাঁসীর পর দেহ—লোহার শিকলে বেঁধে সাধারণ রাজপথে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (৭) রামসুন্দর সরকার—অপরাধ—মিথ্যা সাক্ষ্য। দণ্ড সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর (১৮০২ খৃষ্টাব্দ)।”

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেকালের ফাঁসী। ফাঁসী দেওয়ার ব্যাপারটা চুপে চুপে হত না। প্রকাশ্য স্থলে অসংখ্য জনতার মধ্যে ফাঁসী হলে লোকের মনে ভয় সঞ্চার হবে ও এরূপ দুষ্কর্ম লোকে আর করবে না, এই ভেবে প্রায়ই চৌমাথার ওপর (where four roads meet) অস্থায়ী ফাঁসি-কাষ্ঠ রচিত হত, বেত্রাঘাত ব্যবস্থা, তুড়ুমের ব্যবস্থা—তাও প্রকাশ্য রাজপথে লোকচক্ষুর সম্মুখে। লালবাজার ও বড় বাজারের জনাকীর্ণ স্থানে বাজারের একদিক থেকে অপরদিক পর্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অপরাধীকে চাবুকের দ্বারা আঘাত করা হত। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, একজন ম্যানিলা-দেশীয় লোক এক স্ত্রীলোককে ছুরি মেরে হত্যা করে। সুপ্রীমকোর্টের বিচারে তার ফাঁসী হয়। ফাঁসীর আদেশের শেষ অংশে ছিল –"To be executed on Saturday the 13th, at the four roads which meet at the head of Lallbazar." অর্থাৎ লালবাজারের চৌমাথায় ঐ ব্যক্তির ফাঁসী হবে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দের একটি ঘটনা বড়ই অদ্ভুত। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট নামক একজন ইংরাজ জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁর অধীনস্থ পাঁচজন নাবিক কোন কারণে উত্তেজিত হয়ে হত্যা করে। হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই শ্রেণীর গুণ্ডা নাবিকদের মনে ভয়োৎপাদন করবার জন্য কর্তারা গঙ্গাগর্ভের ওপরই এই পাঁচজন দণ্ডিত আসামীর ফাঁসীর ব্যবস্থা করেন। দুখানি ভড় পাশাপাশি রেখে তার ওপর ফাঁসিকাষ্ঠ নির্মিত হয়। এরূপ ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে, হুগলী নদীতে যত জাহাজ আছে—সকল জাহাজ থেকেই একখানি বোট আসবে ও সেই বোটে সেই জাহাজের লোকজন থাকবে। নাবিকদের মনে ভয়োৎপাদন করাই এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। প্রভাতে, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে একটি তোপধ্বনি হল। যেখানে ফাঁসি হবে, সেখানে ফাঁসিমঞ্চের ওপর একটি হল্‌দে রঙ্গের পতাকা উড়ল। দেখতে দেখতে গঙ্গাবক্ষে নৌকার গাদি লেগে গেল। নদীর উভয়কূলবর্তী জাহাজের ডেকও লোক পরিপূর্ণ। বেলা নয়টার সময় একদল সিপাহী বেষ্টিত হয়ে অপরাধীদের ওল্ড কোর্ট ঘাটে আনা হল। তারপর তাদের সমভাবে প্রহরীবেষ্টিত করে, সেই ফাঁসীমঞ্চের ওপর নিয়ে যাওযা হল। প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান শেষ হতে ঠিক নটা কুড়ি মিনিটে আবার এক তোপ পড়ল এবং সেইসঙ্গে পাঁচজন অপরাধীর ফাঁসি হয়ে গেল।

সেকালের সুপ্রীমকোর্টে দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা-মোকদ্দমা আজকালকার মত এত বেশী না থাকলেও ব্যারিষ্টারের অভাব ছিল না। যে সব ইংরাজ তখন এদেশে ব্যারিষ্টারী করতে আসতেন, তাঁরা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হতেন। "হার্টলি হাউস" নামক এক গ্রন্থে সে সময়ের ব্যারিষ্টারদের সম্বন্ধে লিখিত আছে "ব্যারিষ্টারদের মুখে কেবল টাকা-টাকা রব।" সুপ্রীমকোর্টের চিফ জষ্টিসদের মধ্যে ১৭৭৪ সনে এলিজা ইম্পে; ১৭৯১ সনে রবার্ট চেম্বার্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পিউনীজজদের মধ্যে ১৭৮৩ সনে উইলিয়ম জোন্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এরপর ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে এক নতুন আইনের বলে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন আদালতের সমীকরণ হয়ে বর্তমান হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্ট টাউনহলের পশ্চিমদিকে "গথিক" প্রণালীতে নির্মিত। ভারত সম্রাটের প্রধান বিচারালয়, বঙ্গসাম্রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ এই হাইকোর্ট। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে এর ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই সুবৃহৎ বাড়ীটি সম্পূর্ণ হয়। ওয়ালটার গ্রাণভিল্‌, পূর্ত্ত-বিভাগের একজন

ইঞ্জিনিয়ার এই আদালত গৃহের প্লান বা নক্সা তৈরী করেন ও এই প্রকাণ্ড সৌধ তাঁর তদারকীতে নির্মিত হয়। এই আদালত-গৃহটি বিলাতের "ইপ্রেস-টাউন হল" এর অনুকরণে নির্মিত। বর্তমান হাইকোর্টের পশ্চিম দিকে সেকালের সুপ্রীম-কোর্ট ছিল। যেখানে আজকাল হাইকোর্ট নির্মিত হয়েছে, সেখানকার জমি অধিকার করে পূর্বোক্ত সুপ্রীমকোর্ট ও তিনজন সম্ভ্রান্ত ইংরাজের বসতবাটী ছিল। সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার লঙ্গভিলি ক্লার্ক সাহেবের আবাসবাটি, সুপ্রীমকোর্টের মাস্টার ও ব্যারিষ্টার উইলিয়ম ম্যাক্-ফারসন-এর বাড়ী, এ ছাড়া সুপ্রীমকোর্টের এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যর জেমস্ কল্‌ভিলির আবাস-বাটী।

এই নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের প্রথম চিফ্-জষ্টিস স্যর বার্ণিস্ পিকক। তাঁর সহযোগীরূপে দ্বাদশ জন পিউনী-জজও এই আইনের বলে নিযুক্ত হন। হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সদর দেওয়ানী-আদালত, সদর-নিজামত-আদালত ও সুপ্রীম কোর্টের লোপসাধন হয়। এই নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজেদের মধ্যে আটজন কোম্পানীবাহাদুরের ভূতপূর্ব আদালত থেকে আসেন। বাকি চারজনের মধ্যে দুজন (সার চার্লস জ্যাক্সন ও স্যর মর্ডান্ট ওয়েলস্) সুপ্রীম-কোর্টের জজ আর জজ নর্ম্মান ও মর্গান ব্যারিষ্টার-জজ। পূর্বোক্ত আদালতত্রয়ের হস্তে যে সমস্ত বিচার ক্ষমতা ছিল তা নবপ্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের জজেদের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নূতন "লেটার্স পেটেণ্ট" Letter's Patent) দ্বারা হাইকোর্টের জুরিস্‌ডিক্‌সান বা বিচারসীমা নির্ধারিত হয়ে যায়।

সুপ্রীমকোর্ট ছাড়া আর যে দুটি আদালত ছিল তার সম্বন্ধে কিছু বলে এ নিবন্ধ এখানে শেষ করব। একটি "আপিলেট-কোর্ট" ছিল। বর্তমান ঘোড়-দৌড়ের মাঠের পশ্চাৎদিকে ভবানীপুর অঞ্চলে যে প্রাসাদতুল্য বাটী আজকাল 'হাসপাতালে' পরিবর্তিত সেই বাড়ীতেই সেকালের জন্য এই আপীল-আদালত ছিল। এখানে দেওয়ানী ফৌজদারী উভয়বিধ মামলাই নিষ্পত্তি হত। সেকালে এই আদালতকে সাধারণে "সদর দেওয়ানী আদালত" বলত। সমগ্র বেঙ্গল-প্রেসিডেন্সির জন্য "সদর নিজামত আদালত" নামে একটি আদালত ছিল। বাঙ্গলা দেশের ফৌজদারী মামলাসমূহের আপীলের শুনানি এই আদালতে হত। ইতিপূর্বে দেওয়ানী-মোকদ্দমার আপীলের শেষ বিচারভার সকৌন্সিল গবর্নর সাহেবের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কিন্তু নূতন চার্টার দ্বারা গবর্নর ও কৌন্সিলের কার্য-প্রণালীর পরিবর্তন ঘটায় হেষ্টিংস ইম্পেকে সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান জজীয়তী ছাড়া সদর-দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করায় দেন

Uttarpara Jaikrishna Public Libr

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পিছনে ক্রীক রো-র মুখে চলে আসুন। রাস্তার ওপর নিপুন দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখতে পাবেন রাস্তাটি যেন নতুন করে বানানো হয়েছে। নতুন। নতুন কালো পিচের রং। কিন্তু না, রাস্তা নতুন নয় – বহুদিন আগেই এ রাস্তা বানানো হয়েছে। তবে নতুন লাগে এইজন্যে যে, এ রাস্তা অন্যান্য রাস্তার মত অত পুরানো নয়। অন্যান্য রাস্তায় যেমন সর্বদা লোক চলাচল করে, গাড়িঘোড়া চলে, এ রাস্তা কিন্তু তেমন নয়। প্রায় সময়ই সঙ্গীবিহীন হয়ে নীরব সাক্ষীর মত, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সুসজ্জিত বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তবে ক্রীক রো রাস্তাটি প্রশস্ত, সুসজ্জিত, এখানে বর্তমানে বহু হালফ্যাশানের বাড়ি তৈরী হয়েছে। এবং সে সব বাড়িতে থাকেন অনেক কৃতী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবার। রাস্তাটি নীরব। নির্জন। শান্তিপ্রিয় হলেও যেন একটু পাশ্চাত্ত্য ছোঁয়াচে নিজেকে সতন্ত্র করে রেখেছে।

সে যা হক। প্রশ্ন হল এর কোথায় ছিল উপরে উল্লিখিত নামের গলিটি? এবং কবেই বা তার চিহ্ন তার অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল?

আজকের সুসজ্জিত ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উদ্যান ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করুন। বৈকালী মুক্ত বায়ু সেবনের জন্যে ঘর ছেড়ে বহুমানুষ আসে এই খোলা জায়গাটিতে। বিকেলের অনুকূল পরিবেশ মুখর হয়ে ওঠে শিশুদের কলরব, কিশোরদের উল্লাস, যুবকদের অহেতুক হাসি আর তরুণ ও তরুণীদের রসালাপে এবং বৃদ্ধদের বিগতদিনের স্মৃতি রোমন্থনে। এই বৃদ্ধদের দিকে তাকিয়েই যেন স্মৃতির আর একটা দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। ইতিহাসের কটি পাতার ওপর যেন চোখদুটো সহসা স্থির হয়ে থমকে দাঁড়ায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ভূ-নিম্নের ট্যাঙ্ক ইংরাজদের জন্যেই হয়েছিল। ১৮৭৬-'৮৮৮ সালে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য বিবরণীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পাম্পিং স্টেশনে অধিকতর শক্তির যন্ত্র সংযোজনের সূত্রে পাওয়া যায়। এ

প্রসঙ্গে কলকাতার আদম-সুমারী ইংরাজী গ্রন্থের সঙ্কলন কর্তা মিঃ এ কে রায় বলেছেন—সে যুগে স্কোয়ারে ছিল জলের ট্যাঙ্ক। আর এ যুগে আছে মিটিংক্ষেত্র। পাম্পিং স্টেশনের মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ আছে।

আজও সেই ভগ্ন মসজিদটি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে স্কোয়ারে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারই স্মৃতি ধরে প্রমাণ মেলে সেকালের ওয়েলিংটন স্কোয়ারে একদা জলের ট্যাঙ্ক ছিল।

কিন্তু এ তো গেল আরও অনেক পরের কাহিনী। এর অনেক আগে আনুমাণিক ১৭৩৭ সালের আরও আগে এখানে একটি খাল ছিল এবং এই খালটি কলভিন্ ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট থেকে আরম্ভ হয়ে হেস্টিংস স্ট্রীটের পুরাতন সমাধি ক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তিনী হয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের ওপর দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে পড়েছিল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এই জায়গাটিতে খালটি একটু কোণাকুণিভাবে চওড়া ছিল এবং এখান থেকে ক্রীক রোর ভিতর দিয়ে বেলিয়াঘাটা সল্ট লেক বা ধাপা পর্যন্ত প্রবাহিত হত। এই খালটির নাম ছিল 'ক্রীক খাল।' কলিকাতা' সেটেলমেণ্ট প্রস্তাবে এই খালের নক্সা আছে। এই খালের ওপর দিয়ে বড় বড় মালের জাহাজ ও নৌকা যাওয়া আসা করত। তখনও এই জায়গাটির নাম ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানটি ক্রীক রো হয় নি।

১৭৩৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের রাত্রি। যেন কোন দৈত্য তার বিশাল বাহু দিয়ে শিশু কলকাতার চুলের মুঠি ধরে আছাড় মারল। এল এক মহাপ্রলয় ঝড়। মহা ঝটিকাময় সে রাত্রি। শিশু কলকাতার জীবনের সে রাত্রি আজও স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। আজও ভোলবার নয় সে রাত্রির ইতিহাস। বঙ্গোপসাগর থেকে ঝড় ওঠে। সে ঝড়ের যেমন ছিল বেগ তার সঙ্গে তেমনি মুষল বৃষ্টি। ঝড়টা সমুদ্র থেকে উঠে ষাট লিগ্ পর্যন্ত দূরবর্তী স্থানে ধাবিত হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প। বাড়ি, ঘর কাঁপতে থাকে। যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টি তেমনি মুহুর্মুহু বজ্র গর্জন।

সবারই মনে এক ভয়-বিহ্বল অবস্থা। এ রাত্রি যদি শেষ হয় তবে বহুপুণ্যের জোর। কোন গৃহের দোতলার জানালা, দরজা উড়ে গেল। ভেঙ্গে পড়ল কোন বাড়ির দোতলা তিনতলার ঘরদোর। শোনা গেল বজ্র-নিনাদের সঙ্গে মানুষের আর্ত চিৎকার। এই সময়ে স্যর ফ্রান্সিস রসেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠির মন্ত্রণাসভার সদস্য ছিলেন। রসেলের বর্ণিত কাহিনী থেকেই সেদিনের মহাপ্রলয়ের একটি আনুমানিক চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রভাত হলে দেখা গেল চারিদিকে যুদ্ধ শেষের মর্মান্তিক দৃশ্য। যেদিকে চোখ পড়ে সেদিকেই শুধু ধ্বংসের ভয়াবহ বিধ্বস্ত রূপ। কে যেন গতরাত্রে এসে আপন হাতে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। পূর্বদিনের সন্ধ্যায় গঙ্গায় এসেছিল উনত্রিশখানি ছোট বড় জাহাজ। তাদের একটিও অক্ষত অবস্থায় নেই। সব খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে কোন এক অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছে। শুধু 'ডিউক অব ডর্সেট' নামে জাহাজটির কিছু অংশ আস্ত অক্ষত ছিল। শুধু সেইটিই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে নদীবক্ষে শক্ত হয়ে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিনের ঝড় ও তার ধ্বংসের বিস্তারিত রূপ লিপিবদ্ধ করতে গেলে অন্য একটি কাহিনীর সূত্রপাত করতে হয়। তবে সেদিনের সেই মহাপ্রলয় কলকাতার প্রথম জীবনের অভিশাপ। ক্ষতির পরিমাণ চিন্তা করা যায় না। প্রায় বিশ হাজার বোট, জেলে ডিঙ্গী, নৌকা, ভড়, বজরা ইত্যাদি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

গঙ্গার স্রোতের মুখ দিয়ে তোড়ে কতকগুলি ডিঙি ও নৌকা এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মুখে এসে প্রচণ্ড বেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। এমন কি এখানে একটি ঘূর্ণি থাকার জন্যে মাঝে মাঝে ডিঙি নৌকা তার মাঝখানে পড়ে ভেঙ্গে যেত এবং সেই জন্যে এর পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম হয়েছিল ডিঙাভাঙা পল্লী। পরে যখন এই-খাল মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলা হয়, তখন তার নাম হয়েছিল—'ডিঙা-ভাঙা লেন।' অবশেষে তারও অনেক অনেক পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও তার পিছনের খাল বরাবর পথটির নাম হয় 'ক্রীক রো।'

এই ক্রীক রো দিয়ে লোয়ার সারকুলার রোডের দিকে যেতে গেলে একথা প্রচ্ছন্ন ভাবে মনে হয় যে,—হ্যাঁ, হয়ত এখানে একদিন একটি খালই প্রবাহিত হত।

কিন্তু ডিঙা ভাঙা লেনের কথা মনে এলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফুল ঘাস গাছ ভর্তি বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কলকাতার শহরের ইতিহাসের আর একটি বিস্ময়কর অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

লালদীঘির সামনে দাঁড়িয়ে মিশন রো-র রাস্তাটির কথা কাউকে জিজ্ঞেস করলে, সে হাত বাড়িয়ে কারেন্সির পাশের সরু গলির পথটি দেখিয়ে দেবে, কিংবা বলবে, বহুবাজার-মুখী ট্রাম যে রাস্তা চলছে অর্থাৎ সেণ্ট এনড্রুজ নামে স্কচ-গির্জার সামনে দিয়ে যে পথটি, তারই দু'পা হেঁটে ডান দিকের একটি গলি, সেই গলিই 'মিশন রো' নামের কীর্তি বহন করে আসছে। আরও সহজ করে বলতে গেলে, কেউ হয়তো বিরক্ত হতে বললে—ঐ যে 'স্টিফেন হাউস' নামে বিরাট অফিসবাড়ীটি, তারই পিছনদিকের পথটির নাম ঐ। 'মিশন রো' নামের এই যে নানা মতান্তর—তার কারণ, আজকে আর ভাল করে মিশন রো পথটি চেনা যায় না। মিশন রো-র গলির মতো এখন অনেক নতুন নতুন নামকরণের গলি সহরের উপর জেগে উঠেছে এবং তার নাম নগরবাসীর মনে বেশ ভালভাবেই রেখাপাত করে আছে। মিশন রো-র সেই পুরানো ঐতিহ্যকে ভেঙেচুরে দিয়ে নতুন ইতিহাসের পটভূমিকা নিয়ে নতুন নতুন পথের নাম নগরবাসীর মনে নতুন ইতিহাসের সূচনা করেছে! তাই লালদীঘির কাছে কাউকে জিজ্ঞেস করলে, সে হঠাৎ খানিক অবাক বিস্ময় নিয়ে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

মিশন রো নামের এই যে স্মৃতি দিনের পর দিন স্মৃতির তলায় চাপা পড়ে নতুন স্মৃতির সূচনা করছে··এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী যদি কাউকে বলা যায়, সে হল ইতিহাসের পুনঃ পুনঃ দৃশ্য-পরিবর্তন। আজ যা আছে, কাল তা নেই। আজকে যার সবচেয়ে আদর, কাল সে ধুলোয় লুটচ্ছে। এমনি করে পরের পর দৃশ্য-পরিবর্তন হয়ে বর্তমানের কলকাতার এই রূপ। বর্তমানের যে-রূপ আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাকে নিয়ে আমাদের যা কিছু আলোচনা। অতীতের পাতায় হারিয়ে যাওয়া যেসব স্মৃতি, আজ আর যার কোনো মূল্য নেই, সেইসব স্মৃতির চিহ্ন নিয়ে শুধু ভাবা ছাড়া অন্য কোনো বক্তব্য নতুন করে চোখের উপর ঝিলিক মারে না। তাই বর্তমানের নতুন নতুন পথের নতুন নতুন নামের গলিগুলি নতুন করে সাজপোশাক

প'রে এগিয়ে এলে, তাদের এড়িয়ে অতীতের দিকে চোখ ফেরানো যায় না। কারণ চোখের-দেখা অতীতের স্মৃতিকে পর্দার আড়ালে চাপা দিয়ে দেয়।

তবু মাঝে মাঝে এক একটি পুরাণো স্মৃতির চিহ্ন এখানে ওখানে চোখে পড়লে, অতীতের সেই অন্ধকার ইতিহাসের পাতাই ওলটাতে ইচ্ছে করে। এমন একটি ইতিহাস-অক্ষয় নামের গলি এই 'মিশন রো'। অথচ আজকে এই মিশন-রো নামের উপর কারো কোনো উৎসাহ নেই। কেউ যদি ডালহৌসি দিয়ে শট্‌কাট্‌ পথের জন্য কোনো কোনো সময় অজান্তে আশে-পাশের গলিতে ঢুকে পড়েন, তখন হয়তো একবার চোখ তুলে পাশের বাড়ীটির দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, সেই বাড়ীর দেয়ালে করপোরেশনের নামের নেম-প্লেটটি ঝুলে আছে, তা থেকেই জানতে পারা যায় যে, এই গলিটির নাম ছিল 'মিশন রো'। আর যদি ভালো করে কেউ চোখ মেলে আশেপাশের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন—একটি গির্জা-বাড়ী। গির্জা-বাড়ী দেখতে কোনো ভুল হবার নয়। কারণ যথারীতি যীশুর বাণী সম্বলিত একটি বোর্ড টাঙানো আছে ও সামনে আকাশের দিকে উঁচু হয়ে মোটা মোটা থামের বেষ্টনে একটি গম্ভীর আকারের মূর্তি। গেটের গায়ে লেখা আছে—*Old Mission Church, Founded 1770.* গেটের ভিতরে সুন্দর একটি ফুলের বাগান।

এই গির্জারই চারিদিকে সেই ইতিহাসের যা কিছু ঘটনা। এই গির্জাই যে সেই পুরাকালের 'ওল্ড মিশন চার্চ' এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই চার্চের ইতিহাস বলবার আগে এই মিশন রো-র পূর্বাবস্থা লিপিবদ্ধ না করলে ত্রুটি থেকে যায়।

আজ থেকে দু'শো বছরের ওপর পেছিয়ে যান, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজদৌল্লা কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারও আরও কিছু আগে মিশন রো 'রোপ-ওয়াক' নামে পরিচিত ছিল। তখন লালদীঘির সামনের পথটাই রোপ-ওয়াকের সীমা ছিল এবং তারপরে যখন পথটা মিশন-রো নামের পরিচয় বহন করে তখনও মিশর-রো সর্বদা লালদীঘির পানে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত। আজ যে মিশন-রো সাধারণের কাছে অবহেলিত, তার কারণ লালদীঘির সামনের ঐ বাড়ীগুলি। লালদীঘির সামনের কারেন্সির বাড়ী থেকে আরম্ভ করে সেণ্ট এনড্রুজ গির্জার সামনে পর্যন্ত কোনো বাড়ীই ছিল না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদৌল্লা যখন কলিকাতা আক্রমণ করেন

তখন বর্তমানের স্কচ-গির্জার পরিবর্তে সেইখানে একটি থিয়েটার-বাড়ী ছিল। নবাব-সৈন্য এই থিয়েটার-বাড়ী দখল ক'রে তাদের আশ্রয়-কেন্দ্র করে। এবং এখান থেকেই মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ ক'রে ইংরেজদের বিধ্বস্ত করে। এই থিয়েটার-গৃহের কিছু দূরে আর একটি বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে লেডী রাসেল বাস করতেন। তাঁর স্বামী স্যার ফ্রান্সিস রাসেল ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ অলিভার ক্রমওয়েলের কন্যা লেডী ফ্রান্সিস, স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের মাতামহী ছিলেন। নবাব কর্তৃক কলকাতা আক্রমণের সময়ে লেডী রাসেল ফল্‌তায় পলায়ন করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরবর্তীকালে এই রাসেল সাহেবের বাটীর অধিকৃত স্থানে 'মিশন চার্চ' তৈরী হয়। জন জ্যাকারিয়া কারনাণ্ডার নামে একজন পাদরী ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই গির্জাটি পঁচাত্তর হাজার টাকায় তৈরী করেন।

কিন্তু এত টাকায় এই গির্জাটি পাদরী কারনাণ্ডার কেমন করে করলেন তার একটি চমৎকার কৌতুকাবহ ইতিহাস আছে। তার আগে জন জ্যাকারিয়া কারনাণ্ডার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। বাংলায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সুইডেন দেশের বিদেশী মানুষ, কিন্তু ভারতের দিকে আকৃষ্ট হলেন 'খ্রীষ্টধর্ম প্রচার সমিতি'র কুড্যালোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে। তারপর মাদ্রাজ প্রদেশে মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক হিসেবে তিনি এদেশে এলেন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। রাজনৈতিক অবস্থার জন্যই তাঁকে মাদ্রাজ ছাড়তে হয়। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কাউণ্ট লালীর নেতৃত্বে ফরাসী সৈন্যরা এসে যখন কুড্যালোর দখল করে, তখন কারনাণ্ডার বাংলাদেশে চলে আসেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কলিকাতায় এসে পৌছুলেন, তখন ক্লাইভ এবং বেঙ্গল-বোর্ডের সদস্যরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। শহরে তখন একটিও প্রোটেস্ট্যাণ্ট মিশন বা গির্জা নেই। কাজেই কোম্পানির কর্মচারীদের আগ্রহ সহজেই অনুমান করা যায়। কারনাণ্ডার সত্যিই কর্মিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। উপাসনা-ক্রিয়ায় পাদরীদের মধ্যে মধ্যে সাহায্য করা এবং ভাষণ দেওয়া ছাড়া, তাঁর আর একটি মহৎ কাজ হল—মুর্গিহাটা অঞ্চলে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়-স্থাপন। কলকাতায় দেশীয় ছেলেদের জন্য প্রথম য়ুরোপীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব তাঁরই। তারপর ইংরেজদের একটি নিজস্ব ভজনালয় স্থাপন করার উদ্দেশ্যে তিনি নানাভাবে সচেষ্ট হন। অবশেষে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বেথ্ টেলিফা' অর্থাৎ উপাসনা গৃহ-নামে যে গির্জার

ভিত্তি তিনি স্থাপন করেন, সেইটিই পরে 'মিশন চার্চ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থায়ী প্রোটেস্ট্যাণ্ট ভজনালয়টির নির্মাণ-কার্য ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমাপ্ত হয়। মোট খরচ পড়েছিল পঁচাত্তর হাজার টাকা। আর সেই টাকা তোলা, বাড়ী তৈরী করানো এবং আনুষঙ্গিক নানা কাজে তিনি পরিশ্রমের কার্পণ্য করেননি।

তাঁর টাকা তোলার উপায়-চিন্তা করলে বেশ পুলকিত হতে হয়। এমনকি বিস্ময়বোধ জাগে এই পাদরী কারনাণ্ডার সম্বন্ধে। তিনি এই গির্জার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন কর্নেল ফিশারের বিধবা ভগ্নী ওয়েণ্ডিলাকে বিয়ে ক'রে যা কিছু হাতে পেয়েছিলেন তাই দিয়ে। তারপর সৌভাগ্যক্রমে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে সেই পত্নী মারা যান। পাদরীসাহেব মিসেস আনা উলি নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এই সুন্দরী যুবতী মহিলা তথনকার সমাজে আভিজাত্যপূর্ণ বিলাসিনী বলে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁরও মৃত্যু ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে হয় ও তাঁর অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে পাদরীসাহেব ছয়হাজার টাকায় মিশনের বিদ্যালয়ে ব্যয় করেন। সেই পাদরীসাহেবের কামাক ষ্ট্রীটে বাড়ী ও ভবানিপুরে বাগান ছিল ও তিনি কারকারবারও করতেন। তাতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তাকে আদালতে ইনসলভেণ্ট হয়ে ঋণমুক্ত হতে হয়। ঐ সময় ঐ গির্জা শেরিফের লোকেরা বিক্রি করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার মূল্য দশহাজার টাকা মালদহের চার্লস গ্রাণ্ট সাহেব দান করে গির্জাকে দায়মুক্ত করেছিলেন। সেই পুণ্যে, তিনি কোম্পানির ডিরেক্টার হয়েছিলেন ও তাঁর সন্তান লর্ড গ্লেনেলা হয়েছিলেন। (এই গ্রাণ্ট সাহেবের নামে এখনও একটি পথের নাম আছে, তার নাম—গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট।) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে যে 'মিশন রো'-র গির্জায় পূর্বোক্ত দুই পত্নীর দেহ সমাহিত হয়েছিল, সেখানে পাদরী কারনাণ্ডারের শেষক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ডিসেম্বর উক্ত পাদরী বিবাহাদী লব্ধধনে যে গির্জাটি পঁচাত্তর হাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন, তাহা ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উক্ত গ্রাণ্ট সাহেব তিনজন ট্রাস্ট্রীর হাতে দশহাজার টাকায় খরিদ করে অর্পণ করেন। তাহা পরে বর্তমান গির্জায় পরিবর্তিত হয়। এই মিশনের গির্জানুসারে বর্তমান মিশন রো-র নামপত্তন। এই গির্জায় মিসেস হানা এলারটনের সমাধি বর্তমান, তিনি হেস্টিংসের সঙ্গে ফ্রান্সিসের ডুয়েল-যুদ্ধ ও চৌরঙ্গীতে সবেমাত্র দু'খানি বাড়ী ছিল, দেখেছিলেন। পাদরী জেম্‌স লঙ-কে বলেছিলেন এই গির্জার উৎপত্তি ও রক্ষার কথা কৌতুকাবহ নয় কি?

সৌভাগ্যক্রমে, এই ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের মোটামুটি ধারাবাহিক বৃত্তান্ত সেখানকার পুরানো রেকর্ড থেকে পাওয়া যায়। এই 'ওল্ড মিশন চার্চ'-এর চেহারা মোটামুটি একইরকম বজায় আছে, যদিও কিছু কিছু অংশ ভেঙে বদল করা এবং নতুন করে গড়ার দরকার হয়েছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পরে। এর পুরানো নথিপত্রে একাধিক সংগঠক ও প্রচার-কর্মীর নাম পাওয়া যায়, যেমন—ব্রাউন, টম্যাসন, করি ও ডিলট্রি। করি সাহেবের নাম থেকে করিস চার্চ লেনের নামোৎপত্তি। আর আর্চ-ডীকন ডিলট্রি তো স্বনামধন্য পাদরী। এঁরই হাতে ঐ ওল্ড-চার্চেই ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দত্তকবি মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা এবং মাইকেল নাম গ্রহণ।

এই মিশন-চার্চ থেকেই মিশন-রো পথের উৎপত্তি। তখনকার দিনে এই অঞ্চলের মিশনারীদের প্রথম গির্জাকে কেন্দ্র করে পথটি বিশেষ পরিচিত হয়ে পড়েছিল এবং গির্জার আপেপাশে বহু গণ্যমান্য লোকের বাস ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য—জেনারেল মন্সন, স্যার জন ক্লেভারিং এখানে দুটি বাড়ীতে থাকতেন। স্যার জন ক্লেভারিং এই মিশন রো-র বাড়ীতেই মরেছিলেন।

এই মিশন রো-র সামনে দিয়েই ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। পূর্বে স্কচ-গির্জার পরিবর্তে সেখানে কোর্ট-হাউস ছিল। থিয়েটার-বাড়ীর অবলুপ্তির পর এই কোর্ট-বাড়ীর তখনকার দিনের অপরাধীর প্রথম বিচার-কেন্দ্র। এই কোর্ট-বাড়ীর জন্যে এর সামনের পথটির 'ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট' নাম। এবং এই পথটি তখনকার দিনে গির্জার কোল থেকে আরম্ভ হয়ে বর্তমান 'রেড রোড'-এর স্থান অধিকার করে গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে অতীতকালের 'সরম্যান্‌স-ব্রিজ' এবং বর্তমানকালের খিদিরপুরের পোল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেকালের দীর্ঘ পথটি এখন নানা স্থানে নানাবিধ নামে বিভক্ত হয়েছে।

অতীতকালের আর একটি পথের প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন উইলস্ কলকাতার যে নক্‌শা তৈরী করেন, তাতে এই 'ম্যাঙ্গো লেন'-এর নাম লিখিত আছে। বোধ হয় এই গলিতে পথের ধারে বা কোনোস্থানে রসাল বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্য এইরূপ নামকরণ হয়েছে। আজ সেই ম্যাঙ্গো লেনের মধ্যে দিয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখ নিয়ে চারদিকে খুঁজলে একটিও 'আম' নামের রসাল ফলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবে ম্যাঙ্গো লেনের স্মৃতির সঙ্গে যে আমের নাম জড়িত আছে, তাতে মনে হয়, এখানে ঐ নামের বস্তুটি প্রচুর পরিমাণে ফলতো।

এইবার বর্তমানের মিশন রো-র চতুষ্পার্শ্ব দিয়ে একবার প্রদক্ষিণ করুন। আজকে এই গলিটি অতীতের স্মৃতির ভারে ওল্ড মিশন চার্চকে বুকে নিয়ে একপাশে পড়ে আছে, কিন্তু এরই কোল দিয়ে আর-একটি নতুন পথের সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম 'মিশন রো এক্সটেনশন'। এখন এই পথটি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের বুক থেকে পথ করে নিয়ে, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের পথের সঙ্গে মিলেছে। পাশে কারেন্সির বাড়ীটি দারোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে তার পথের সীমানা নির্দেশ করছে। এই মিশন রো এক্সটেনশনের উপর কলকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানির হেড অফিস। এ ছাড়া বহু বড় বড় সওদাগরী অফিস এই স্বল্পদীর্ঘ পথটির উপর। এখানে দিনের বেলা অফিস-যাত্রীদের কলরব ও ফেরীওয়ালার চীৎকারে ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হেস্টিংস ষ্ট্রীট প্রভৃতি পথের মতো মুখর হয়ে থাকে। কিন্তু অতীতের সেই মিশন রো ও ওল্ড মিশন চার্চ যার জন্যে এই অঞ্চল একদিন বিখ্যাত ছিল সেই গলির মধ্যে একবার ঢুকে দেখুন, দেখবেন গলিটি আজ আশ্চর্যভাবে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ হয়ে নিষ্প্রাণ দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতির ঝুলি নিয়ে অতীতের সেই 'ওল্ড মিশন চার্চ।' পরিবর্তনের পর পরিবর্তন হয়ে, আজ কলকাতার এ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা যে পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে অনুমান হয় যে, একদিন বর্তমান অবস্থাও পরিবর্তিত হয়ে অন্য এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে। তখন সামনের ঐ স্কচ-গির্জা, পাশে রাইটার্স বিল্ডিং, এমনকি লালদীঘিও যে পর্যায়ে এখন আছে, সে চিহ্নটুকু লুপ্ত হয়ে অন্য এক দৃশ্যের মধ্যে মুখ লুকাবে। ভবিষ্যতের সেই দৃশ্যটির ইঙ্গিত চোখের উপর ভেসে উঠতেই অতীতের 'রোপ-ওয়াক' এবং পরে তার 'মিশন রো' নামগ্রহণের ইতিহাসটি তুলে ধরলাম।

যতদিন না এই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে ঢুকেছিলাম ততদিন পর্যন্ত এই রাস্তাটার সম্বন্ধে একটা অন্যরকমের ধারণা ছিল। অলকেশ যখন বলত আমার অফিস, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের অত নম্বর বাড়ী। মনে মনে একটু ঘাবড়ে যেতাম। না জানি কত বড় বাড়ী কোন্ তলায় অফিস ঘর ইত্যাদি। অলকেশের ওপর শ্রদ্ধা জাগত শুধু ঐ কারণে। ঐ সাহেবী পোষাক পরানো ইংরাজী নামের গলিটির নাম শুনলে অলকেশের উন্নতি হয়েছে বলে মনে মনে খানিকটা ঈর্ষান্বিত হতাম। তবে যতদিন না এই গালভরা নামের গলিটির মধ্যে ঢুকেছি ততদিন পর্যন্তই এই ধারণা ছিল।

সেদিন কি বার ছিল মনে নেই, তবে সময়টা কানে এসে ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিয়েছিল—এখন বেলা বারটা। আর সে ঘণ্টা বাজিয়েছিল লালদীঘির কোণে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের গায়ে হেলান দেওয়া সেণ্ট এনড্রু নামে স্কচ্ গির্জার মাথার ঘড়িটি। এই ঘড়িই এখন ডালহৌসির কেরাণীকুলের ভাগ্যবিধাতা। হৃদপিণ্ড। ডালহৌসিতে সকাল দশটার সময় হাজার হাজার লোক এসে ঐ ঘড়ির দিকে প্রথম তাকায়। ঘড়ির নির্দেশানুযায়ী পা হয় দ্রুত অথবা লঘু। আবার বিকেলে বাড়ী ফেরার সময়ও একবার। কত দৃষ্টি যে প্রতিদিন ঐ নীরব ঘড়ি হজম করে তার ইতিহাস লেখা নেই। সেই একই দৃষ্টি নিয়ে আমিও তাকালাম তবে আমার তাড়া ছিল না তাই দৃষ্টিটায় একটু পার্থক্য।

সামনেই সেই সাহেবী পোষাক পরানো ইংরাজী নামের গলি, অতীতে যার নাম ছিল রাণী মুদিনীর গলি। ডান পাশে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের প্রাসাদতম অট্টালিকা। তার নিচের তলায় গলির মুখে দ্বাররক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছে নিউম্যানের বইয়ের দোকানটা। বাঁ পাশে বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের নতুন সুদৃশ্য বাড়ীটা এই সবে জন্মগ্রহণ করল। ওল্ড কোর্ট হাউস দিয়ে এই গলিতে ঢুকতে গিয়ে আজকে এ বাড়ীটা দেখে আপনায় একবার দাঁড়াতে হবে। তারপর তো রয়েছে স্বদেশ বিদেশ নানাদেশের লোকের অস্থায়ী বাসিন্দা হবার জন্যে সহরের বিখ্যাত হোটেল গ্রেট ইষ্টার্ণ।

এই গলির মুখে দাঁড়িয়েই একবার ১৭৫৭ সালের মধ্যভাগে চলে যান। এই সময়ই সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। একবার চোখ বুজিয়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করুন সেদিনের সেই দৃশ্যটি। জেনারেল পোষ্টাফিসের সংলগ্ন স্থানটি জুড়ে পুরাণো ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা। সিরাজ আক্রমণ করতে চান এই কেল্লা। রাইটার্স বিল্ডিং যেখানে আছে ঠিক তার পিছনে একটি প্লে-হাউস ছিল সেইখানে নবাব সৈন্যেরা একটি ব্যারাক স্থাপন করে তোপ দাগতে লাগলেন। সিরাজকে বাধা দেবার জন্যে দুর্গ মধ্যে থেকে গবর্ণর ড্রেক সাহেব ও হলওয়েল দুর্গ রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেই সময় নবাব সৈন্যকে বাধা দেওয়ার সুবিধার জন্য লালদীঘির চারিধারের বিরাট বিরাট বাড়ী সব ভেঙ্গে ফেলা হল ও একটি অস্থায়ী খাতও খনন করা হল। একদিকে নবাব সৈন্য অপরদিকে ইংরাজ সৈন্য। আর কামানের জলন্ত গোলা। বড় বড় যে কটা বাড়ী ছিল তার অধিকাংশই কামানের গোলার কবলে পড়ে ধরাশায়ী হল ও আগুনে পুড়তে লাগল।

ইংরাজরাও চারিদিকে তোপমঞ্চ করে কামান দেগে নবাব সৈন্য তাড়াবার তোড়জোড় করতে লাগল। লালদীঘির চারিদিকে তোপমঞ্চ। এই ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটেই দুটো তোপমঞ্চ ছিল। আজকাল যেখানে ক্লাইভ ষ্ট্রীট সেখানে কোম্পানীর সোরার গুদাম ছিল সেইখানে একটি তোপমঞ্চ। হেষ্টিংস হাউস ষ্ট্রীট, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ও গবর্ণমেণ্ট প্লেসের সন্ধিস্থলে একটি তোপমঞ্চ। আর রাণী মুদিনীর গলির মুখে একটি তোপমঞ্চ। কিন্তু এত করেও ইংরাজরা পারল না কলকাতা রক্ষা করতে। সিরাজ জয় করে নিলেন কলকাতার সহর। ধ্বংস করলেন ইংরাজদের বড় বড় গির্জা, বিখ্যাত সেণ্ট এন্ গির্জা এই সময় ধ্বংস হয়েছিল। ইংরাজের বহু সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছিল।

আর তার পরেই রচিত হল ইতিহাস, বিখ্যাত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী।

সে দিনের সেই রাণী মুদিনী গলিই আজকের বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট। এই পথের পার্শ্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান বা জমিদার সভা ছিল বলে এই নাম হয়েছিল। এই গলিই প্রমাণ করছে সিরাজের সঙ্গে ইংরাজের তুমুল যুদ্ধ। ইংরাজরা এই গলির মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে নবাব সৈন্যের ওপর গোলাবর্ষণ করেছিল আর নবাব সৈন্যরা ইংরাজ নিধন করবার জন্যে এই গলির মধ্যেই ঢুকে পড়েছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ এ কে রায় ও মিঃ কটন বলেছেন—এই থেকেই এ গলির নাম হয়েছিল—'রণ মদ গলি'।

আর সেই রণমদ থেকেই রাণী মুদি হয়ে গেছে। কিন্তু কোনটা যে ঠিক আজও তা সন্দেহ আছে। রণ মদ যদি নাম হয় তাহলে নামের একটা অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু রাণী মুদিনীর গলি হলে সে রাণী মুদিনীর অস্তিত্ব কোথায়? এই গলির কোথায় ছিল সেই মেয়ে মুদিনীর মুদির দোকান? যদি কোন চিহ্ন কোথাও ছুঁয়ে থাকে এই লোভে নিউ ম্যানের দোকানেরপাশ দিয়েঢুকে পড়লাম ঐ গলির মধ্যে। সামনের দিকটা চওড়া হয়ে ভেতর দিক্‌টা সরু হয়ে গেছে। কয়েকটি অফিসের সাইন বোর্ড চোখে পড়ল। একটি বটগাছ রয়েছে, বট গাছটার কত বয়স কে জানে? নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এ বটগাছ ছিল কিনা জানা নেই। বটগাছের চারিদিক বেষ্টন করে কটা বড় বড় ভ্যান গাড়ী। গাড়ীর গায়ে লেখা আছে, ডিয়াস´ গ্যারেজ। সামনেই বিরাট গ্যারেজটিকে দেখতে পেলাম। তারপর যত এগিয়ে যেতে লাগলাম পথটি সরু হয়ে বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের সঙ্গে মিশেছে। সেই সরু পথের দুধারে যে সব বাড়ী রয়েছে সেই বাড়ীগুলির ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগে এত অন্ধকার। কত বছরের পুরণো সে সব বাড়ী কে জানে? আজকের কলকাতার সহরে এই ধরণের বাড়ী দেখলে সন্দেহই জাগে। মনে হয় এরা যেন নিতান্তই অপাংক্তেয় হয়ে এখানে পড়ে রয়েছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে এক দল ইঁদুর চীৎকার করে অন্ধকারের আরও গভীরে পালিয়ে যায়। শোনা যায়, এই সব বাড়ীতে নাকি ইহুদীরা বাস করত, তারা রাতের অন্ধকারে এই সব বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে পথচারীদের প্রলুব্ধ করে ঘরে নিয়ে আসত। একদিন এ ক্ষেত্র বারবনিতাদের আস্তানা হয়ে উঠেছিল এ কথাও আজ গল্প।

এই রাণী মুদিনী গলির মুখে একটি কাঠের বন্ধনী ছিল। আজ যেখানে কুক এণ্ড কেলভে কোং, তার পাশ দিয়েলার কিন্স লেন সুরু হয়েছে। একদিন ওয়েলেসলী প্লেস পার হয়ে লারকিন্স লেন দিয়ে একটা কাঠের রক্ষা বন্ধনী রাণী মুদিনীর গলি পর্যন্ত এসেছিল। এই রকম রক্ষা বন্ধনী সারা কলকাতার চারিদিকে ছিল। উদ্দেশ্য, সেকালের কলকাতা কেবলমাত্র দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করা যেত না বলে সেইজন্যে সহরের চারিদিকে একটি সুদীর্ঘ কাঠের রক্ষা বন্ধনী দিয়ে সুরক্ষিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। এ দিয়ে আর কিছু না হক- অন্ততঃ চোর ডাকাতের ঢোকবার সুবিধে ছিল না।

কিন্তু রাণী মুদিনী কোথায় দোকান করেছিল? কোথায় সে সুন্দরী মেয়ে মুদিনী দোকানের পাটায় বসে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে জিনিষ বিক্রী করত? আর এই চত্বরের সব লোক তার দোকানে ভীড় জমিয়ে জিনিষ সওদা করত!

শুধু জিনিষ কেনাই তাদের উদ্দেশ্য নয়—রাণী মুদিনীর মিষ্টি কথা, চটুল চাউনি, মধুভরা হাসি এ সবও তাদের উপরি পাওনা ছিল।

অবশ্য সবই কল্পনা। তবু যদি আরও চিন্তার গভীরে ঢোকা যায় তাহলে প্রশ্ন জাগে আচ্ছা সত্যি সত্যিই রাণী মুদিনীর কত বয়স ছিল? ছিল কি সে সুন্দরী? সুন্দর সুঠাম দেহের খাঁজে খাঁজে যৌবনের উকিঝুঁকি? তা না হলে ইতিহাসের বিখ্যাত রাণী মুদিনী তখনকার দিনে ইংরেজের করুণা লাভে ধন্য হল—কেমন করে? কি যাদু জানত রাণী মুদিনী? কোন্ আকর্ষণে সে ইংরাজ কোম্পানীর কাছ থেকে এত বড় উপাধিটা পেয়ে গেল? কোন সম্মানী ইংরাজের মনের মানুষ ছিল কিনা—তারও কোন ইতিহাস ঐতিহাসিকরা স্বর্ণাক্ষরে লিখে যান নি। যাই হক সবই আজ প্রশ্ন। তবে চন্দ্রনাথ পাল যেমন চাঁদ পাল ঘাটে মুদির দোকান করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, তেমনি এই গলিতে রাণী মুদিনী।

আবার এই গলি দিয়ে বেরিয়ে কসাইটোলা ষ্ট্রীট ওরফে বেন্টিক ষ্ট্রীটের পাদপীঠে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই সুতারকিন ষ্ট্রীট। এঁকে বেঁকে চলে গেছে আরও কটি গলির মিছিল।

আরও কয়েকবার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে এই গলিরই অভ্যন্তরে তাকালাম কোথাও একটা মুদির দোকানের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু দু একটি পান বিড়ির দোকান ছাড়া আর কোথাও কোন চিহ্ন নেই। অতীতে যে এখানে কোন মুদির দোকান ছিল—এ কথা আজ ইতিহাসই। ইতিহাসের পাতায় শুধু লেখা আছে এর নাম। তবু যে সব লোকগুলি এ পথে চোখে পড়ল। তাদের দিকে তাকিয়ে মনে প্রশ্ন জাগল—এদের কারোকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়—হ্যাগো তোমরা কি কেউ রাণী মুদিনীর বংশধর? জানি তারা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাকে পাগল ঠাওরাতো।

কিন্তু তবু নিশ্চিন্ত হতাম। নিশ্চিন্ত হতাম এই ভেবে যে—রাণী মুদিনী নামটাই শুধু সার্থক নয়। ছিল একদিন এ তল্লাটে রক্তমাংসের একটি সুন্দরী মেয়ে মানুষ। সে ছিল মুদিনী। মুদির দোকানের পাটায় বসে সে জিনিষ বিক্রী করত। আর ইতিহাস এর নামই বইয়ের পাতায় ধরে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হয়ে সে বেঁচে আছে।

এই নিবন্ধটি লিখতে এই বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

A. K. Roy—

Short History of Calcutta H. E A. Cotton—
Calcutta Old and New.

কলকাতার মধ্যবিন্দু এই এসপ্লানেড। এসপ্লানেডে কেউ আসেন নি বা এসপ্লানেড কেউ দেখেন নি অন্ততঃ সেরকম মানুষ এই কলকাতায় মিলবে না। সুতরাং আমি যার কথা বলব তাকে সকলেই দেখেছেন। সকলেই জানেন তার কথা। তবে দেখেছেন তেমন ভাল করে দেখেন নি। দেখেছেন পাড়ার পরিচিত বাড়ীগুলির মতই। কিন্তু যদি ভাল করে দেখতেন? যদি ভাল করে দেখতেন তাহলে পেতেন অনেক কিছু। যেমন দেখছেন অপরূপ সাজে সাজানো এসপ্লানেডের প্রতিটি কোণ। বিস্তৃত জায়গাজুড়ে কার্জন পার্কের বুক ভেঙে ট্রাম কোম্পানী যেমন তার দেহ মেলে ধরেছে। আজকের এসপ্লানেডে আসুন তাহলে দেখতে পাবেন এটি একটি ট্রাম-স্টেশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অহরহঃ ট্রামনিনাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। শব্দের মধ্যে ট্রাম-নিনাদই প্রকট। কিন্তু দৃশ্যের মধ্যে পাবেন বহু বিচিত্র সাজে সেজে কয়েক সহস্র নানাদেশীয় মেয়েদের ভীড়। এখানে মেয়ে পাবেন বহু বিচিত্র দেশের। অবশ্য সাইনবোর্ডে। ভারতবর্ষকেই ভাগ করুন না সেখানেই ত রয়েছে কয়েক ধরণের। তারপর তো ইউরোপ, আমেরিকা এশিয়ার নানান ঘরের কুল-ললনরা এখানে বাসা বেঁধেছেন। তাঁদের নিত্য-নতুন বহু বিচিত্র রংয়ের সাজ। এসপ্লানেডে যাঁরা আসেন তাঁরা তাই হাঁ করে দেখেন আর ভাবেন—কি বিচিত্র এই সহর? আর কি বিচিত্র এসপ্লানেড।

আপনিও যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে তাকিয়ে দেখুন তামাম এসপ্লানেডের বিস্তৃত ভূভাগ। গ্রাণ্ড হোটেলটা দেখে আপনার কি মনে হয়? ওখান দিয়ে আপনি যখন চলেন তখন কি আপনি নিজেকে একটু সাহেব সাহেব ভাবেন না? ইচ্ছে করে না একবার ফিরপোতে লাঞ্চ খেতে? তাছাড়া এপাশে চৌরঙ্গীর ওপরে রয়েছে মেট্রো সিনেমা। তার বুকে লটকানো সব মেমসাহেবের ছবি।

তারপর ওপাশে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, তারই একটু ধার ঘেঁষে ক্লাইভের কীর্তি ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। অন্য কোণে গভর্ণর হাউস। আগে এখানে থাকতেন বড়লাট বা ছোটলাট, এখন থাকেন আমাদের রাজ্যপাল। তারপর

পাবেন বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। তারা কলকাতার আকাশ ছোঁবার জন্যে প্রাণপণে প্রতিযোগিতা করছে, তার সাক্ষীস্বরূপ নিউ রাইটার্স বিল্ডিং। এছাড়া আরও পাবেন এসপ্লানেডের আশে-পাশে অনেক নামকরা বাড়ী। টাওয়ার হাউসের ওপরে রাত্রিবেলা নিশ্চয়ই তাকিয়েছেন। ওখানে উষা কোম্পানীর সেলাই কল। আর ভিক্টোরিয়া হাউসের মাথায় ত দেখেছেনই। ওখানে গ্লোবটি এখনও আছে। ঠিক এই ভিক্টোরিয়া হাউসের গেট বরাবর তাকান দেখতে পাবেন সার আশুতোষ মুখুজ্যের মর্মর মূর্তি। সেদিন একটি চাষাড়ে লোক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল সে হঠাৎ এই মর্মর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল আশুতোষ মুখুজ্যের গোঁফজোড়ার দিকে। তারপর অস্ফুটস্বরে কি বলতে বলতে চলে গেল।

আপনি অনেকবার এই চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়েছেন কিংবা না দাঁড়িয়ে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট পাশে ফেলে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে এগিয়ে গেছেন? কিন্তু যদি দাঁড়াতেন, তাহলে একটু ভাবতেন। আর ভাবলে মনে আসত এই মর্মর মূর্তিটির কথা। একদিন যে ইংরেজই এই মহান ব্যক্তিকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার উপাধি দিয়েছিলেন সেকথা মনে আসত। আরও মনে আসত এই জায়গাটিতে এই মর্মর মূতি স্থাপনের কৃতিত্ব।

এখানে দাঁড়িয়েও দেখতে পাবেন কিংবা ধর্মতলার মুখে দাঁড়িয়েও সোজাসুজি তাকাতে পারেন। ধর্মতলার ট্রাম থেকে নেমে একটু সামনে দিকে তাকান। দেখতে পাবেন কয়েকটি ফলের দোকান। ফলের দোকান দেখে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ কলকাতার সহরে এরকম ফলের দোকান প্রচুর আছে। তবে এর কিছু তারতম্য আছে। এগুলি ফলের দোকান নয় যেন এক একটি মসজিদের গুহা। আকাশকে এখানে তেরপল চাপা দিয়ে মিয়া সাহেবেরা রসিকতা করেছেন। এবং সেইজন্যে দোকানগুলি খানিকটা অন্ধকারে আশ্রয় নিয়ে বসেছে। সম্ভবতঃ এই কৌশল রোদ-বৃষ্টি থেকে তাদের বিপণি বাঁচাবার জন্যে। যাই হোক, এখানে ঝুলছে পাকা টসটসে থসথসে থোকা আঙ্গুর। যেন আঙ্গুরলতা মেয়ের প্রথম সংস্করণ। তারপর আপেল। আপেল গালে লাল আভা নিয়ে ঝুলছে, দুলছে, আনন্দে নৃত্য করছে আর পথিকদের লোভ জাগাচ্ছে। কিন্তু পথিকের ঐ দেখাই সার। ক্রয় করার ক্ষমতা কজনের আছে? আরও রয়েছে বেদানা, কমলা, খেজুর, আকরোট, কাজুবাদাম কত রকমের মেওয়া ফল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের খানিকটা এখানে এলে মেলে।

পাশাপাশি অনেক দোকান। শুধু ফলের দোকান নয়, পান-বিড়ি, ষ্টেশনারী এমনকি ঘড়ি সারানোর দোকানও আছে।

সে যাকগে, কথা হচ্ছে আমার, দোকান নিয়ে নয়, মুসলমানদের একটি মসজিদ নিয়ে। ওরা এখানে নিজেদের স্বত্ব তৈরী করেছে শুধু একটি মসজিদকে ঘিরে। একটি মসজিদই এখানে সহস্র মুসলমানের হৃদস্পন্দন। এই ফলের দোকান গুলোর সামনে ফুটপাতের ওপর দেখুন। একটি পাথরের তোরণ। তোরণের নীচে এখন এই দোকান ব্যবসায়ীদের বসবার জায়গা, শোবার জায়গা, আরাম করে পায়ের ওপর পা দিয়ে আড্ডা মারবার জায়গা। কিন্তু আসলে এই তোরণটি অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছিল ঐ সামান্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নয়। ওটির কারুকার্য দেখে মুসলমান স্থাপত্যের প্রশংসা করতে হয়। সামান্য একটি উঁচু একতলা সমান তোরণ। তার ওপর চুড়ো। চারটে সরু সরু ঠ্যাঙের ওপর চুড়োটি দাঁড়িয়ে আছে। আপনি বা আমি কেউ কখনও যেতে যেতে থমকে পড়ি না। তবে বৃষ্টি পড়লে কেউ কেউ তার তলায় দাঁড়াবার জন্যে ছুটে আসে। কিন্তু কজনই বা দাঁড়াতে পারে সেখানে? তবে যত ছোটই হোক বা যত তুচ্ছই হোক স্মরণ করিয়ে দেয় একটি সাল ১৮৭৫ আর স্মরণ করিয়ে দেয় একটি স্মৃতি। ওয়েলসের প্রিন্স বাহাদুর এইচ আর এইচ এলবার্ট এডোয়ার্ড এখানে এসেছিলেন; তাঁরই স্মরণার্থে নবাব আবদুল গণি ও তাঁর পুত্র ঢাকার খানবাহাদুর নবাব আসানউল্লা এই তোরণটি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই তোরণটি বাঁয়ে রেখে আপনি একটু দৃষ্টি সঞ্চালন করে ফলের দোকান গুলোর সিঁথির ওপর তাকান, দেখতে পাবেন একটি লৌহ গেট। গেটের দুটি পিলার। পিলারের গায়ে অস্পষ্ট ক'টি আরবী শব্দ। পড়বার লোক জুটল না তাই পড়ান হোল না। কিন্তু মনে হয় এই কটি কথা লেখা আছে।

This Musjid was created during the Government of Lord Auckland G. C. B. by the prince Gholam Mahomed, son of the late Tippo Sultan, in gratitude to God and in commemoration of the Honourable Court of Directors Granting him arrears of his stipend in 1840.

ওখানে যদি একথা লেখা না থাকে তবে মসজিদের কোথাও এক জায়গায় প্রস্তরফলকে লেখা আছেই। ইংরেজ বীরকে সম্মান করতে জানে। টিপুসুলতান ছিলেন বীর। সেই বীরকে পরাজিত করে ইংরেজ টিপুকে

ভোলেন নি, তাই তাঁর বংশধরদের টালিগঞ্জের নবাব আখ্যা দিয়েছিলেন। এবং সেইখানেই তাঁদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে ভাতা ঠিক করে দিয়েছিলেন। যদিও টিপুর বংশধররা সবাই কোম্পানী বাহাদুরের বন্দী ছিলেন।

যাই হোক এই মসজিদই সেই টিপুরই বীরত্বের জয় নিশান। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ ভাতা যে কোম্পানীর কাছ থেকে পেতেন সেই ভাতার অর্থ দিয়েই এই প্রসিদ্ধ মসজিদ। এই সামান্য অঙ্কের টাকা দিয়ে এত বড় মহানুভবতা। এখানে প্রতিদিন আসে অগণ্য মুসলমান। তারা কেউ কাজ করে হগমার্কেটে, কেউ বা চাঁদনী চকে। তারা এখানে এসে হাত পা ধুয়ে বসে যায় হাঁটু গেড়ে আল্লাকে প্রাণ খুলে ডাকতে। হে আল্লা, খোদা-তাল্লা আমার আদাব গ্রহণ কর। সহস্র মুসলমানের সেই নীরব-ডাক আল্লা কি শুনতে পান না?

এসপ্লানেডের এ কোণে দাঁড়িয়ে দেখুন ঐ বিরাট মসজিদের ওপরের মিনারগুলি। গুণতে পারবেন কটা মিনার? চেয়ে দেখুন মুসলমান শিল্পের স্থাপত্য। মনে করে দেয় না কি নবাব ও সুলতানদের শিল্পবোধ? চমকই লাগে এই আধুনিক এসপ্লানেডে এই অতিপ্রাচীন শিল্পের প্রকাশ দেখে। এখানে শিল্পবোধ শ্রেষ্ঠ নয়, শ্রেষ্ঠ এখানে ইতিহাস। ঐতিহাসিক সত্য এখানে মহীশূরের বীর টিপু সুলতান।

পুরনো কলকাতায় এর পাশে ছিল, কুক কোম্পানীর আড়গড়া—অর্থাৎ ঘোড়ার আস্তাবল। এখন এখানে বৃহৎ অট্টালিকা সে স্মৃতি মুছে দিয়েছে। আগে এই রাস্তার দুই পাশে বড় বড় খানা ছিল। সেই খানা দিয়ে দুর্গন্ধ আবর্জনা সর্বদা যেত। চিন্তা করুন সেদিনের সেই ধর্মতলা। আজকের মাণিকতলা খাল পাড় দিয়ে যেতে গিয়ে হয়ত বুঝতে পারবেন। আজকের মাণিকতলার রাস্তা পাকা কিন্তু সেদিন ধর্মতলা পাকা হয় নি। পাকা হতে আরও অনেকগুলি বছর এগিয়ে যেতে হয়েছিল। উত্তর দিক থেকে একটা খাল এই রাস্তা দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছিল। চাঁদপালঘাট থেকে বেলিয়াঘাটা সল্ট লেক বা ধাপা পর্যন্ত সেই খাল প্রবাহিত ছিল। এই খালের উপর দিয়ে বড় বড় মালের নৌকা যেত। কলকাতা সেটেলমেন্ট প্রস্তাবে এই খালের নক্সা আছে। এই খালটি কলভিন ঘাট বা কাঁচাগুড়ি ঘাট দিয়ে আরম্ভ হয়ে হেস্টিংসের পুরাতন সমাধি ক্ষেত্রের পার্শ্ববাহিনী ঘুরে বরাবর ধর্মতলা দিয়ে চলে গিয়েছিল। তখন এই জমিটা ছিল ওয়ারেণ হেস্টিংসের বড় জমাদার জাফর আলির।

আজকে সেই খালও নেই, নেই মালের নৌকা। এখন জল দেখতে গেলে ইডেনগার্ডেনকে পাশে ফেলে গঙ্গার দিকে হাঁটতে হবে। আজকে তাই এই মসজিদই সাক্ষ্য। মসজিদই প্রমাণ করছে ধর্মতলার পুরনো ঐতিহ্য।

আর একবার তাকিয়ে দেখলাম সেই মসজিদের অভ্যন্তরে। দুপুরের পড়ন্ত রোদ। ঝিমুনি লেগেছে পায়রাদের চোখে। কিন্তু দালানের উপর সাদা-কালো পাথরের বুকে হাঁটু গেড়ে বসে এক মনে নামাজ পড়ছেন ভক্তরা। আস্তে আস্তে হাত দুটো জড় হয়ে অজান্তে উঠে গেল কপালে, তারপর এগিয়ে এলাম—একবার থমকে দাঁড়ালাম গেটের মুখে। সামনে একটি মোল্লা ভিখিরী। হাত পুরে দিলাম পকেটে। উঠে এল এক মুঠিতে কয়েকটি নয়া পয়সার গোছা। ভিখিরীর প্রসারিত হাতে গুঁজে দিয়ে পথে এসে নামলাম।

[এই নিবন্ধটি লিখতে "Cotton's Calcutta's Old and New" বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।]

বড় বড় গাছের মাথার ওপর ঝাকড়া চুলের মত পাতার জঙ্গল। সেই জঙ্গলের শিরায় শিরায় চাপ চাপ অন্ধকারের কালো রং। সেই অন্ধকারকে ছিদ্র করে গর্জন করছে মাঝে মাঝে হিংস্র পশুর দল। একটি সরু পায়ে চলা পথ, অন্ধকারে যে পথটি মিশে আছে গাছপালার সঙ্গে একাত্ম হয়ে। দূর থেকে দেখা গেল একটি ছোট্ট নিষ্প্রভ আলোর নিশানা। আলোটি দুলছে দুল্‌কি চালে। হ্যারিকেনের আলোটি কাছে আসতে শোনা গেল উড়ে পাল্‌কি বেহারাদের পাল্‌কি বয়ে নিয়ে যাওয়া সঙ্গীত। কিন্তু তাদের সঙ্গীতের সুর যেন কেমন ভয়ের আমেজ। পাল্‌কি বেহারার সঙ্গে কটি লোক। তাদের হাতের মুঠিতে ধরা মোটা মোটা লাঠি। তাদেরও মুখে-চোখে ভয়ের নিশানা। ভয়ের হিমশীতল কাঁপুনি তারা নিয়ে চলেছে একরকম দৌড়ে। দৌড়ানোর পরিশ্রমে তাদের কামিজ ভিজে গেছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে অবিরল ধারায়।

আসছে তারা চিত্রেশ্বরী মন্দির দর্শন করে Pilgrims Track দিয়ে কালীঘাট—The road leading to Collygot পথ দিয়ে আসতে আসতে কসাইটোলার মোড়ে এসে রাত গভীর হয়ে গেল। বেহারারা বেঁকে বসল। তারা এই ভয়াবহ পথ পার হয়ে কিছুতে কালীঘাটে যাবে না। শেষ পর্যন্ত বেশী ভাড়া দেবার অঙ্গীকারে তারা যেতে রাজী হল। ভাড়া নয় তারা বেশী পাবে কিন্তু প্রাণের ভয় কোথায় যাবে? জঙ্গলের হিংস্র পশুর কামড়ের চেয়েও ডাকাতের আক্রমণ। কোথায় যে ঝোপঝাড়ে ডাকাতের দল লুকিয়ে অপেক্ষা করছে কে জানে? এখুনি হয়ত মশাল জ্বেলে 'হারে হারে' করতে করতে ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়বে।

এদিকে পাল্‌কি বেহারার দল 'হেইয়ো হেইয়ো' করে ছুটতে লাগল, হঠাৎ ভবানীপুরের মোড়ে আসতে অন্ধকার থেকে একদল লোক মশাল হাতে 'হারে হারে' করতে করতে ছুটে এল। এসে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রীর ওপর। বেহারারা পাল্‌কি ফেলে দিয়ে দে ছুট্‌। ডাকাতরা তীর্থ-যাত্রীদের

সব লুণ্ঠন করল। পাল্‌কির দরজা ঠেলে নারীদের গা থেকে গয়না খুলে নিল।

পরে আরও জানা গেল,—"১৭৯৫ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারীর একটি সংবাদে বেরোল—গত শুক্রবার রাত্রে লেফ্‌টেনণ্ট মার্শারের বাটীতে (রসা পাগলায়) ভয়ানক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। লেফটেনাণ্ট সাহেব বাটীতে ছিলেন না—তিনি সপরিবারে চুঁচুড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। বাড়ীটি দুইজন চৌকীদারের জিম্মায় ছিল। সোমবার রাত্রি প্রভাতের পূর্বে, একশত কি দেড়-শত ডাকাত, বন্দুক ও তরোয়াল লইয়া বাটী রক্ষাকারী চৌকীদারদের আক্রমণ করে ও সমস্ত টাকাকড়ি লুঠ করিয়া লইয়া যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, দুইজন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে ও ডাকাতি সম্বন্ধে তদারক চলিতেছে।

এখন এই ডাকাতি বিখ্যাত রসাপাগলা ডাকাতের দলবল করেছিল কি না তার কোন প্রামাণ্য ইতিহাস নেই! এমন কি ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ঐ রসা পাগলা ডাকাত বেঁচেছিল কি না তারও কোন প্রমাণ নেই। তবে চৌরঙ্গী থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ঐ পথটির নাম যে রসা পাগলা রোড ছিল তার প্রমাণ আছে। এখনও তার পূর্ব স্মৃতি জেগে আছে রসা রোড নামে।

তবে বিস্ময় জাগায় এই জন্যে যে, একটি ডাকাতের নামকে বিখ্যাত করে রাখার জন্য ঐ পথের নাম ঐরকম হল কেন? তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, তখনকার দিনে যেমন চন্দ্রনাথ পাল মুদির নাম থেকে চাঁদপাল ঘাট গড়ে উঠেছে, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটও এক সময় রাণী মুদিনী নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল তবে রসা পাগলা ডাকাতকে অক্ষয় করে রাখবার জন্যে তার নামে পথের নাম হবে না কেন? সে সময় হয়ত ঐ অঞ্চলটি রসা পাগলা ডাকাতের অত্যাচারে ভীত হয়ে উঠেছিল। ঐ অঞ্চলের গৃহবাসীরা দিনে-রাতে ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকত কোন্ সময় রসা পাগলা ডাকাত তার দলবল নিয়ে বাড়ী আক্রমণ করে।

আজকের চৌরঙ্গী রোড ধরে ভবানীপুরের দিকে এগিয়ে যান। ট্রাম-বাস-মোটর-রিক্সার কলরবকে ছাপিয়ে বিস্তৃত পথটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। দুপাশে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য সাজিয়ে দোকানীরা খদ্দেরের আশায় লুব্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। সেই সব দোকানকে কেন্দ্র করে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাথা উঁচু করে সহরের দক্ষিণাঞ্চলকে সুসংবদ্ধ ও সুসজ্জিত করে রেখেছে। সেই সব অট্টালিকার ভেতরে বাস করে সহরের বহু গণ্যমান্য নরনারী। ভবানীপুরের একাংশে একটি অট্টালিকায় বাস করতেন স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়। আরও একটি নাম আমাদের স্বাধীন দেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সে হল—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। স্যার আশুতোষের সুযোগ্য পুত্র বাংলার বীর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি ভবানীপুরের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এখন ভবানীপুরের কিছু অংশ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড নামেই সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

কিন্তু আগে এই জঙ্গলময় অঞ্চলটির একটি পুরো নামই ছিল—রসা পাগল রোড। তারপর আস্তে আস্তে যখন জঙ্গল কাটতে আরম্ভ হল, যখন এ অঞ্চলে সভ্য মানুষের বসবাসে আরম্ভ হয়, সহর হয়ে উঠল প্রায়াধুনিক, তখন এই রসা পাগলা নামকে একটু আধুনিক ছাঁচে ঢালবার জন্যে তাকে কেটে রসা রোড করা হল। তবে তারও ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। এইত পলাশী যুদ্ধের পাঁচ বৎসর আগে লিখিত হলওয়েলের বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারা যায়—

"The road leading to Collygot (Kalighat) and Dec. Calcutta.

এই জঙ্গল পরিষ্কৃত হইতে দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। ১৭৫৮খৃঃ অব্দে মীরজাফরের পুত্র মীরণ কোম্পানীকে যে কলিকাতায় নূতন সনন্দ দেন, তাহাতে চৌরঙ্গী জঙ্গল কতকাংশ কলিকাতার মধ্যে আর কতকাংশ পাইকান পরগণার মধ্যে বলিয়া উল্লিখিত ছিল। তখনকার দিনের আরও অনেক কাগজ পত্তর থেকে জানতে পারা যায়—"কলিকাতার বর্তমান লালদীঘির দক্ষিণ হইতে সুদূরে দক্ষিণ প্রান্তব্যাপী এক জঙ্গল বহু কাল হইতে বর্তমান ছিল। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী কর্তৃক কালীমূর্তি আবিষ্কার অথবা জঙ্গলেশ্বর প্রভৃতি শিব প্রতিষ্ঠার পরই ইহা "চৌরঙ্গী জঙ্গল" আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। হলওয়েলের সময়ে চৌরঙ্গী জঙ্গলের মধ্যে একটি রাস্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, চৌরঙ্গী থেকে সুদূর টালিগঞ্জ পর্যন্ত পথটিতে রসা পাগলা রোডের নামের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার ইতিহাস বহু কালের। তবে রাস্তাটি কলিকাতার সব চেয়ে পুরানো হলেও, কিন্তু নামটি নয়। রাস্তাটি পুরানো হওয়ার কারণ ঐ কালী-মন্দির। তখনকার দিনে এই সহর পরিক্রমায় গভীর জঙ্গল ভেদ করে যে দুটি স্থানে যাবার জন্যে দেশবিদেশ থেকে বহু নরনারী আসত—তা হলো চিত্রেশ্বরী মন্দির (জনশ্রুতি যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল চিতে ডাকাত) আর কালীঘাটের কালীমন্দির। যে মন্দিরকে কেন্দ্র করে একদিন এই সহরের পত্তন

হল। এই কালীঘাটের কালীমন্দিরের পুরনো ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, "কালীক্ষেত্র দীপিকায় আছে,—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে—কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস হইয়া-ছিল। এ সময় কালীঘাটের চতুপার্শ্ব—বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদিময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান কালীবাটীর পূর্বদিকে ঐ বনের মধ্য দিয়া এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ বর্তমানকালের "রসা রোড" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়া কালী-দর্শনার্থী নাগা, ফকির ও সন্ন্যাসীগণ দলবদ্ধভাবে যাতায়াত করিত এবং কালীঘাটের কার্য শেষ করিয়া, পদব্রজে গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রমে পৌছিত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৪৫খৃঃ অব্দে রচিত চণ্ডীকাব্যে গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে, ধনপতি চাঁদসওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

ত্বরায় বহিছে তরী, তিলেক না রয়
চিৎপুর, শালিখা সে এড়াইয়া যায়।
কলিকাতা এড়াইল, বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে, উত্তরিল অবসান বেলা।
ডাহিনে ছাড়িয়া যায়, হিজলীর পথ
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত।
বালুরঘাট এড়াইল, বেনের নন্দন,
কালিঘাটে গিয়া ডিঙ্গা, দিল দরশন।

কলিকাতা সভ্য মানুষের গোচরীভূত হবার আগে যে কালীঘাটের অস্তিত্ব ছিল তার প্রমাণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ১৫৪৫ সনের রচিত চণ্ডীকাব্য। তখনকার সময় থেকে হোক বা তারও বহু আগে থেকে হোক কালীঘাটে যাবার এই পথটি বর্তমান ছিল। এমন কি মনে হয়, এই পথটিই কলিকাতার সবচেয়ে পুরনো রাস্তা বলে ধরা যেতে পারে। তবে এই রসা পাগলা নাম যে অনেক পরে হয়েছিল তার প্রমাণ আজও রসা রোডের অবস্থিতি। এখন রসা রোডকে কেটে অনেক ছোট করা হয়েছে তবু তার অস্তিত্বই এখনও প্রমাণ করে সেই রসা পাগলা ডাকাতের কীর্তি।

তবু আজকে এই সুশিক্ষিত সভ্য নগরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে কেমন যেন অবিশ্বাসের মত মনে হয়, তখনকার দিনে কত তুচ্ছ লোককে কেন্দ্র করে

একটি ঐতিহাসিক ক্ষেত্র গড়ে উঠত। তবে এ কথা আজকে স্বীকার করতে হয় যে,—তখনকার দিনে, আজকের মত যেমন কাগজপত্রে বর্তমান সময়ের ইতিহাস ধরে রাখা হত না কিন্তু এই ধরণের নামের পিছনে সেদিন ইতিহাসকে ধরে না রাখলে আজ বুঝি আমরা আমাদের সহর-জন্মের অন্ধকার ইতিহাসের পিছনে পড়েই থাকতাম।

তবু আজ রসা পাগলা ডাকাতকে কেন্দ্র করে চিন্তা করতে পারি সেদিন এ অঞ্চলে কিরকম ডাকাতের আনাগোনা ছিল।

এই নিবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। Cotton's Calcutta Old and New, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের সেকালের একালের কথা।

অবাক হবারই কথা। এ শহরে আপনি ও আমি বাস করি, অথচ এ শহরের সম্পর্কে আমরা কতটুকুই বা জানি। সাজানো একটি শহরের চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ খোসমেজাজে বলতে পারি—বাঃ কি সুন্দর শহর এই কলকাতা। এ-ছাড়া আর কি-ই বা আমরা বলতে পারি। কিন্তু যদি এই শহর-ইতিহাসের পাতা ওলটাতে সুরু করি তাহলে দেখতে পাব—এমন অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা, অনেক নাম এই শহরের ইতিহাসের সঙ্গে জুড়ে আছে যা কলকাতার প্রায় শতকরা নিরানব্বুইটা লোক জানে না। যেমন এ শহরের একদিন নাম ছিল—আলিনগর।

আলীপুরের নাম অবশ্য জানেন। নাম কেন জায়গাটিতে শহরে থাকাকালীন বহুবার ঘুরে এসেছেন। আলীপুরে দেখবার মত অনেক বস্তুরই সন্ধান পাবেন। কারণ এই আলীপুরের সঙ্গে একদিন যোগ ছিল মুসলমান নবাবদের। তারপর ইংরেজরা এদেশ লুটে নেবার পর ইংরেজরাও এই আলীপুরে এসে থেকেছে। তারও প্রমাণ পাবেন—হেষ্টিংস হাউস, বেলভেডিয়ার রাজপ্রাসাদ। আজ যেখানে আলীপুরের বিখ্যাত আদালত সেখানে একদিন মীরজাফর তার প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। মীরজাফরকে অবশ্য আপনাদের নতুন করে চিনিয়ে দিতে হবে না—কারণ ইতিহাসে সেই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর আর দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর প্রণয়িনী মনিবেগম থাকতেন একটি সুদৃশ্য মনোরম প্রাসাদে। প্রাসাদটি ছিল আজ যেখানে জুলজিক্যাল গার্ডেন সেইখানে। তবে অনেকে বলে আজকাল যেখানে এগ্রিহর্টিকাল্চারাল সোসাইটির বাগান সেইখানেও একটি প্রাসাদ ছিল। সেই প্রাসাদে থাকতেন মীরজাফর। যাইহোক্, তাঁদের প্রাসাদ নিয়ে যে মতান্তরই থাকুক তারা যে এই আলীপুরেই বাস ক'রতেন এইটাই উল্লেখযোগ্য।

আপনারা হয়ত বলবেন তবে এই আলিনগর নামের অপভ্রংশই আলীপুরের অস্তিত্ব! কথাটা যে একেবারে মিথ্যে নয় একথাও সম্পূর্ণ

সত্য। কারণ ১৭৫৬ সালের পর থেকেই এই আলীপুরের উৎপত্তি। অথচ আলিনগর নামটাও ঐ ১৭৫৬ সালের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল।

সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণ একটি যুদ্ধের সূচনা থেকে। আপনাদের অনেকের মনে আছে সিরাজ এই কলকাতা আক্রমন করেছিলেন। এবং এই কলকাতা আক্রমনই পলাশী যুদ্ধের সূচনা। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ। এরই আগের বছরে অর্থাৎ ১৭৫৬ সালে এই কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা।

নবাব সিরাজদ্দৌলা নামটা মনে এলেই কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হয়েছিল এরই পর থেকে। ভারতের জনগণ স্বাধীনতা হারিয়েছিল এরই আমলে। অথচ এঁর কতটুকু দোষ! তামাম মুর্শিদাবাদ ঘিরে তখন ষড়যন্ত্র। মাঠে, ঘাটে, ঘরে চারিদিকে তখন গোপন পরামর্শ। এই উচ্ছৃঙ্খল নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করতে হবে। ইংরেজরা সুযোগ গ্রহণ করল। তাদের সঙ্গে হাত মেলাল এসে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানেরা। তারপরের ঘটনা তো আপনারা সকলেই জানেন।

কিন্তু আপনারা জানেন কি? যখন সিরাজ সিংহাসনে বসেছেন তখন মুর্শিদাবাদের ধনাগার শূন্য ছিল? রাজকোষে ছিল না একটা রাজ্য পরিচালনা করবার মত পর্যাপ্ত অর্থ। সেই অবস্থায় তিনি দাদু আলিবর্দির কথা স্মরণ করে ঘসেটি বেগমের টাকা নিয়ে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য কলকাতা আক্রমণ করলেন। অবশ্য কলকাতা আক্রমণের পূর্বে তিনি ইংরেজদের কাশীমবাজার কুঠি আক্রমণ করেছিলেম। কাশীমবাজার কুঠি বিনা রক্তপাতে জয় করে বুঝলেন এতে ইংরেজদের শায়েস্তা করা যাবে না। তাছাড়া ইংরেজরা তখন কলকাতাতেই কায়েমী করে বসবার চেষ্টা করছে। পুরনো ফোর্ট সংস্কার করে আরো মজবুত করছে, তার সঙ্গে আরও একটি দুর্গ বাগবাজারে পেরিং নামে সৃষ্টি করেছে। নবাব পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখে এই নতুন ফোর্ট ভেঙে ফেলতে বললেন কিন্তু ইংরেজরা কর্ণপাত করলেন না। তখন সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে কলকাতা আক্রমণ করলেন। অবশ্য লোকে বলে সিরাজের আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। কলকাতা জয় করে নিতে পারলে হাতে আসবে প্রচুর অর্থ, ওখানে আছে ধনরত্নের খনি।

যাইহোক, কলকাতায় তখন পুরনো ফোর্ট জেনারেল পোষ্টাফিসের স্থানটি জুড়ে। গবর্নর জেনারেল রোবার ডেক সাহেব-এর তত্ত্বাবধানে। সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন গ্রান্ট, সেনাপতি মিনাচন ও জমিদার হলওয়েল।

হঠাৎ একদিন অতর্কিতে সিরাজ তাঁর দলবল নিয়ে কলকাতা আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ঐ ফোর্ট। ইংরেজের যা-কিছু সঞ্চিত ধনসম্পত্তি সব ঐ ফোর্টের মধ্যে। তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। আর সে যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি হল প্রধানতঃ লালদীঘির এই চারিদিক ঘিরে। তখন এই লালদীঘির চারিদিকে এত বাড়ীঘর ছিল না। যে কটি বাড়ী তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজরা কামান দাগার অসুবিধের জন্য তাও ভূমিসাৎ করে দিল। লালদীঘির চতুর্দিকে কয়েকটি তোপমঞ্চ তৈরী করা হল, সেই তোপখানা থেকে নবাব সৈন্য বিতাড়নের জন্য মুহুর্মুহু কামানের গোলবর্ষণ চলল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা কলকাতা ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দের ঐকতানে আর মানুষের মরণ আর্তনাদে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল।

আজকের এই কলকাতায় লালদীঘির পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একবার এই অতীতের সেই সিরাজ আক্রমণের মুহূর্তটিতে চলে যান, তখন সেদিন এই সুরম্য উদ্যান ক্ষেত্রটিতে শুধু যুদ্ধের দামামা। দুই দলের তোপমঞ্চ থেকে বড় বড় কামানের গোলা এসে এই লালদীঘির উদ্যান ক্ষেত্রে অগ্নি-উৎসব সুরু করল। মাত্র কয়েকঘণ্টা যুদ্ধের উৎসব চালিয়ে সিরাজ জিতে নিলেন সেদিনের সেই কলকাতা সহর। গভর্ণর ডেক সাহেব প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বাঁচলেন। নবাব পুরনো ফোর্ট অধিকার করে নিলেন। ইংরাজগণ ফলতায় পালিয়ে বাঁচলেন। আজকের এই বিরাট সহরটি সেদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টায় নবাব সিরাজদ্দৌলা জিতে নিয়েছিলেন।

এর পরই সুরু হয়েছিল অন্ধকুপ হত্যা কাহিনী। হলওয়েল সাহেবের বর্ণিত কাহিনী থেকে জানতে পারা যায় সেদিনের কয়েক ঘণ্টায় ইংরাজের ওপর নবাব সিরাজ যে অত্যাচার করেছিলেন তার তুলনা হয় না। কিন্তু আসলে এ সংবাদটি পরে মিথ্যে বলে অনুমান করা হয়েছিল। কারণ সিরাজ নিজে অত্যাচারী ছিলেন এ কথা সত্যি। কিন্তু সেদিন যে অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়েছিল তার মধ্যে সিরাজের এতটুকু যোগ ছিল না। ইতিহাসে সিরাজকে কলঙ্কিত করবার জন্যেই এই ষড়যন্ত্র। যাই হক, সিরাজ কলকাতা জয় করে নিয়ে নামকরণ করলেন—আলিনগর। আর তার কর্তৃত্বাধীনে রেখে গেলেন মানিকচাঁদকে। মানিকচাঁদ আলিনগরের সর্বময় কর্তা হয়ে অত্যাচার সুরু করে দিলেন।

কিন্তু ওদিকে তখন মাদ্রাজে ক্লাইভ ও ওয়াটসন। তাঁরা ইংরাজ পরাজয়ের কাহিনী শুনে কলকাতা আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে রওনা হলেন। মাত্র সাত মাস পরে ইংরাজ আবার অধিকার করে নিলেন কলকাতা এবং সিরাজের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ চাইলেন। তখনও মুর্শিদাবাদের রাজকোষে ছিল না পর্যাপ্ত অর্থ।

তবু নবাব ইংরাজ বাসিন্দাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন প্রভৃতির জন্য এক কোটি সত্তর লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে মতান্তর আছে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কটন সাহেব বলেন,—ইংরাজ অধিবাসীর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, হিন্দু, মুসলমানদের জন্য ২০ লক্ষ টাকা ও আর্মিনীয়ানদের জন্য ৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি-পূরণ দিয়েছিলেন নবাব সিরাজদ্দৌলা। তবে মতান্তর যাই থাক, নবাব যে কলকাতা ধ্বংসের জন্য ইংরাজদের ক্ষতি-পূরণ দিয়েছিলেন—এ কথা সত্য। তবে এই আলিনগর নাম তখনও পরিবর্তিত হয়নি। ইংরাজ কলকাতা অধিকার করার অনেক পর পর্যন্তও কলকাতার নাম ছিল আলিনগর।

এই সময়ে নবাবের সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করছিলেন ক্লাইভ ও ওয়াটসন। মীরজাফর সিংহাসন লাভের আশায় ক্লাইভ ও ওয়াটসনের হাতে নবাবীস্বত্ব তুলে দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। হায়, সেদিন যদি একবার জানতে পারতেন সিরাজ! সামান্য ব্যক্তি স্বার্থের জন্য একটা দেশের কত বড় ক্ষতি দিনের পর দিন নবাবের অন্তরালে দানা বেঁধে উঠছে! মীরজাফরকে বিশ্বাস তিনি করতেন না, আবার না করেও উপায় ছিল না। কারণ, সমস্ত নবাবী সৈন্যের একমাত্র অধিকারী এই মীরজাফর।

[তখনকার দিনে সেনাপতির অধীনেই সমস্ত সৈন্যের ভার থাকতো, আর তার ব্যয় ভার করতেন সেনাপতি নবাবের কাছ থেকে প্রাপ্ত জায়গীরের আয় থেকে]

যাইহক, পলাশী যুদ্ধের পূর্বে মীরজাফরের সঙ্গে যে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র সন্ধি উভয়পক্ষে স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাতেই 'আলিনগর' নাম থাকবে না বলে লিখিত হয়েছিল। তবে প্রথম সন্ধিপত্রে সে কথা উল্লিখিত ছিল না। তবে একটা আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, কলকাতা থেকে অলিনগর নাম পরিবর্তিত হবার পরই ভারতবর্ষ থেকে মুসলমান রাজ্যের অবসান হয়।

আজ শুধু আমরা বসে বসে ভাবি, এ সহরের নাম যদি কলকাতা না হয়ে আলিনগর হত?

সম্ভবতঃ দাদু আলিবর্দির নামকরণ থেকে সিরাজ কলকাতার নামকরণ করেছিলেন—আলিনগর।

সেই কালীঘাটের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখিত চণ্ডীগ্রন্থে কালীঘাট ও তার নিকটবর্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ তদানীন্তন গ্রামসমূহের ধারাবাহিক নামোল্লেখ করতে হয়। চণ্ডীকাব্য লিখিত হয়েছে ১৫৭৭ অব্দে। চণ্ডীকাব্য ছাড়া ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান' গ্রন্থে কালীঘাটের উল্লেখ আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 'আইন আকবরী'তেও কালীঘাট মহাতীর্থস্থান বলে বিখ্যাত ছিল।

কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার সম্বন্ধে বহু গল্প প্রচলিত আছে। তবে তার মধ্যে যেটি বেশী প্রচলিত সেইটি এখানে উল্লেখ করলে যথেষ্ট হবে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে কালীঘাটের অনতিদূরে স্থানে স্থানে মানুষের বসবাস দেখা যায়। এ সময় কালীঘাটের চতুষ্পার্শ্ব ক্ষেত্র বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতাগুল্মাদিতে পরিবৃত ছিল। বর্তমান কালীমূর্তির সন্নিকটে ভাগীরথী ক্রমশঃ ধনুকাকারে বক্র হয়ে উত্তরবাহিনী ছিল। বর্তমান কালীকুণ্ড হ্রদ তখন গঙ্গা গর্ভস্থ অতলস্পর্শ দহ ছিল। পরে ক্রমশঃ ভাগীরথীর বয়ে আনা বালুকারাশির স্তর পড়ে যাওয়ায় গঙ্গার স্রোতের পরিবর্তন ঘটে। সেই জন্যে গঙ্গা কালীকুণ্ড হ্রদ থেকে পৃথক হয়ে এখন দক্ষিণবাহিনী হয়েছে। এইকালীকুণ্ড হ্রদের যে মাহাত্ম্য আছে, তার পূর্বোতিহাস লক্ষ্য করবার মত।

এই কালীমন্দিরেরই কোন স্থানে গভীর অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে এক ব্রাহ্মণ তার মধ্যে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে তপস্যা করতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা ভাগীরথী সলিলে সন্ধ্যাবন্দনাদি পাঠ করছেন, এমন সময় অনতিদূরে অনির্বচনীয় দিব্য বৈদ্যুতিক আলো তাঁর চোখে পড়ল। আলো দেখে ব্রাহ্মণের কৌতূহল বাড়ল এবং তিনি সেই দিকে অগ্রসর হয়ে দেখেন, ভাগীরথীর ঘূর্ণায়মান অতলস্পর্শ এক দহের (বর্তমান কালীকুণ্ড হ্রদের) কাছে এক স্থান থেকে ঐ দিব্য আলো বের হচ্ছে। ব্রহ্মচারী

এর কোন অনুসন্ধান না করতে পেরে আশ্রমে ফিরে গেলেন। কিন্তু কৌতুহল তাঁর নিবৃত্তি হল না। পরদিন দিনের বেলা গিয়ে দেখলেন, উক্ত দহের তীরে একটি পাথরের মত মুখ রয়েছে এবং তার কাছে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিতের মত চাকচিক্যমান মানুষের মত প্রস্তরবৎ অঙ্গুলি পড়ে রয়েছে। এটাই যে গত রাত্রে আলোক দর্শন করিয়েছিল, বুঝতে পারলেন। এই মনুষ্যসমাগমশূন্য গভীর অরণ্য মধ্যে প্রস্তরখোদিত মুখ ওপ্রস্তরবৎ পদাঙ্গুলি দেখে বিস্মিত হলেন এবং এর কারণঅনুসন্ধানে ইতস্ততঃ চারিদিকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কিন্তু এই ভীষণ অরণ্য মধ্যে মানব সমাগমের কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে উক্ত মূর্তি দেবনির্মিত বলে স্থির করে তাঁর পূজাদি আরম্ভ করলেন। পরে কালীর প্রত্যাদেশ মতে জানতে পারলেন যে, পূর্বকালে সুদর্শন ছিন্ন হয়ে তাঁরই অঙ্গ এইস্থানে পতিত হয়েছে। তখন আত্মারাম ব্রহ্মচারী ইতস্ততঃ অনুসন্ধানের পর কিয়ৎ দূরে 'স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নকুলেশ্বর ভৈরব'কে দেখতে পেলেন। সেই থেকে ঐ ব্রহ্মচারী উক্ত প্রস্তরবৎ সতী অঙ্গ যত্ন সহকারে ঐখানে রেখে প্রত্যহ কালীমূর্তি ও নকুলেশ্বরের পূজা করতে লাগলেন।

কিন্তু সঠিক কিছুই স্থির করে বলা যায় না। কালীঘাটের পীঠস্থানের গোড়ার কথা জনশ্রুতির মত বহুধা বিভক্ত। তবে অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, কালীঘাটের কালীমূর্তির প্রথম প্রকাশ অরণ্যবাসী বা গৃহত্যাগী শ্রমণ তৎপর কোন সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারীর দ্বারা হয়ে থাকবে। কোন সময় কে বা কারা এই মূর্তি স্থাপনা করলেন, তা স্থির করা দুরুহ। কালীর সেবাইতের মধ্যে ভুবনেশ্বর নামে জনৈক ব্রহ্মচারীর নাম পাওয়া যায়। ইনি কালীর বর্তমান অধিকারী হালদারদের পূর্বপুরুষের মাতামহ। এই ভুবনেশ্বরের পর থেকেই কালীর সেবাইতগণের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায়। সন্তানাদির মধ্যে ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর একটি মাত্র কন্যা ছিল। খনিয়ান গ্রামনিবাসী ভবানীদাস চক্রবর্তীর সঙ্গে ভুবনেশ্বর কন্যার বিয়ে দেন। এই ভবানীদাস সুরাই মেলের কাশ্যপ গোত্র পৃথ্বীধর চক্রবর্তীর পুত্র। পিতা তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে গৃহে ফিরে না আসার জন্য পিতার অন্বেষণে ভবানীদাস কালীঘাটে এসেছিলেন। ভুবনেশ্বর তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করেন।

ভবানীদাসের বংশীয়দের এখনকার উপাধি 'হালদার'। এই 'হালদার' উপাধির সম্বন্ধে অনেকের কৌতুহল আছে। এঁদের পূর্বপুরুষ ছিলেন

চক্রবর্তী। ভবানীদাসের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত 'চক্রবর্তী' উপাধি দেখা যায়। এরূপ শোনা যায়, নবাব আলিবর্দি খাঁ বাংলার শাসন কর্তৃত্ব পেয়ে এদের হালদার উপাধি প্রদান করেন। আলিবর্দি হিন্দুদের বিশেষ সাহায্যে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ'কে নিহত করে বাংলার শাসন কতৃত্ব প্রাপ্ত হন বলে হিন্দুদের সন্তোষার্থে ও নিজে হিন্দুধর্মের অপকারী নন এই সত্য প্রকাশের জন্য সমরেশ্বরী কালীদেবীর সেবাইতদের 'হালদার' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে এরা 'হালদার' বলে প্রসিদ্ধ। হালদার শব্দ সৈনিক পদবাচ্য, 'হাবিলদার' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। সাবর্ণি ভূম্যাধিকারী সন্তোষ রায় চৌধুরীর ১৭৫১ খৃষ্টাব্দের ভূমি দানের যে 'তায়দাদ' পাওয়া যায় তাতে দানগ্রহীতা কালীর জনৈক সেবাইতের নাম শ্রীগোকুলচন্দ্র হালদার ছিল। এই গোকুল হালদার ভবানীদাসের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ।

কালীর মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে—পূর্বাংশে যে কালীকুণ্ড হ্রদ আছে তার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। এর বর্তমান আয়তন কয়েক কাঠা মাত্র। পূর্বে এর আয়তন সমধিক বিস্তৃত ছিল। এই হ্রদের তীরেই যে কালীমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা কালীঘাট এসে গঙ্গায় না স্নান করে এই হ্রদেই স্নান করতেন।

অনেককাল আগে এখানে গঙ্গার অতলস্পর্শ দহ ছিল, ক্রমে চর পড়ে গঙ্গার পূর্বতীরস্থ তল উন্নত হওয়াতে তা হ্রদরূপে (lagoon) পরিণত হয়েছে। দহ গঙ্গার তল অপেক্ষা সমধিক গভীর এবং সেখানে স্রোতের আধিক্য থাকা বশতঃ পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। সুতরাং ঐ দহের পশ্চিমে গঙ্গার তল ক্রমশঃ সমুন্নত হয়ে উঠলে গঙ্গার স্রোত ঐ স্থান থেকে সরে গিয়ে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হতে লাগল এবং একটি ক্ষুদ্র হ্রদরূপে পরিণত হল। এই হ্রদ উড়িষ্যার চিল্‌কা হ্রদের মত সমুদ্র সম্ভব। তবে চিল্‌কা আরও বড়।

এখন গঙ্গা কালীর মন্দির থেকে প্রায় দুইশত হস্তের অধিক পশ্চিমে সরে গেছে। কালীঘাট এখন সমুদ্রতল থেকে ১১ হাতের অধিক উঁচু হয়েছে। এই কালীকুণ্ড হ্রদের জল পরিবর্তনের জন্য দুবার পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সেবাইতেরা চাঁদা করে—এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। কিন্তু সমুদয় জল অনেক চেষ্টা করেও সেচন করতে পারা যায় নি। হ্রদ সুগভীর ও গঙ্গার নিকটবর্তী বলেই জল সেচন করলেও ক্ষণমধ্যে আবার জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'বর্তমানে অবশ্য অন্য রূপ ধারণ করেছে।'

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোহরের কায়স্থ বংশীয় রাজা বসন্ত রায় দক্ষিণ বাঙ্গলায় সমধিক প্রভুত্ব লাভ করেন। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী কালীর সেবাইত থাকায় শাক্তপ্রধান বসন্ত রায় গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে কালীঘাট গ্রাম দান করেন। তবে এ সম্বন্ধে কোন লিখিত দানপত্রাদি আজও পাওয়া যায় নি। সেই বসন্ত রায়ই কালীর পর্ণ কুটীরের পরিবর্তে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করে দেন। সেই সময় কালীর ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন এখানে আর কোন ইটের বাড়ী ছিল না। চারিদিকে বেত্র, কচু প্রভৃতি লতাগুল্মাদি পরিবৃত ছিল। স্থানে স্থানে দু-একটি পর্ণকুটীর ছাড়া সমস্ত জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কালীঘাট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল—জগন্নাথ মন্দির ধ্বংসকারী হিন্দু-ধর্মদ্বেষী কালাপাহাড়ের কুদৃষ্টি এড়াত না।

ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে কালীঘাট আস্তে আস্তে কেমন করে সমৃদ্ধিশালী নগরী হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করতে হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুবাদার আজিমের কাছ থেকে ১৬,০০০ টাকায় সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই গ্রামত্রয় ক্রয় করেন। এর দু এক বৎসর পরে ইংরেজ কোম্পানী কলকাতার উইলিয়ম দুর্গের বহির্ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রস্তুত করবার অভিপ্রায়ে গোবিন্দপুর থেকে অধিবাসী-দের বাসস্থান উঠিয়ে দেয়। সেই সময় কতক অধিবাসী এই কালীঘাটে বাসস্থান ঠিক করেছিলেন। ভবানীদাসের বংশধর রামগোবিন্দ কালীঘাটের নিজ উত্তর সীমায় বর্তমান চড়কডাঙ্গার কাছে এসে বাস করেন। রামকৃষ্ণ ও রামশরণও কালীঘাটে বাস করেন। এই থেকেই কালীঘাটে জনবসতি দিন দিন বেড়ে ওঠে। এই সময়কে কালীঘাট ও ভবানীপুর গ্রাম সংস্থাপনের সূত্রপাত বলা যায়। কালীর সেবাইতদের যত্নে কালীঘাটে কুলীন ব্রাহ্মণদের প্রথম বাস দেখা যায়। পরে ইংরেজরা কলকাতায় রাজধানী স্থাপন করলে কালীঘাট ক্রমশঃ জনাকীর্ণ হয়। বড়িষার সাবর্ণি জমিদারদের প্রাধান্যের পূর্বে কালীঘাট গ্রাম কালীর সেবাইতদের অধিকারে ছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগস্টে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হলে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ইংরেজ কোম্পানী আপনাদের হিন্দু সৈনিকদের কালীর পূজা দেবার জন্য ১০৮ টাকা দিয়েছিলেন। সাবর্ণি চৌধুরী

সন্তোষ রায় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে মারা যান। তিনি মরবার আগে কালীঘাটের বর্তমান বড় মন্দির নির্মাণের সূত্রপাত করে যান। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের নির্মান কার্য সম্পূর্ণ হয়। কালীর মন্দিরের চতুপার্শ্বস্থ ভূমি বিঘা ৫৯৫।৪।৵০ দেবোত্তর বলে প্রসিদ্ধ।

অনেকে বলে কালী মন্দিরে পূর্বে নরবলি হত। তবে তার কোন সাক্ষ্য প্রমাণাদি নেই। তবে কাপালিকরা যে শাক্তমন্ত্রে এখানে এসে পূজা করত তার প্রমাণ আছে। গঙ্গাসাগরের কপিলাশ্রমে যাবার জন্যে নাগা সন্ন্যাসীরা এই কালী মন্দির ও নকুলেশ্বর দর্শন করে এই পথ দিয়ে দক্ষিণাভিমুখে চলে যেত। সেই জন্যে এর পাশ দিয়ে একটি সুপ্রশস্ত পথের সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদার হলওয়েল সাহেব সেই পথটিকে তাঁর বইতে উল্লেখ করে গেছেন 'The road leading to Collygot (Kalighat)'. পরে এই পথের নাম রসা পাগলা রোড বা রসা রোড হয়। চিৎপুর হয়ে কসাইটোলা দিয়ে চৌরঙ্গীর গভীর জঙ্গল ভেদ করে তীর্থযাত্রীরা পাল্কী চড়ে এই তীর্থক্ষেত্রে আসত। পথে কত তীর্থযাত্রীরা যে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাত—তার ইয়ত্তা নাই।

আজ সেই কালীঘাটের দিকে তাকিয়ে দেখুন। চারিদিকে কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, সাজানো দোকান, আলোর রোশনাই। মানুষের কলরবে একবারও কি আপনার মনে হবে—এই অঞ্চল একদিন গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল? বাঘের ভয়ে কেউ এই জঙ্গলে প্রবেশ করত না?

শুধু কালীঘাটের কালী মায়ের মন্দিরই আজ এখানে বিখ্যাত নয়। কালীঘাটের অনতিদূরে কেওড়াতলা শ্মশানও এখন উল্লেখযোগ্য। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কথাটাও যেমনি ভাবতে হয়, তেমনি মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করানোর স্থানটিও ঠিক করে রাখতে হয়। সেইজন্যে এই বহু পরিচিত কেওড়াতলা শ্মশান। এটি আর এখন কারও চোখ এড়িয়ে যায় না। এর কোলেই আছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিরাট স্মৃতি-মন্দির। তবে বহু পূর্বে কালীর সম্মুখীন গঙ্গার ঘাটেই শবদাহ হত। মিউনিসিপ্যালিটী কর্তৃক ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বর্তমান শ্মশানভূমি নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান শ্মশান ভূমি কালীঘাটের নৈঋত কোণে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে কালী মন্দির, ঈশান কোণে নকুলেশ্বর, এবং অনদিকে নৈঋত কোণে শ্মশান। কিন্তু শ্মশান বলিতে বর্তমানের যে শ্মশান, সে শ্মশান নয়। একটি অনাবৃত ভূমিখণ্ডের ওপর ছাইভস্ম, পোড়াকাঠের সমারোহ, কুকুর, বিড়ালের উৎপাত—একটি কদর্য স্থান শ্মশান বলেই পরিগণিত হত। থাকবার

মধ্যে ছিল কটি কেওড়া গাছ, যাদের কেন্দ্র করে এই স্থানটির পরিচয়। কালীঘাটের মন্দির সংস্কারের জন্য, নতুন সংযোগের জন্য অনেকেই উদার হয়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু শ্মশানের সুব্যবস্থার জন্য কারুরই মাথা ব্যথা জাগেনি। কালীর সেবাইত গঙ্গানারায়ণ হালদারের কন্যা বিশ্বময়ী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শশ্মানের ঘাট, বিশ্রাম ঘর ও যাতায়াতের পথ নির্মাণ করিয়ে দেন। তাঁর দানের কথা প্রত্যেকের জানা উচিত। এ ছাড়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের বেঞ্চক্লার্ক বরিশাল নিবাসী শ্রীশশিভূষণ বসু শ্মশানের বড় বিশ্রামঘর ও শিব-মন্দির তৈরী করে দিয়ে আরও উপকার করেন। আজ সেই শ্মশানঘাটে কলকাতার প্রায় লোক নিয়মিত শবদাহান্তে আসেন। বৃষ্টি, রৌদ্র, শীতের আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্যে যে বিশ্রামাগারে তাঁরা অপেক্ষা করেন সে বিশ্রামাগারের প্রয়োজন তাঁদের সর্বদাই অনুভূত হয়। সেইজন্যে উক্ত দুই ব্যক্তির কথা অবশ্যই স্মরণে রাখা উচিত। আজ যান্ত্রিক শবদাহ মেসিন এই শ্মশানের পাশেই রাখা আছে। তবে ক'জনে সেই সহজ পন্থা গ্রহণ করে শবদাহ করান, সন্দেহের বিষয়।

আবার ফিরে আসুন ঐ শ্মশান ঘাট থেকে গঙ্গার ঐ প্রান্তে। চেতলা যাবার সেতুটির সামনে এসে দাঁড়ান। তাকিয়ে দেখুন ওপারে। গঙ্গার ওপারের চেতলার মাটির পাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে উঠেছে। খেয়া পারের জন্য নৌকো বাঁধা আছে এ ঘাটে কিন্তু খেয়াপারের কারও দরকার হয় না। পায়ের পাতা ভিজিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে জলের ওপর দিয়ে ওপারে যাওয়া যায়, তখন নৌকো চড়ে জলের গভীরতা মেপে এক পয়সা খরচ করার কি দরকার? অবশ্য দরকার হয়, যখন জোয়ারে পরিপূর্ণ হয়ে যায় গঙ্গার বক্ষ। গঙ্গা যখন পূর্ণ যুবতীর রূপ নিয়ে যৌবনে টলমল করে, তখন বড় বড় নৌকো এখনও পার হয়ে যায় এ পথ দিয়ে।

আজ বড় বড় নৌকো এ পথ দিয়ে গেলে দর্শনার্থীরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু তারা জানে না গঙ্গার এই বার্ধক্য রূপ চিরকাল ছিল না। একদিন সেও ছিল যুবতী। তার বক্ষেও ছিল অজানা রহস্য। চোখে ছিল স্বপ্ন।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' এর কয়েক লাইন উল্লেখযোগ্য :..."চেতলার দাসদাসীগণকে এখনও যেরূপ বিকৃত দেখা যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে পারি না। সর্বত্রই দেখিতেছি তীর্থস্থানের সন্নিকটে সামাজিক নীতির অবস্থা অতি জঘন্য।

বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল নরনারী এই সকল স্থানে সর্বদাই আসিতেছে ও যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, তাহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া বা পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিবার মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্ম-জ্ঞানশূন্য লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারী-দিগের গৃহে এই সকল স্থান পূর্ণ হইয়া যায়।—যাত্রীদিগের বাসা লইতে হইলে অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই বাসা লইতে হয়। তাহারা দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়া ও রাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্তি করিয়া দুই প্রকারে উপার্জন করিতে থাকে। যখন রূপ ও যৌবন গত হয় তখন ইহাদের অনেকে ভদ্রগৃহস্থদিগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলণ্ডে যে সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট। সুদূর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাউলের নৌকো ও শালতী আসিয়া কালীঘাটের সন্নিকটবর্তী টালির নালা নামক খালকে পূর্ণ করিয়া রাখিত।

তাহলে চিন্তা করুন—টালির নালা খালের আজ কি অবস্থা? তবে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ভাঙ্গাগড়াই খেলা। আজ একদিকে ধ্বংস হচ্ছে আবার অন্য একদিকে নতুন আবির্ভাবের সূচনা জেগে উঠছে। তাই কালীঘাটের চতুর্দিকে অতীত স্মৃতির যে রোমন্থন—তা নতুনের আগমনে আবার মুখরিত। তাই ভাবীকালের দিকে তাকিয়ে শুধু নতুনকে আহ্বান জানাই।

যা কালী সৈব কৃষ্ণঃ স্যাং
যঃ কৃষ্ণঃ স শিবঃ স্মৃতঃ।
এষাং ভেদো ন কর্তব্যো
যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং॥
—কালীবিলাস তন্ত্র।

বর্তমানে কলকাতার চারিদিকে ফোটো তোলার বহু দোকান হয়েছে। নিত্য নতুন হাল ফ্যাসানের সুরুচিপূর্ণ বহু দোকান প্রত্যহ মাথা চাড়া দিয়ে শহর কলকাতার শ্রীবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে চলেছে। আপনার ও আপনার প্রিয়জনের চিত্র মনের পটে ধরে রাখার চেয়ে ফোটো তুলে এলবামে বা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখা আর অসাধারণ নয়। এখন সবার কাঁধেই ঝুলন্ত অবস্থায় শোভা পাচ্ছে ক্যামেরা।

কিন্তু এই ক্যামেরার কলকাতায় কবে আবির্ভাব ঘটল! তার আগে এই কলকাতায় ফোটোগ্রাফির অভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব চিত্রশিল্পী এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা তুলির সাহয্যে কলকাতার তথ্য ভারতের সে সময়ের মানুষ ও তাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সব চিত্র অঙ্কন করে গেছেন সেই সব চিত্রশিল্পীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। তাঁদের কাছে আজ সমগ্র ভারত ঋণী। সে সময় বিদেশ থেকে এঁরা ভারতে এসে ছবি না আঁকলে আজ আমরা সেকালের কোন কিছুই অনুমান করতে পারতাম না। সেই সব চিত্রশিল্পীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—টিলি কেটল, উইলিয়াম হজেস, ইয়োহান সোফানী, টমাস লংক্রেফট, রবার্ট হোম, জর্জ চিনারি, মিঃ হিকি, জর্জ ফ্যারিংটন, ও জরাম হামফ্রে, স্যামুয়েল ড্যানিয়েল, জন স্মার্ট, আর্থার উইলিয়াম ডেভিস, চার্লস স্মিথ, জেমস ওয়েলস, জন আলিফাউণ্ডার, ফ্রান্সিস সোইন ওয়ার্ড, স্যামুয়েল হোউইট, হেনরি সল্ট, উইলিয়াম ওয়েস্টল, উইলিয়াম জন হাগিনস, জর্জ বীচ প্রভৃতি। এ ছাড়া আরও অনেকে তখন এদেশে এসে ছবি আঁকার কাজে দু পয়সা উপার্জন করে গেছেন। এঁদের সব সময় লক্ষ্য ছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পোর্টেট। একটি বিজ্ঞপ্তি এখানে উল্লেখযোগ্য। বিজ্ঞপ্তিটি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলকাতার একটি ইংরাজী জার্ণালে লিপিবদ্ধ আছে:

"Protrait Painting :—Mr. Morris having taken a house in Wheler place, directly behind the Governor's house, begs

leave to inform such ladies and gentlemen who may be inclined to favor him with their sitting, that he is ready to paint them at the following prices :—

A head size	13 gold mohurs	
Three quarters	20	do
Kitcat	25	do
Half length	40	do
Whole length	30	do

১৭৮০ সাল থেকে প্রায় ১৮৪০ সাল পর্যন্ত বহু শিল্পী এদেশে এসে ছবি আঁকার কাজে সুনাম অর্জন করেছেন। তার মধ্যে উইলিয়াম হজেসের নাম সর্বাগ্রে। কারণ এই যুবক লণ্ডন থেকে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে এদেশে এসেছিলেন। এবং ১৭৭৮ সাল থেকে তিনি ১৭৮৪ সাল পর্যন্ত এদেশে কাটিয়ে ছবি এঁকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর এদেশে আসার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভারত ভ্রমণ করে যে সব ছবি এঁকেছিলেন সেইগুলি একত্র করে লণ্ডনে একটি বই প্রকাশ করেন, তার নাম দেন ট্র্যাভেলস ইন ইণ্ডিয়া। তার মধ্যে তিনি ভারতের নানা জায়গায় ১৭৮০ সাল থেকে ১৭৮৩ সালের সময়কার ইতিহাস ধরে রেখেছেন। এখন সে বইটি দেখলে আমরা দেখতে পাই তখনকার ভারতবর্ষের ছবি। সে সময়ের মানুষের চলাফেরা, আচার নীতি, বসবাস পদ্ধতি প্রভৃতির চিত্র চোখের ওপর ফুটে ওঠে। উইলিয়াম হজেসের মত আর একজন শিল্পীও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর নাম 'জন সোফানী'। তিনি ১৭৮০ সালে কলকাতায় এসে লক্ষ্ণৌতে গিয়ে বাস করেন। তারপর ১৭৮৯ সালে আবার কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি গণ্যমান্য ইউরোপীয়ানদের পোরট্রেট ছবি এঁকেছিলেন। ইলাইজা ইম্পে ও ওয়ারেন হেষ্টিংস তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মহাদানী সিন্ধিয়ার ছবি এঁকেও সোফানী বিশেষ গৌরাবাম্বিত হয়েছিলেন। তিনি বহুকাল এদেশে বাস করে ১৭৯০ সালে দেশে ফিরে যান। তারপরেও বহু শিল্পী এদেশে এসেছেন এবং ছবি এঁকে অর্থ উপার্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে শিল্পী ড্যানিয়েলের নামও উল্লেখযোগ্য। তাঁর অঙ্কিত প্রাচীন কলকাতার অনেকগুলি ছবি দেখে আজ আমাদের বিস্মিত হতে হয়। (অবশ্য অঙ্কিত ছবির জন্য নয়। সেদিনের প্রাচীন কলকাতার দুঃস্থ অবস্থা দেখে)।

এদেশে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিজ নিজ ছবি তৈরী করে রাখার ইচ্ছা এই সব শিল্পীদের আসার পর থেকেই সুরু হয়েছিল। তারপর আরম্ভ হল ক্যামেরায় ছবি তোলার কাজ।

ঘটনাটা ঘটে অবশ্য আরও অনেক পরে—১৮৪০ সালে। সেদিন হুগলী নদীর জলেও মনে হয় চাঞ্চল্য জেগেছিল। বিলেত থেকে তখন জাহাজ এলে এদেশবাসী ইউরোপীয়ানরা উৎসুক হয়ে ভীড় করত দেশের খবর জানবার জন্যে। তা ছাড়া কেউ কেউ পরিচিতজনকে এদেশে আসতে দেখে তাকে নিয়ে যাবার জন্য আসত। কেউ কেউ আবার ভাল সুন্দরীর লোভে জাহাজের ধারে এসে ভীড় করে দাঁড়াতো। তাছাড়া নেটিভদের কৌতূহলী চোখের ভীড়ও ছিল। সেদিন একটি জাহাজ এসে ঘাটে নোঙর করল। নামলেন অনেক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান। ভাগ্যের সন্ধানে সাত-সমুদ্দর তের নদী পার হয়ে এসে এই কলকাতার ঘাটে নামলেন। কলকাতায় তখন ইংরেজদেরই রাজত্ব। বিলেতের কর্তৃপক্ষরা প্রত্যহ পাঠাচ্ছেন বড় বড় জাঁদরেল সব অফিসার। ইণ্ডিয়ার রাজত্বকে কায়েমী করার জন্য ইংরেজদের চিন্তার শেষ নেই। অনেক ইউরোপীয়ানদের মধ্যে একজন ইউরোপীয়ানকে দেখে বড় অদ্ভুত লাগলো। তার সঙ্গে দুটি বড় বড় বাক্স। জানা গেল সেই বাক্সে দুটি বড় বড় ক্যামেরা আছে। ক্যামেরা কি রকম দেখতে তখন কলকাতার কেউ জানত না। যখন শুনলো এই যন্ত্রে ছবি তোলা যায়—তখন সকলে অবাক হয়ে গেল। তখন এদেশে অবাকের যুগ। কলকাতা তখন নিত্য নতুন জিনিষ আমদানি করে সবাইকে অবাক করে দিচ্ছে। তাই সকলে এই দুটি যন্ত্র দেখে পুলকিত হল। আগেই বলেছি, এদেশে তখন ছবি রাখার রেওয়াজ সুরু হয়েছে। এই দুটি যন্ত্রে ছবি তোলা হয় শুনে অনেক বড় বড় মহাপুরুষ তৎপর হয়ে উঠলেন।

এই ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকের নাম মিষ্টার বোর্ণ। এদেশে আসা তার বিফল হয়নি। সেদিন ইউরোপের সর্বাধুনিক আবিষ্কারকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করতে ইউরোপীয়ানরাই তাকে অভিনন্দন জানালো। ইউরোপী-য়ানদের অভিনন্দন জানানোর কারণ অবশ্য সহজ। কারণ এই ক্যামেরায় ছবি তোলার যে ব্যয়, সে ব্যয় একমাত্র ইউরোপীয়ান কর্মচারীরাই দিতে পারে। তাই রাতারাতি মিঃ বোর্ণ সাহেব ইউরোপীয়ান মহলে পরিচিত হয়ে গেলেন। এছাড়া অবশ্য এদেশবাসীর কাছেও প্রতিষ্ঠা পেলেন, তবে রাজা মহারাজা ছাড়া তার কাছে কেউই অত ব্যয় করে ছবি তোলাতে

পারলো না। সেইজন্যে কলকাতার তদানীন্তন অভিজাত মহলে মিঃ বোর্ণ ফোটোগ্রাফার বলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন।

সংবাদ বাতাসের আগে আগে গিয়ে ভারতের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। লোভনীয় বস্তুটির ক্ষমতা দর্শনের জন্য অনেকেই আগ্রহান্বিত হলেন। বিশেষ করে যন্ত্রের মারপ্যাঁচে হুবহু নিজের আকৃতির ছবি উঠবে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা আর্টিষ্টের সামনে বসে থাকতে হবে না—এই আনন্দে অনেকেই মিঃ বোর্ণকে আমন্ত্রন জানাবেন বলে মনস্থ করলেন। তখনকার বাংলার গভর্ণর 'আর্ল অব অকল্যাণ্ড'। তারও কানে এ খবর পৌছলো। তিনি সরাসরি বোর্ণকে আমন্ত্রণ জানালেন।

অভাবনীয় সৌভাগ্য। স্বয়ং গভর্ণরের আমন্ত্রণ। মিঃ বোর্ন হয়ত এতটা আশা করেননি। ভারতে এসেছেন নিজের ভাগ্য ফেরাবার জন্যে। স্বদেশে বসে দুর্ভাগ্যকে প্রিয় না করে এতদূর তাঁর আসা। কিন্তু রাতারাতি যে তাঁর ভাগ্য ফিরে যাবে এ কল্পনাতীত। সঙ্গে তাঁর দুটি ক্যামেরা, একটি তের বাই আট। তের ইঞ্চি লম্বা আট ইঞ্চি চওড়া আকারের প্লেটে ছবি হয়। অন্যটি বড়। পনেরো বারো আকারের। পনেরো ইঞ্চি লম্বা আর বারো ইঞ্চি চওড়া প্লেটে ছবি হয়।

বড়টি সম্ভবতঃ পেতজাভেল স্টুডিও ক্যামেরা। ইউরোপে ভিয়েনার অঙ্কের প্রফেসর পেতজাভেল তখনকার বিখ্যাত দূরবীণ ব্যবসায়ী ভয়গ্‌টল্যাণ্ডার কোম্পানীর সহযোগিতায় ক্যামেরা ও লেন্‌সের উন্নতির চেষ্টায় লেগেছেন। তাঁদের তৈরী স্টুডিওয় ব্যবহারের বড় ফিল্ম ক্যামেরা। কাঠের ট্রাইপডের ওপর রেখে ভাঁজ করা চামড়ার বেলোর ভাঁজ খুলে হাতের মুঠোর মত বড় লেন্‌সে, ঘষা কাঁচে ফোকাস হয়। শিল্পী কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে ঘষা কাঁচের ফোকাস দেখেন।

১৮৩৯ সালের ফোটোগ্রাফি আবিষ্কার করে ফরাসী অ্যাকাডেমি কর্তৃক সম্মানিত হলেন দাগ্যের। তার এক বছরের মধ্যে কলকাতায় স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করলেন মিঃ বোর্ন। জানি না মিঃ বোর্ন দাগ্যের-এর কোন আত্মীয় ছিলেন কিনা। আজ শুধু বিস্মিত হয়ে বার বার একটি কথায় মনে আসে, সমগ্র বিশ্বের বড় বড় সহর পরিত্যাগ করে মিঃ বোর্ন নিজের প্রতিষ্ঠা নেবার জন্যে সেদিনের সেই অখ্যাত কলকাতায় এলেন কেন?

তবে সেদিন এসেছিলেন বলেই হয়ত আজ এদেশে ফোটোগ্রাফি এত দ্রুত সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসার লাভ করলো।

বাংলার গভর্নর 'আর্ল অব অকল্যাণ্ড'-এর ছবি তোলার পর থেকে মিঃ বোর্নের ভাগ্যোদয়ের সূচনা। কলকাতায় তিনি প্রতিষ্ঠা পেলেন। স্টুডিও তৈরী করলেন 'হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেডল'-র বাড়ীর পাশে ১০নং চৌরঙ্গী রোডে। বড় আকারের সাইন বোর্ড টাঙ্গানো হল। রুচি-মার্জিত আধুনিক কায়দায় স্টুডিও ঘর সাজালেন। পসার জমে উঠলো। কয়েক বছর পরে আর একজন সহযোগী এসে হাত মেলালেন মিঃ বোর্নের সঙ্গে। স্টুডিওর নামের সঙ্গে তাঁর নামও যুক্ত হল। 'বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড'। শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের অন্য অনেক জায়গা থেকে তাঁদের ডাক আসতে লাগল। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পর লক্ষ্ণৌ'-এ গিয়ে ছবি তুললেন তাঁরা ১৮৫৭ সালে। ১৮৭০ সালে 'প্রিন্স অব ওয়েলস' ভারতে এলে তাঁরাই ছবি তোলার জন্যে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালের দিল্লী দরবারের আড়ম্বর-পূর্ণ ছবি। এ সব ছবির প্লেট এখনও অবিকৃতভাবে এই কোম্পানী সযত্নে রেখে দিয়েছে। এবং তখনকার দিনে লণ্ডনের একটি পত্রিকা 'দি গ্র্যাফিক' ১৮৭৭ সালে অনেকগুলি ছবি এই কোম্পানীর কাছ থেকে নিয়ে তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। বলতে গেলে 'বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড' সারা পৃথিবীর চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করত।

তখনকার দিনে ছবি তোলা বড়-লোকেরই পক্ষে সম্ভব হত। ১৮৪০ সালে দাগ্যের আবিষ্কৃত ক্যামেরার দাম ছিল দু শ ষাট টাকা। সমস্ত সরঞ্জাম সমেত তখন সাধারণ লোকের উপার্জন ছিল খুব বেশী পঁচিশ-তিরিশ টাকা। যে সব ইউরোপীয়ান দুশ টাকা মাইনে পেতেন তাঁরা ছিলেন বড়লোক। বিরাট প্রাসাদে বিলাস-ব্যসনে দিন কাটাতেন, গাড়ী রাখতেন। দাস-দাসী রাখতেন। তাই মিঃ বোর্ন যখন কলকাতায় স্টুডিও করলেন প্রতিষ্ঠা পেলেন রাজা, মহারাজা আর বড়লোক, জমিদার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ চাকুরে ইউরোপীয়ানদের সমাজে। যে দুখানি ক্যামেরা মিঃ বোর্ন এনেছিলেন, তার বড়টি ব্যবহার হত এই সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের ছবি তোলার কাজে। ছোটটি তিনি ব্যবহার করতেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিতে। এই ক্যামেরায় তোলা ছবির মধ্যে পুরোনো চৌরঙ্গী। ট্রাম লাইন নেই চৌরঙ্গীর রাস্তায়। পাল্কী ও ঘোড়ার গাড়ী ছাড়া মোটর গাড়ী স্বপ্নের বস্তু। লালদীঘির ধারে জেনারেল পোষ্টাফিস তখন সবে তৈরী হচ্ছে। পুরোনো হাওড়ার পুল বড় বাজারের মোড়, হ্যারিসন রোড, আদি গঙ্গা, কালীঘাট ইত্যাদি অনেক ছবি আছে। সেই সব প্লেট নেগিটিভ এখনও প্রায় অবিকৃত।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে চোরঙ্গীর মাঝখানে একটি মস্ত বড় পুকুর। এসপ্লেনাডে যেখানে আজ ট্রাম কোম্পানীর রাজত্ব সেখানেও একটি বড় পুকুর ছিল। এসপ্লানেডের মেট্রো সিনেমা বাড়ী সেদিন ভবিষ্যতের কোলে। আশ্চর্য লাগবে সেই সব ছবি দেখলে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড ও ধর্মতলার চওড়া রাস্তা খুঁজেই পাওয়া যায় না। রাজভবনের পাশে হাই-কোর্টের অস্তিত্ব নেই। হাইকোর্টের আকাশ প্রমাণ চূড়ো সেদিন কল্পনার রাজ্যে। হ্যারিসন রোডে পাল্কী ও ড্যালহৌসী স্কোয়ারে ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছাড়া সবই মনে হয় একটি পল্লীর ছবি। বর্তমানের সহর কলকাতার কোন চিহ্ন সে সব ছবি দেখে অনুমান করা যায় না।

মিঃ বোর্নের পরে কলকাতায় ছবি তোলার স্টুডিও করে রিনেক কোম্পানী। মাইকেল মধুসূদন দত্তর একখানি ছবি তোলেন তাঁরা ১৮৬০ সালে। কবে তাঁরা আরম্ভ করেন আর কতদিন ছিলেন তার কোন হিসাব এখন আর পাওয়া যায় না।

১৮৮০ সালে 'জনস্টন হফ্‌ম্যান' স্টুডিও প্রতিষ্ঠা হল কলকাতায়। এই স্টুডিওটিও তখনকার দিনে যথেষ্ঠ উন্নত ধরনের হয়েছিল। সুরুচিপূর্ণ আভিজাত্যের গরিমায় এই স্টুডিওটি সেই সমাজে মানুষের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের ফুটপাত দিয়ে দক্ষিনমুখো এগিয়ে গেলেই চোখে পড়ত মার্বেল পাথরের কারুকার্য ভরা সুদৃশ্য ফুটপাতের অঙ্গন। পথিক এ পথ দিয়ে গেলেই তার চোখে পড়ত এই জাঁকজমক, অমনি সে অবাক হয়ে এই স্টুডিও বাড়ীর দিকে তাকিয়ে থাকত। তখনকার দিনে 'বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড' ও 'জনস্টন হফম্যান' সারা ভারতের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু মিঃ জনস্টন ১৮৯১ সালে মারাযান ও মিঃ হফম্যান ১৯২১ সালে মারা যান। তার পর মিঃ এ ডি লং এই কোম্পানীর সঙ্গে একাদিক্রমে ১৯০৫ সাল থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। 'জনস্টন হফম্যান' আজ নেই কিন্তু তাঁর কীর্তি ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর তোলা সুন্দর ছবিগুলি আজও বহুস্থানে দেখা যায়, দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। প্রাচীন কলকাতার অনেক ছবি এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে। কিন্তু সেই কোম্পানী আজ লোকচক্ষুর সামনে কোন দিনও আর মনে হয় বের হবে না।

সেদিনের পুরোনো ঐতিহ্য প্রায় আস্তে আস্তে বিস্মৃতির কোলে হারিয়ে যাচ্ছে। আজ শুধু ইতিহাস ছাড়া মনে হয় কিছু থাকবে না। কলকাতার

সেদিনের রূপ শুধু অপরূপ হয়ে আরব্য উপন্যাসের গল্পে স্থান পাবে। তবু আজ দেখে আনন্দ লাগে যে, সেদিনের সেই 'বোর্ণ অ্যাণ্ড শেফার্ড' কোম্পানী আজও আছে। আজও তার পুরোনো বক্ষপঞ্জর নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে এই রূপসী কলকাতার মাঝে। তার অম্লান জৌলুষ আজও চক্ষু ধাঁধায়।

এখন 'বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড' আছে মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্কের পাশে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোডে। ১৮৮৫ সালে যে রবীন্দ্রনাথ সাহেব বাড়ীতে গিয়ে ফোটো তুলিয়ে এসেছিলেন এখন আর সে সাহেববাড়ী 'বোর্ন অ্যাণ্ড শেফার্ড' নেই তবে সাহেবীয়ানা কায়দা সবই আছে। আছে সুন্দর করে সাজানো বাড়ীর সব ঘরগুলি। নতুন লোকেরা পূর্বের ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। আছে পাহাড়সমান পুরোনো নেগেটিভ প্লেট। আপনার যদি কোন পূর্বপুরুষ এই সাহেব বাড়ীতে ছবি তুলে থাকেন তাহলে চলে আসুন এখানে। তাঁরা আপনার পূর্বপুরুষের নেগেটিভ প্লেট অবিকৃত ভাবে সযত্নে রেখে দিয়েছেন।

এর চেয়ে পুরোনো স্টুডিও আজ সারা পৃথিবীতে কোথাও আছে কিনা সেটা অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

সর্বদেশীয় মেয়েদের নামের মিলন যদি দেখতে চান—তাহলে চলে আসুন এ ষ্টীমার ঘাটে। দেখবেন, থরে থরে গঙ্গার বুকের উপর সাজানো আছে—আপনাদের বাড়ির গীতা থেকে ও দেশের কেটি পর্যন্ত। গীতার পাশে কেটি, কেটির পাশে মার্গারেট। কোন শ্রেণীবিভাগ নেই, সবাই এক। সবাই পাশাপাশি গঙ্গার বুকের উপর দুলছে। দুলতে দুলতে নাচতে নাচতে বাঁশি বাজিয়ে জল কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে বহুদূর। গঙ্গার এপার ওপার। যাত্রীদের পৌছে দিচ্ছে তাদের গন্তব্যস্থানে। আবার ফিরে আসছে এক বোঝা নিয়ে। নামিয়ে দিচ্ছে এসে এই ঘাটে। এই চাঁদপাল ঘাটে। ঘাটের পুরনো কাঠের পাটাতনের উপর। যাত্রীরা চলে যাচ্ছে জুতো মচমচিয়ে ঘাটের হেলান সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির মুখে টিকিট-কালেক্টর। টিকিট চেয়ে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে যাত্রীদের। যাত্রীরা কলকাতার জনারণ্যে মিশে যাচ্ছে।

এই চাঁদপাল ঘাট শিয়ালদহ স্টেশনের মত একটি স্টেশন। তবে রেল-স্টেশন নয়, ষ্টিমারের স্টেশন। এই স্টেশনের একটি টিকিট-ঘর আছে। তার মাথার উপর লেখা আছে "ফেরি সার্ভিস বুকিং অফিস।" কয়েকটি ছোট ছোট ফোকর আছে, সেই ফোকরের ওধারে দুটি লোক সর্বদা যাত্রীদের সুবিধার্থে রয়েছেন। তাঁরা সর্বদা যাত্রীদের চাহিদা মিটিয়ে চলেছেন।

তারপর আছে দুটি গেট। হেলান সিঁড়ি সেই গেট থেকে কাঠের পাটাতন পর্যন্ত নেমে গেছে। গেটের মাথার উপর মাসিক টিকিটের সুব্যবস্থার জন্য প্যাসেঞ্জারদের নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে কাঠের পাটাতনের উপর কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক বেঞ্চি। বেঞ্চিতে বসতে ভয় করে। ভেঙে পড়ার ভয় আছে। তবু বসতে হয়। কারণ উপায় নেই, ফেরি-ষ্টিমার আসার বিলম্ব আছে।

সেই বেঞ্চিতে বসে ঘাটের চারদিকে তাকালে একটা ঝরঝরে পুরনো দৃশ্যের উপর চোখ পড়ে। চারদিকে ধূসর আচ্ছাদনে বহু বর্ণের ছোপ-পড়া

ফেরিস্টেশন। মাথার উপর কাঠ দিয়ে উঁচু করা দুটি গম্বুজ। গম্বুজের গায়ে শিল্পীর আঁকিবুঁকি। কাঠের পাটাতনের উপর কয়েকটি ঝরঝরে মার্কাঘর। ঘরে অবশ্য ঘরণী নেই। ঘরবাসী আছে। ঘরবাসীরা গঙ্গার মাঝি। ঘরের মাথায় এক টুকরো কাঠের উপর বিবর্ণ লেখা চোখে পড়ে—"চাঁদপাল ঘাট, দি ষ্টিমনেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড।"

তারপর সামনে দিগন্ত-প্রসারিত আকাশ। নীলের সমারোহ। নীচের দিকে তাকালে উন্মুক্ত জলরাশি। অজস্র ঢেউ বুকে নিয়ে জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকার সঙ্গে খেলা করছে। বড় বড় নৌকা চলেছে মাল বোঝাই হয়ে। ষ্টীমার চলেছে মোটরের মত দ্রুত। তাদের বাঁশির শব্দে কানে তালা লাগে। গঙ্গার ধ্যান ভঙ্গ হয়ে একটা প্রচণ্ড কলরোল ওঠে। বড় বড় জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে এই চাঁদপাল ঘাটেরই পিঠ ঘেঁষে। তাদের প্রচণ্ড দেহ দেখে ছোট্ট বুকে ভয়ের ছোঁয়া লাগে। কোন জাহাজটা জাপানের। কোনটা আমেরিকার। কোনটা ব্রিটেনের। কিন্তু সব জাহাজের উপরই আমাদের জাতীয় পতাকা। আমাদের গর্ব।

এবার চলে আসুন আর একবার এই চাঁদপাল ঘাটের কোল ঘেঁষে। পাশে বাবুঘাট। বাবুঘাটের মাথার উপর ইটের দেয়ালের বুকে লেখা আছে—১৮৩০ সন। বাবু রাজচন্দ্র দাস এই ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছেন। তাঁরই নামানুসারে এই ঘাটের নাম হয়েছে—বাবুঘাট। এসব নাম ও সনের দিকে হয়ত কেউ লক্ষ্য করেন না। করলেও তাঁকে নিয়ে আর কোন চিন্তা এগোয় না। কিন্তু এই সন ধরে আর এক সনের গোড়ার দিকে যাওয়া যায়, তখন তৃতীয়বার জব চার্ণক ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই কলকাতায় এসেছিলেন। জব চার্ণকের শুভাগমনের পর থেকে কলকাতার কয়েকটি অঞ্চলের ঠিকুজি পাওয়া যায়। তা না হলে সবই তো জঙ্গল। জঙ্গল আর বাদাভূমি। দিনে বাঘ, রাতে ডাকাত। কে থাকবে এই ভবিষ্যতের শহরে?

কিন্তু এই জঙ্গলময় দেশের এই জায়গাটিতে ছিল কয়েক ঘর তন্তুবায়। ছিল পর্ণকুটীর। আর প্রধান ব্যবসা কেন্দ্র। ব্যবসা হত সম্ভবত গঙ্গা কাছে থাকার জন্যে। যেখানে ব্যবসা লেনদেন সেখানে লোকজন। সুখ, দুঃখ, হাসি-ঠাট্টা কলস্বরে মুখর। নিশ্চয় তখন এখানে বহুলোকের সমাগম হত। বহুলোক এখানে এসে দিনকয়েক বসবাস করে যেত। তাই তখনকার দিনে এই জায়গাটিকে অনেক লোকে চিনত। কান টানলে যেমন মাথা আসে, লোক থাকলেই প্রয়োজনীয় জিনিসের দরকার হয়।

তাই একটি মুদির দোকান থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটি কেন অনেকগুলি থাকলেও থাকতে পারে তবে একটি মুদির দোকানের কথাই শোনা যায়। সে দোকানের মালিকের নাম ছিল—চন্দ্রনাথ পাল। চন্দ্রনাথ পাল এই অঞ্চলে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বোধ হয়, ধারে জিনিস দিত বলে এই সুনাম। তবু যা হক, তাতে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—এই যথেষ্ট। ধার তো সবাই দেয়, কে কত বিখ্যাত হয় আজকাল?

সেই চন্দ্রনাথ পালের নামানুসারে চাঁদপালঘাট। একটু অবিশ্বাসও জাগে। সামান্য একজন মুদির নাম কলকাতা শহরের বুকে অমর হয়ে রইল? কিন্তু অবিশ্বাস করলেও উপায় নেই। অবিশ্বাস করলে মুদি চন্দ্রনাথ পালকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যায়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না চাঁদপালঘাট। কারণ চাঁদপালঘাট এখনও বর্তমান। তাই সেই মুদির নামকেই মনে মনে জপ করে তাকে বিখ্যাত করতে হবে। হোক সে মুদি। তবু সে এই শহরের একজন বিখ্যাত লোক।

গঙ্গার এই কূলে এই চাঁদপাল ঘাটই ছিল সেদিন জাহাজ ভিড়াবার একমাত্র জায়গা। বলতে গেলে, সেকালের 'গেটওয়ে অব ইণ্ডিয়া'।

এখানেই এসে নেমেছিলেন একদিন ভারতে কোম্পানি রাজত্বের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। দূরে, ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কেল্লা থেকে তোপ দেগে অভিবাদন জানান হয়েছিল তাঁকে।

কিছু পরে কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসও এসে নেমেছিলেন এখানে। এই চাঁদপাল ঘাটে দাঁড়িয়ে—মনে মনে 'এক-দুই' করে তিনি গুনেছিলেন, দূরের কেল্লার তোপধ্বনি!—কৈ হেস্টিংসের সমান হল না ত? কেন কম তোপ দাগান হবে তাঁর বেলায়? তিনি কি কম সম্মানী?

শোনা যায়, হেস্টিংস আর ফ্রান্সিসের ঐতিহাসিক শত্রুতার সেই শুরু।

এমন আরও অনেক ইতিহাসের শুরু ও শেষ এখানে। এই চাঁদপাল ঘাটে।

কিন্তু সেই চন্দ্রনাথ পালের মুদির দোকান কোথায় ছিল? চাঁদপাল-ঘাটের পাশে রাস্তার ধারে ওড়িয়া পাণ্ডাদের চালাঘরের ভিতর উঁকি দিয়েও মিলল না তার অস্তিত্ব? মিলল শুধু কতকগুলি স্নানযাত্রীদের কপালে ছাপ-দেওয়ার দোকান আর পান, বিড়ি ডাবের দোকান। তবু বিশ্বাস করতে হবে যে, মুদির দোকান ছিল। সে দোকান প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, আর ছিল চন্দ্রনাথ পাল। কারণ প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসে আছে তার নাম।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

ঘটনাটা ঘটে ১৭০৭ সালের মধ্যে। তখন লালদীঘি ছিল একটা মাঝারী ধরণের পুষ্করিণী মাত্র। পুষ্করিণীটি মজুমদারদের কাছারীবাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিখ্যাত দেববিগ্রহ শ্যাম রায় কালীঘাটে চলে গেলেও এখানে আসতেন প্রতি বছর দোলের সময়। এখানে এই লালদীঘির পাড়ে দোল না খেললে নাকি তার খেলা ঠিক যুৎসই হত না। তাই প্রতি বছর এই লালদীঘির জল লাল করে শ্যাম রায় পুরনারীদের সঙ্গে দোল খেলতেন।

সে এক মহা এলাহি কাণ্ড। তখনকার দিনের এই দোলখেলা নিয়ে কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলে খুব সোরগোল পড়ে যেতো। দলে দলে লোক আসত বন জঙ্গল পার হয়ে বহু দূর দূর গ্রাম থেকে। কেউ আসত দোল-রঙ্গ দেখতে কেউ আবার লালদীঘির পারে শ্যাম রায়ের পূজারিণীদের সাথে দোল খেলতে সুরু করে দিত। রুধির রাঙ্গা আবীরে আবীরে চারিদিক ভরে উঠত লালদীঘির পার। একদিনের কলহাস্যে ও হাসিঠাট্টায় সারা বছরের আনন্দ সঞ্চিত হত। সবাই এ দিনটিকে উপলক্ষ্য করে চলে আসত লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারীবাড়ীর মধ্যে। সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। আজ কোন চিহ্নই নেই সেই দোল-রঙ্গক্ষেত্রের। যেখানে একদিন দোলের সময় জমায়েত হতেন বহু নরনারী, মিশে যেতেন শ্যাম রায়ের সাথে এই আবীর রঙ্গভূমিতে। সে দোল-রঙ্গক্ষেত্রও নেই আর সে লালদীঘিও নেই—সবই আজ সেই আড়াইশ বছর আগে ইতিহাস হয়ে গেছে। কালের সমাধিতলে আজ স্মৃতি হয়ে শুধু বেঁচে আছে।

এখন সেই লালদীঘির কাছে গিয়ে দেখুন। লালদীঘির বাগানের মাটিতে কোন আবীরের চিহ্ন পান কি না! না পেলে হয়ত অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে ভাঙ্গা রেলিং টপকে ট্রামলাইনে এসে থামবেন। কিন্তু আজ তাকিয়ে দেখুন ঐ বিরাট টেলিফোন বাড়ীটির দিকে। যে বাড়ীটা বিরাটভার দেহ নিয়ে লালদীঘির প্রায় অংশ গ্রাস করেছে। আর এ পাশে বাকী অংশটা ট্রাম কোম্পানী তার ট্রামলাইন পেতে হালে গ্রাস করল।

লালদীঘির সমস্ত পরিধিটা ব্যবসাদারদের কবলিত হলেও দীঘির জল এখনও সমান গতিতে বয়ে চলেছে। তবে সে আর লাল নেই সবুজ আকার ধারণ করেছে। গুড়িপানায় ভর্তি হয়ে গেছে সমস্ত দীঘিটা। দীঘির কংক্রিট ইটের সিঁড়িও আর অক্ষত অবস্থায় নেই। এখন সব হলদে ছোপ ছোপ ভাঙ্গা এব্ড়ো-থেব্ড়ো দাঁত বের করে সাধারণের দিকে তাকিয়ে আছে। সাধারণেরা আর এখন লালদীঘির সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় না। এখন কেমন যেন অবহেলার মতিগতি আবভাবে। সবাই এখন মুগ্ধ হয়ে চায় টেলিফোন বাড়ীটার দিকে। হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে কেউ কেউ ভাবে আকাশ ছুঁতে আর ক'তলা উঁচু দরকার।

সে অবশ্য আজকের চিন্তা কিন্তু এই লালদীঘি পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করে অতীতে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটে গেছে ইংরেজরা যখন এ অঞ্চলে এসে তাদের ভিত শক্ত করে গাড়ল।

পুরনো ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা ছিল আজকের জেনারেল পোষ্টাফিস ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য জায়গাগুলো। ইংরেজরা যখন এই পুরনো ফোর্টে থাকত তখন ওরা এই পুষ্করিণীর জল পান করত কারণ এমন সুস্বাদু জল ওরা আর কোথায় পাবে! ওরা পুষ্করিণীর ধারে নৈশ শোভা সন্দর্শনে বিমল বায়ু সেবন করত। বন্দুক কাঁধে করে ওরা পাখী শিকার করে বেড়াত। সেইজন্যে ওরা নাম দিয়েছিল এই দীঘির Green before the Fort.

তারপর ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ। লালদীঘির পঙ্কোদ্ধার সুরু হল। পুকুরটি অযত্নে পঙ্ক-শৈবালাচ্ছাদিত হয়েছিল। উৎকৃষ্ট পানীয় জলের জন্য ইংরেজরাই ওটা পরিষ্কারে মন দিল। দীঘি সংস্কার হল। চারিদিকে কঙ্করমণ্ডিত ক্ষুদ্র পথ ও নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ করা হল। কমলা লেবুর গাছ লাগান হল। বাগান তৈরী করে এক পাশে শাক-সব্জী আর এক পাশে ফুলের গাছ পোঁতা হল। কোম্পানীর কর্মচারীরা সেই সব ফল-মূল ব্যবহার করতে লাগল।

পানীয় জল, পুকুরের মাছ, গাছের ফল প্রচুর পরিমাণে ফোর্টের লোকের চাহিদা মেটাতে লাগল। তারপর ত আছেই বেড়ানর জন্যে সুন্দর সাজানো একটি কুঞ্জবন। তখনকার দিনে ইংরেজের কাছে এই লালদীঘি ও তার বাগান একটা উল্লেখযোগ্য স্থায়ী আসন তৈরী করেছিল।

আর সাধাবণ লোকেরা শুধু হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত—লালদীঘির সুন্দরী দেহ। তখন কোথায় ছিল ইডেন-উদ্যান আর বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই লালদীঘি পরিষ্কারের জন্যে কোম্পানী মাসিক একটা বরাদ্দ

ঠিক করেছিল। তার মধ্যে বাগানটি পরিষ্কার রাখার জন্যে দশ টাকা, শোভা বর্ধনের জন্য চৌত্রিশ টাকা ও পঙ্কোধার ও শৈবালাদি পরিষ্কারের জন্য কুড়ি টাকা।

লালদীঘি তারপর থেকে যেন ইংরেজেরই চিরকালের সম্পত্তি হয়ে উঠল। ওর ধারে কাছে কেউ গেলে বন্দুকের গুঁতোর ভয় থাকত। ওদিকটায় কারও কখনও জল পিপাসা পেলে মরেও লালদীঘিতে ঢোকবার চেষ্টা করত না।

যখন লালদীঘিকে নিয়ে ইংরেজের এত নাচানাচি—তারও কিছুকাল আগের এ কাহিনী।

লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারি বাড়ীতে দোল। শ্যাম রায় এসেছেন কালীঘাট থেকে দোল খেলতে। চারিদিকে খুব জমিয়ে দোল খেলা হচ্ছিল। আবীরের রঙে নর-নারীরা রঙীন হয়ে উঠেছিল। চারিদিক মুখরিত কল-কাকলীতে। আবীবের রং বাতাসে মিশে বাতাসকেই রঙীন করে তুলছিল। এই সব দেখে ইংরেজরা কেমন যেন একটু কৌতুক অনুভব করল। ওরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে রং মাখবার জন্যে কাছারী বাড়ীতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। আর যায় কোথা। ইংরেজ দেখে সব স্তব্ধ। নিমেষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল চলন্ত উৎসব।

বেরিয়ে এলেন হঠাৎ দেউড়ি থেকে মজুমদারদের আম-মোক্তার এণ্টনি সাহেব। ইংরেজদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর রক্ত মাথায় উঠে গেল। তিনি রক্ত মূর্তিতে ছুটে এলেন ইংরেজদের মাঝখানে। থামিয়ে দিলেন তাদের। হুকুম দিলেন আর এক পাও তারা যেন না এগোয়। এগোলে নিশ্চিত একটা ঘোরতর বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

থমকে দাঁড়াল ইংরেজ ফ্যাক্‌টর দল। খবর পেয়ে জব চার্ণক লাফাতে লাফাতে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই এণ্টনি সাহেবের ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, হাতে ছিল তাঁর ঘোড়ার চাবুক। তিনি তারই সাহায্যে এণ্টনি সাহেবকে দরুণভাবে প্রহার করতে লাগলেন।

লোকে লোকারণ্য কাছারি বাড়ী। দোল-রঙ উৎসব থেমে গেছে। এ পাশে উৎসব বাড়ীর লোক আর ওপাশে সেই ইংরেজ দল। তারই মাঝখানে সবার সামনে এণ্টনি সাহেব যেন চাবুকের আঘাতের চেয়ে অপমানিত হলেন ভীষণ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না—একজন বিদেশী আর একজন বিদেশীর সঙ্গে কি করে এমন ব্যবহার করতে পারে।

চার্ণক তাঁর দলবল নিয়ে বীরদর্পে কাছারী বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন আর আম মোক্তার এণ্টনি সাহেব যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ নিয়ে ছুটে কাছারি বাড়ীর কোন একটি ঘরের মধ্যে গিয়ে নিজেকে লজ্জার হাত থেকে লুকোলেন। কয়েকটি দিন এমনি করে কেটে গেল। কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারলেন না সেই অপমান। চোখের জল কিছুতে থামাতে পারলেন না আম-মোক্তার পর্তুগীজ এণ্টনি সাহেব।

সেই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এণ্টনি সাহেব মজুমদারের অধিকৃত জমিদারীর মধ্যে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বাকী দিন কটি গিয়ে রইলেন আর তিনি এ অঞ্চলে ফেরেননি। আর তিনি তাঁর কলঙ্কিত মুখ নিয়ে এই সহর কলকাতায় আসেননি। আসেননি আর কোনদিন জবচার্ণকের

সামনে। স্বার্থ সন্ধানী জবচার্ণকের স্বার্থের বলি হতে আর কোনদিন তার সাথে মোলাকাত করেননি।

এণ্টনি সাহেব শুধু একটি কথারই উত্তর পাননি—একজন বিদেশী আর একজন বিদেশীকে কি করে এমন করে আঘাত করতে পারল!

এই এণ্টনি সাহেবই বিখ্যাত কবিওয়ালা আণ্টুনি সাহেবের ঠাকুর্দা।

কলিকাতা সেকালের ও একালের—হরিসাধন মুখো,

Cotton's Calcutta. Old and New C. R. Wilson. Early Annals of the English in Bengali ; census of India. Vol V11

এই কটি বই থেকে আলোচ্য অংশটি নেওয়া হয়েছে।

এই ত ক'দিনেরই বা কথা! মাত্র শ'খানেক বছর। তখন এই কলকাতা শহরে ট্রাম ছিল না, ট্যাক্সি ছিল না, বাসও ছিল না এবং তার কল্পনাও ছিল না। শুধুমাত্র পাল্কী ও ঘোড়ার গাড়ী। ফিটন, স্প্রিংওয়ালা বগী, প্রভৃতি ঘোড়ার গাড়ীর নাম ছিল ও সুন্দর সুন্দর পাল্কী মানুষেরা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আরোহীদের দূর-দূরান্তে পৌঁছে দিত; যেমন বর্তমানের যান্ত্রিক যুগে রিক্সা। কিন্তু আজকে রিক্সা থাকলেও ইচ্ছে করে আমরা রিক্সাতে না চড়ে আরও দ্রুত পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সিতে চড়তে পারি। কিন্তু সেদিন এ ধরণের চিন্তা এ সহরের বুকে বসে কল্পনাও করা যেত না। তখন যত্রতত্র যাবার পক্ষে ওড়িয়া বেহারাদের কাঁধে ধরা ঐ পাল্কীই ভরসা। শেষে বেহারাদের ভাড়া নিয়ে গোলমাল বাধল এবং তার পরেই ষ্টুয়ার্ট কোম্পানী প্রভৃতি বহু ঘোড়ার গাড়ীর কোম্পানী এদেশে ব্যবসা সুরু করল।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা থেকে জানতে পারা যায়, কলকাতায় প্রথম ট্রামচালাবার চেষ্টা হয়েছিল ঐ সময়ে। অফিসের সময় ডালহৌসীতে পৌঁছবার জন্যে ই, বি, রেলওয়ের যাত্রীদের সুবিধার জন্য ঐ ট্রামের প্রবর্তন। ২৫শে ফেব্রুয়ারীর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা উল্লেখযোগ্য।

"গতকল্য সকালে শিয়ালদহ টারমিনাসে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয়ভাবে একটি ট্রামওয়ে চালু করল। একটি ঘোষণার দ্বারা নগরবাসীকে আগেই জানান হয়েছিল যে, অদ্য প্রত্যুষে ট্রামওয়ে খোলা হবে। এই খবর নগরে ছড়িয়ে পড়বার পর থেকেই অধিকাংশ নেটিভরা কৌতূহলোদ্রেকে ষ্টেশনে এসে জড়ো হল। ট্রামওয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি. এফ. এ্যাবরো সর্বপ্রথমে এসে হন্তদন্ত হয়ে ট্রাম ছাড়ার সমস্ত আয়োজন শেষ করলেন। জষ্টিস ইঞ্জিনীয়ার মিঃ ক্লার্ক একবার ষ্টেশনে এসে তাঁর নির্দেশগুলি ঠিকমত কাজ হচ্ছে কিনা ঘুরে-ফিরে দেখে গেলেন। প্রথম ট্রাম ছাড়বার ব্যবস্থা হয়েছিল তার সঙ্গে ছিল তিনটি গাড়ী। একটি প্রথম শ্রেণী ও দুটি

দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রত্যেকটির সঙ্গে দুটি করে শক্তিশালী ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক সকাল ৯-১৫ মিনিটের সময় ই, বি, রেলওয়ে শিয়ালদহে এসে পৌঁছলে, যাত্রীরা চারিদিক থেকে ছুটে এসে টিকিট ক্রয় করে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রাম ভর্তি করে ফেলল। দ্বিতীয় শ্রেণীর দুটি গাড়ীতে এত লোক উঠল যে, ছাত ও কামরার ভেতর ভর্তি হয়ে বাইরেও অনেক বাদুড়ঝোলা হয়ে ঝুলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে অবশিষ্টরা ট্রামে ওঠবার জন্যে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, কারণ তাড়াতাড়ি অফিস পৌঁছনর ঐ বাহনটিকে হাত ছাড়া করতে কেউই রাজী নয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ট্রামটিতে মাত্র গুটিকয়েক যাত্রী। মিঃ এ্যাব্রো যে আশা করেছিলেন তার চেয়ে একেবারে কম। তিনটি ইউরোপীয়ান ও দু'জন নেটিভ সর্বসাকুল্যে ঐ প্রথম শ্রেণীর ট্রামটির যাত্রী হয়েছিল। অথচ দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রচুর যাত্রী, সেখানে এতটুকু জায়গা নেই, ট্রামে ওঠবার জন্যে আরও প্রচুর লোক ঠেলা-ঠেলি করছে। একশত দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট নিয়ে টিকিট বিক্রেতা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি দশটি টিকিটও বিক্রি করতে পারেন নি, অথচ প্রত্যেকটি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে পঁয়তাল্লিশটি করে আসন নির্দিষ্ট ছিল। ট্রাম ষ্টার্ট করবার সময় অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সেইজন্য তাড়াতাড়ি ষ্টার্ট করবার জন্যে ৯-৩০-এর সময় সিগন্যাল দেওয়া হল। প্রথম শ্রেণীর অল্প যাত্রীপূর্ণ গাড়ীটি সিগন্যালের সঙ্গে সঙ্গে কোনরকন অসুবিধা না করে বেশ এগিয়ে গেল, কিন্তু যখন পুনরায় সিগন্যাল পড়ল, দ্বিতীয় গাড়ী এগোতে পারল না, দুটি শক্তিশালী ঘোড়া যেতে পারল না। ই, বি, রেলওয়ের ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ব্রাণ্ডার হাতে চাবুক নিয়ে ঘোড়াদের সপাসপ্ মারতে লাগলেন, কিন্তু কোন সুফল ফলল না। শেষকালে ট্রামওয়ের অজস্র ভৃত্যদের ঠেলাঠেলিতে গাড়ী কিছুটা এগোল এবং ঘোড়ারা অল্প একটু চলবার শক্তি পেল। অবশিষ্ট গাড়ীটিকেও সেই উপায়ে চালান হল। মিঃ এ্যাব্রো পুনরায় আদেশ দিলেন দ্বিতীয় ট্রাম প্রস্তুত করবার জন্যে। এবং সে ট্রামের যাত্রী যেন ইউরোপীয়ানদের সংখ্যাই বেশী হয়। পুনরায় ৯-৫৫ মিনিটের সময় ই, বি, রেলওয়ে ট্রেণ এসে পৌঁছল। টিকিট নেবার জন্যে চারিদিক থেকে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। অফিসের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায় বলে তাড়াতাড়ি প্রথম শ্রেণীর একটি ট্রাম ছাড়ার আয়োজন হল। সেই ট্রামে প্রচুর ইউরোপীয়ান যাত্রী উঠল এবং সঙ্গে একটি 'Corresponding carriage attached' করে আরও কিছু সংখ্যক যাত্রীকে তোলা হল। একটু আধটু অসুবিধা সৃষ্টি

হওয়া ছাড়া প্রথম গাড়ি ছাড়তে কোন গণ্ডগোল হল না। খুব আস্তে আস্তে বৈঠকখানা ষ্ট্রীটের ওপর দিয়ে ট্রাম ডালহৌসী স্কোয়ারের কিঞ্চিৎ দূরে গিয়ে দাঁড়াল। যখন বৈঠকখানা ষ্ট্রীটের ওপর দিয়ে ট্রাম চলছিল, কাতারে কাতারে কলকাতাবাসী পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে এই নতুন গাড়ীটি দুচোখ ভরে বিস্ময়ে দেখছিল, কতক নেটিভ লোক আবার ট্রামের পিছু পিছু দৌড়ে ডালহৌসি স্কোয়ার পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। ট্রামের ভৃত্যরা মাথায় লাল রঙের পাগড়ী বেঁধে ট্রামের পা-দানীতে চৌকিদারের মত দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল। যদিও এই ট্রাম মিউনিসিপ্যালিটির নির্দেশ অনুযায়ী চালিত হয়েছিল তবু ট্রামওয়েই ব্যয় করেছিল এর খরচ।"

২৫শে ফেব্রুয়ারীর 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার উদ্ধৃতি : "গতকল্য কলকাতা সহরে প্রথম যে ট্রাম চলা সুরু হয়েছিল তার উদ্যোক্তা ছিলেন মিউনিসিপ্যালিটি এবং ট্রামওয়ে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি. এফ. এ্যাবরো। ই, বি, রেলওয়ের অফিসযাত্রীদের শিয়ালদহ থেকে দ্রুত ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌছে দেবার জন্যেই এই ট্রামের প্রবর্তন এবং নেটিভদের সুবিধার চেয়ে ইউরোপীয়ানদের সুবিধার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। তবে কলকাতার ট্রামওয়ের জন্ম-ইতিহাসের প্রথম তারিখটি যে ঐ ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ১৮৭৩ সাল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐ নির্দিষ্ট দিনটি থেকে ঘোড়াট্রাম শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরে আরমেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত যেতে সুরু করল।" ইংলিশম্যান পত্রিকার চিঠি-পত্র বিভাগে তখনকার দিনের ট্রামওয়ে যাত্রীর কয়েকটি প্রতিবাদ-পত্র ছাপা হয়েছিল তা থেকে জানতে পারা যায় যে, ট্রাম চলায় বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল এবং কেউ তা সমর্থন করতে পারেনি। তবে কেউ কেউ আবার এই বলে সমর্থন করেছিল যে—"We have to pay four pice for a seat in a ticca gharee and from three to four annas for a palkee when a gharee canot be procured and gladly would be exchange both these for the tramway, if only the tramway would deign to offer us a seat".

প্রত্যহ সকালে ই, বি রেলওয়ের যাত্রী ও মাতলা রেলের যাত্রী নিয়ে শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসী পৌছে দেওয়ায় ছিল এই ট্রামওয়ের কাজ। যাত্রীদের অফিসে পৌছে দিয়ে আবার পাঁচটার সময় অফিস থেকে নিয়ে এসে ঐ ই, বি, রেলওয়ে মাতলা রেলওয়ে ও ধরিয়ে দেওয়ার কাজ এই মিউনিসিপ্যালিটি ট্রামের, কিন্তু জুলাই মাসের ৯ তারিখের 'ইংলিশম্যান'

পত্রিকায় একটি যাত্রীর পত্র থেকে জানতে পারা যায়, এই ট্রামের চলাচলে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমতঃ শিয়ালদহ টারমিনাস থেকে গাড়ীতে চাপলে গাড়ী কোথাও দাঁড়াবে না, একেবারে সোজা ডালহৌসী স্কোয়ারে গিয়ে থামবে। মাঝে যে-সব লোক থাকে তারা গাড়ী ভাড়া শিয়ালদহ টারমিনাসে এসে গাড়ী চড়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পাল্কী ভাড়া করে যদি ট্রামে গিয়ে উঠতে হয় তাহলে পাল্কীতে করে অফিস যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধে। অথচ বহুবাজার, হাড়কাটা গলি, চাঁপাতলা, শিয়ালদহ চৌমাথার সামনে এক মিনিটের ষ্টপেজ দিলে কত সুবিধে। যাত্রীরা অনেকে কলকাতাবাসী, অতএব সেক্ষেত্রে তারা এই সব ষ্টেশন থেকে গাড়ীতে উঠতে পারত। এই সব নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হতে একদিন ট্রাম চলা বন্ধ হয়ে গেল। তাছাড়া ঘোড়ায় ট্রাম টানার অনেক অসুবিধে। বিরাট বোঝা বইতে গিয়ে অনেক ঘোড়া মরে যেতে লাগল। এক একটি ঘোড়ার দাম তখনকার দিনে অনেক। বিরাট শক্তিশালী ঘোড়া না হলে আবার ট্রামের ঐ যাত্রীপূর্ণ গাড়ী টেনে নিয়ে যাওয়া মুস্কিল, তাই এক সময় বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করে ট্রামওয়ে কোম্পানী উঠে গেল।

ছ'বছর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ তারিখে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকায় একটি বিজ্ঞপ্তি দেখা গেল। "পাঠকগণের স্মরণ আছে কয়েক বর্ষ অতীত হইল ভূতপূর্ব জষ্টিসগণ সার ষ্টুয়ার্ট হগের সময়ে শিয়ালদহ হইতে লালদীঘি পর্যন্ত ট্রামওয়ে নির্মাণ করেন। সেই নির্মাণকার্যে করদাতাদিগের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জষ্টিসগণ পরিণাম চিন্তা না করিয়া সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করায়, শেষে তৎসমস্ত অর্থ ব্যতীত আরও বহুল অর্থ বৃথা ব্যয়িত হয়। এক্ষণে প্রকাশ যে, বর্তমান মিউনিসিপাল কমিশনারগণ আবার কলিকাতায় ট্রামওয়ে নির্মাণ করিবার কল্পনা করিতেছেন। এ সংবাদ আমরা পূর্বে নগরে জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে তথাকার মিউনিসিপাল কমিশনারদিগের অধিবেশনের বিজ্ঞাপনী মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনারগণ এবং সেক্রেটারী বোম্বাই মিউনিসিপালিটিকে তথাকার ট্রামওয়ে সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ের কার্য উত্তমরূপে চলায় এবং তথায় করদাতাগণের অর্থ ক্ষতি না হইয়া বরং লাভ হওয়াতেই, রাজধানীর কমিশনারগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কিরূপ উপায়ে ট্রামওয়ে নির্মাণ এবং চালাইলে সফল হইতে পারা যায়। বোম্বাইয়ের কমিশনার শীঘ্রই এ সম্বন্ধে

উত্তর দিবেন বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশের পূর্বে বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ে কিরূপে সাফলতা লাভ করিয়াছে, পাঠকগণের তদ্বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

বোম্বাইয়ে প্রথমে ট্রামওয়ের প্রস্তাব হইলে, সকলেই মহা আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল। শেষে কমিশনারগণ মেস্যুর্স কেট্রিজ এবং কোম্পানীকে ট্রামওয়ে নির্মাণের ভার প্রদান করেন।

......আমাদিগের মতে সর্বাগ্রে চিৎপুর হইতে ধর্মতলা ও লালদীঘি পর্যন্ত ট্রামওয়ে নির্মাণ করা কর্তব্য। ভাড়ার পরিমাণ অল্প করিলে প্রত্যহ সহস্র সহস্র আরোহী যাতায়াত করিবে। কিন্তু ইহা করিতে হইলে, চিৎপুর রোডের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হয়, নতুবা প্রত্যহ অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ণ সম্ভাবনা। উক্ত পথের পরিসর বৃদ্ধি করিলে সময়ে অশ্বের পরিবর্তে নবাবিষ্কৃত শব্দহীন ষ্টীম এঞ্জিন দ্বারা ট্রামওয়ে চলিতে পারিবে।...বাগবাজার, শোভাবাজার, বীডন ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান, মেছুয়াবাজার, সিন্দুরিয়াপটী, লালবাজার, কসাইটোলা এবং শেষ ধর্মতলায় একএকটি ষ্টেশন করিলে সকলেরই সুবিধা হয় এবং তাহার দ্বারা বিলক্ষণ আয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ পথটির পরিসর বৃদ্ধি না করিলে কোন মতেই এখানে ট্রামওয়ে নির্মাণ করা যাইতে পারে না প্রথমে এই স্থানে ট্রামওয়ে নির্মিত হইলে পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত সংযোগ এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট প্রভৃতিতে ক্রমে ক্রমে নির্মাণ করিলে চলিবে।"

এর পরই ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখা যায় কলকাতা মিউনিসিপাল কমিশনরগণের কাছে ট্রামওয়ের জন্য দুজন টেণ্ডারের প্রস্তাব। একজন মিস্টার জি. এ. কেট্রিজ, বোম্বাই থেকে ৮ই নভেম্বর ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে পত্রে কমিশনরগণকে একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ের মত ডবল ট্রাক ও সিঙ্গল ট্রাকের জন্য প্রতি মাইলে দু'হাজার ও একহাজার টাকা ভাড়া দিবেন। কিন্তু ২০শে জানুয়ারী মিষ্টার আপটন তাঁর এক মক্কেলের প্রস্তাব দাখিল করেন। সেই প্রস্তাবটি ১লা ফেব্রুয়ারী টাউন কাউন্সিলে চেয়ারম্যানের সামনে মিউনিসিপ্যাল সদস্য অনারেবল কৃষ্ণদাস পাল, মিঃ উল. মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড ও বাবু কালীনাথ মিত্র দাখিল করেন। মিঃ আপটনের মক্কেল, লণ্ডনের ডিলুইন প্যারিশ, আলফ্রেড প্যারিশ ও লিভারপুলের রবিনসন সুটার [Dillwyn Parrish, Alfred Parrish of London and Robinson Soutter of Liverpool.]

"মেসার্স প্যারিশ অ্যাণ্ড স্টার কোম্পানী নাম দিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী করপোরেশনের কাছে ইঞ্জিনীয়ারের একটি খসড়া পেশ করেন। তাতে এ কথা জানান যে, যদি তাঁদের ট্রামওয়ে চালু করতে দেওয়া হয় তাহলে করপোরেশনের রাস্তা সারানোর ২৮,০৮৬ টাকা খরচ বেঁচে যাবে। এর পরে মিঃ কেট্রিজ ও প্যারিশ অ্যাণ্ড কোংর দুটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়।

মিঃ কেটিজের প্রস্তাব

	মাইল	টাকা
ডবল ট্রাক	৯.৪ তে	২,০০০
সিঙ্গল ট্রাক	৩.৪ তে	১,০০০
	১২.৮ তে	২২,২০০

মেসার্স প্যারিশ অ্যাণ্ড কোংর প্রস্তাব

	মাইল	টাকা
ডবল ট্রাক	১১.২৭ তে	৩,০০০
সিঙ্গল ট্রাক	৫.০০ তে	২,০০০
	১৬.২৭	৪৩,৭৫০

শেষ পর্যন্ত কেট্রিজ প্রস্তাব তুলে নেন এবং মেসার্স প্যারিশ অ্যাণ্ড স্টার কোম্পানী সহরে ট্রামওয়ে চালু করবার আদেশ পান।

এই "মেসার্স প্যারিশ এণ্ড স্টার কোম্পানী" বর্তমানের এই ট্রাম কোম্পানীরই পূর্বপুরুষ। এই কোম্পানীই ১৮৭৩ সালের পর আবার কলকাতায় ট্রামওয়ে চালনার ব্যবস্থা করল। করপোরেশনের বিভিন্ন বৈঠকে আলাপ-আলোচনা, এগ্রিমেণ্ট ইত্যাদি সই ও রাস্তায় লাইন ইত্যাদি বসাতে বহুদিন গত হল, শেষে ১৩ই নভেম্বর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ট্রামওয়ে চালু হল।

ইংলিশম্যান পত্রিকার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সোমবারের বক্তব্যের কতকাংশ উল্লেখযোগ্য। "শনি বার বিকালে মিষ্টার রবিনসন স্টারের সৌজন্যে শহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে একটি ট্রামে চেপে শিয়ালদহ ডিপোতে এসে পৌছলেন। সমগ্র ভদ্রমহোদয়গণ শিয়ালদহে পৌছে ঘোড়াদের আস্তাবলে গিয়ে তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আরামে অপেক্ষা করতে দেখে নতুন ট্রামওয়ে কোম্পানীর সাফল্য ঘোষণা করলেন। প্রচুর বিশ্বাসের মধ্যে

সেদিনটি চিরঅক্ষয় করে মিঃ ম্যাক আলপাইন হর্ষোৎফুল্ল স্বরে বলে উঠলেন, "উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, শহরে আজ যে নতুন ট্রামওয়ে কোম্পানী ব্যবসা সুরু করলেন, আমি মনে করি, এই কোম্পানী বর্তমানে আমাদের যে অপূর্ব সুযোগ প্রদান করলেন, তাতে আমাদের উৎসাহে উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সমর্থনে আজকের এই শুভ মুহূর্তটি তাদের সে শক্তিকেই অভিনন্দন জানানো হল। মিঃ সুটার আমাদের দেখালেন, আজকে যে উত্তম ও কম মূল্যে যানবাহনের চলাফেরা অথচ এই মূল্যবান মুহূর্তটি আমাদের এই শহর জীবনে আর একদিন এসেছিল। কিন্তু সেদিন কেন যে অকৃতকার্য হয়েছিল আজ এই মুহূর্তে আমি তা বলতে পারি না। তবে আজকের এই আয়োজন নিজের চোখে দেখে আমার বিশ্বাস হয় যে, যদি নগরবাসীর সত্যিকার উপকার করতে এই ব্যবস্থা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় তাহলে এদেশের লোকেরা কখনই একে অবহেলা করবে না। এই ট্রামওয়ে কোম্পানী যদি শহরবাসীর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থাটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন তাহলে আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি যে, ইহা কখনই অবহেলিত হবে না, সম্পূর্ণ অল্পমূল্যে ভাড়া ও অতিব্যবহারে লোকের অভিনন্দনে ধন্য হবে।

মিঃ রবিনসন সুটার বললেন যে, তিনি উপস্থিত কমিশনারগণ ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের উপস্থিতিতে কৃতজ্ঞ। তবে তাঁদের এই অভিনন্দন মনে-প্রাণে স্বীকার করতে পাচ্ছেন না। এই জন্যে যে, শেষ পর্যন্ত এই কোম্পানী থাকবে কিনা তার কোন ঠিক নেই। কারণ সব সময়েই মনে হচ্ছে এই কোম্পানী বুঝি অকৃতকার্য হয়েই একদিন ফিরে যাবে। তাঁর বিশ্বাস আছে যে, ভবিষ্যতে তাঁরা নিশ্চয় সফলতা অর্জন করবেন তবে এই আরম্ভের মুহূর্তে হঠাৎ বিশ্বাস ভেঙ্গে গেছে কয়েকটি লোকের কথায়, তাঁরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছেন, কলকাতাবাসী কেউই এ গাড়ীতে উঠবে না, তবে তাঁদের কথায় এও বিশ্বাস আছে যে, এই ব্যবস্থা যদি কলকাতাবাসীর সুখ ও সুবিধার দিকে তাকিয়ে দ্রুত উন্নতি করা হয় তাহলে কলকাতাবাসী কখনই একে অবহেলা করবে না। মিঃ সুটার আরও বললেন যে, অন্যান্য শহরের মত এখানেও শহরবাসীর সমর্থন পেলে কিছুদিনের মধ্যেই চল্লিশ হাজার যাত্রী এক, দেড় মাইলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেখান যাবে। প্রশ্ন যে, ট্রামওয়ে কোম্পানীর যেমন উত্তম ব্যবস্থা ও সুষ্ঠু পরিচালনা নির্ভরযোগ্য তেমনি জনসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও পরিপূর্ণ সমর্থন না পেলে কখনই

এ কোম্পানী দ্রুত উন্নতি করতে পারবে না। স্টুটার মিউনিসিপাল কমিশনারগণের উপদেশ, ইঞ্জিনীয়ার মিঃ কিম্বারের সাহায্য ও লাইন কণ্ট্রাক্টার মেসার্স বার্ণ অ্যাণ্ড কোম্পানীর শক্তি প্রার্থনা করে বললেন, কলকাতা শহরের কমিশনারগণের স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে এবং বিশেষ করে অনারেবল কৃষ্টদাস পালের নাম উল্লেখ করলেন।

অনারেবল কৃষ্টদাস পাল বৈকালের শুভ মুহূর্তটি কামনা করে শহরের ট্রাম চলাচলের দিনটি অক্ষয় করে রাখবার জন্য কটি কথা বললেন।"

[লেখক কৃত অনুবাদ।]

এই ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর ট্রামওয়ে দ্বিতীয় জন্ম উল্লেখযোগ্য। এই দিন থেকে শহরে আবার ট্রাম চালনা স্থরু হল এবং মেসার্স প্যারিশ অ্যাণ্ড স্টুটার কোম্পানী এর পরিচালনার ভার পেল। প্রথমে শিয়ালদহে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চিৎপুরে, নভেম্বরে চৌরঙ্গীতে, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ধর্মতলায়, শ্যামবাজারে জুন মাসে, ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে ও এই রকমভাবে শহরের চারিদিকে উনিশমাইল পর্যন্ত এই ট্রামওয়ে চালু হল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে খিদিরপুরের দিকে ষ্টীম ইঞ্জিন যুক্ত ট্রাম শহরের ভিতরে বেশী চালু হতে পারে নি এই জন্যে যে, ষ্টীম ইঞ্জিনযুক্ত ট্রামে বেশী শব্দ হয় এবং সেই জন্য শহরবাসীর সুখশান্তি বিনষ্ট হয় বলে তারা প্রতিবাদ করে এই ব্যবস্থাকে শহরের ভিতর থেকে সরিয়ে রেখেছিল।

তারপর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় বিদ্যুৎ এল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী বুধবার পত্র ও পত্রিকায় দেখা গেল ট্রামওয়ে কোম্পানী গত মে মাসে করপোরেশনের কাছে ইলেক্‌ট্রিক ট্রামওয়ের জন্য এই মর্মে একটি পত্র প্রদান করেছেন, তাতে তারা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ষ্টেটমেণ্ট ও একাউণ্টস দাখিল করে জানিয়েছেন যে, অবিলম্বে ইলেক্‌টিক ব্যবস্থা চালু না হলে ট্রামওয়ে চালান তাঁদের পক্ষে মুস্কিল হবে। করপোরেশনের ডাইরেক্টার তাঁদের একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করে নতুন করে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩০বছর অধিকার দিয়ে ইলেক্‌ট্রিক ব্যবস্থা চালু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু সর্ত এই, তিন বছরের মধ্যে ইলেক্‌ট্রিক ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং ৩৫ হাজার টাকা করপোরেশনকে দিতে হবে। করপোরেশনের এই সর্তে ট্রামওয়ে কোম্পানী স্বীকৃতি জানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বিজলী শক্তিচালিত ট্রাম চালু করবার জন্যে কাজ শুরু করে দিল। কারণ, তাঁরা এতদিন ধরে ঘোড়ার দ্বারা ট্রাম চালিয়ে যে অসুবিধে ভোগ করেছেন, আর সে অসুবিধা ভোগ করতে

রাজী নন। প্রায় দৈনন্দিন দু'চারটি ঘোড়া শহরের সূর্যের তাপে মরে যেত, তা'ছাড়া ক্ষীণজীবী হয়ে হঠাৎ একদিনের পথের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ত। অথচ বিদেশ থেকে বহু মূল্য দিয়ে তেজিয়ান ঘোড়া আনতে হত, না হলে বোঝা বওয়া মুস্কিলের ব্যাপার। এই সব অসুবিধে ভোগ করে কম মুনাফা করে আর চালান সম্ভব হয়ে উঠছিল না। এর-পর এই ইলেক্‌ট্রিক সুযোগ কোন মতেই ট্রামকোম্পানী ছাড়ল না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সেই ট্রামওয়ে বিজলী শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে সংস্কার সুরু করল। সেই কাজ শেষ হল ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। সেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরের পর থেকেই আজকের এই বর্তমানের ইলেকট্রিক ট্রাম।

সেই ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসটিও ট্রামওয়ের জীবনের একটি স্মরণীয় কাল। তখনও সেই ১৯ মাইল ছিল লাইনের দৈর্ঘ্য, গাড়ী ছিল ১৮৬ খানা। এরপর একলাফে অগ্রগতি হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ৩০ মাইল পথ জুড়ে লাইনের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায়। এরপর থেকেই ট্রাম কোম্পানী একই নিয়মে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। যা কিছু রদবদল হয়েছে তা খুব একটা বোঝা যায় না।

তবে কলকাতা ও হাওড়ায় দিনের পর দিন যাত্রীর সংখ্যা কত বেড়ে চলেছে তার হিসেব লক্ষ্য করবার মত। একদিন যে ট্রামে লোক উঠতে চাইত না আজ সে ট্রামে ওঠবার জন্যে লোকের ব্যাকুলতা দেখুন। ১৯৩৯ সালে কলকাতা ও হাওড়ায় ট্রামে যাতায়াত করেছিল ১০ কোটি ৬৪ লক্ষ যাত্রী। ১৯৫০ সালে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩২ কোটি ৪৩ লক্ষ। ১৯৫২ সালে ৩৮ কোটি ৩৭ লক্ষ। ১৯৫৫ সালে ৩৮ কোটি ৪১ লক্ষ! ১৯৫৭ সালে ৪০ কোটি ১৯ লক্ষ। ১৯৫৯ সালে একটু কমে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৮ কোটি ৭২ লক্ষ ৯ হাজার দুইশত ৮। এত কোটি যাত্রী বহন করে ট্রাম কোম্পানীর আয়ও লক্ষ্য করবার মত। কলকাতা ও হওড়ায় (মান্থলী টিকেট সমেত) নগদ আমদানী ১৯৫০ সালে হয়েছে ২ কোটি ১১ লক্ষ ৬৫ হাজার ১ শত ২৭ টাকা। ১৯৫২ সালে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৯ লক্ষ ১১ হাজার ৯ শত ৬৪ টাকা। ১৯৫৫ সালে ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৭২ হাজার ৪ শত ১৮ টাকা। ১৯৫৭ সালে ২ কোটি ৬০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮ শত ৫২ টাকা। ১৯৫৯ সালে এই আমদানীর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৭৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ১ শত টাকা।

ট্রাম কোম্পানীর গাড়ী পিছু যাত্রী সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ১৯৩৯ সালে প্রতি ট্রাম গাড়ীতে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করেছে।

১৯৪৭ সালে যাতায়াত করেছে ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার যাত্রী। আর ১৯৫৭ সালে যাতায়াত করেছে প্রতি ট্রামে ৯ লক্ষ ৬৬ হাজার যাত্রী। ১৯৩৯ সালে কলকাতা ও হাওড়ায় ট্রাম গাড়ী ছিল ৩১৩ খানা। ১৯৫০ সালে ছিল ৩৭৭ খানা। ১৯৫২ সালে ৪১১ খানা। ১৯৫৩ সালে রাস্তায় বেরিয়েছিল ৪০২ খানা গাড়ী। ১৯৫৫ সালে গাড়ী ছিল ৪১৭ খানা, আর রাস্তায় বেরিয়েছিল ৪১৬ খানা। ১৯৫৬ সালে এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪১৬ খানা ও ৪১২ খানা। ১৯৫৭ সালে ৪১৬ খানা ও ৪১৫ খানা। এর পরে গাড়ীর সংখ্যা আর বাড়েনি। প্রতিদিন ট্রাম কোম্পানীকে যাত্রীদের টিকিট সরবরাহের জন্য ৪ পাউণ্ড কাগজের টিকিট সরবরাহ করতে হয়।

[মুদ্রিত দু-খানি চিত্র ও ট্রামওয়ের সম্বন্ধে কিছু তত্ত্ব "কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর" পাবলিক রিলেশনস অফিসার শ্রীবসন্ত মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

কলকাতায় যাঁরা দুই-একদিনের জন্যে আসেন, কলকাতাকে যাঁরা দেখতে আসেন তাঁদের কাছে কলকাতার দর্শনীয় দ্রব্যসম্ভার অনেক। কিন্তু সে দর্শনীয় দ্রব্য-সম্ভার নানান স্থানে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ এখানে এলে সে সম্বন্ধে জানা সম্ভব নয়। এখানে কেন? কোথাও অপরিচিতের দরজা হঠাৎ উন্মুক্ত হয়ে যায় না।

তামাম পৃথিবীর সব দেশের লোকই ভারতবর্ষের এই লোভনীয় সহরটি দেখবার জন্যে পাগল। জানি না, এ সহরের রূপ কত অপরূপ? চৌরঙ্গীর অভিজাত হোটেলগুলিতে খবর নিলে জানা যাবে, নিত্য নতুন প্রবাসীর আসা যাওয়া। দমদম এয়ার ওয়েজেও খবর নিলে জানা যাবে। হুগলী নদীর জলে নিত্যনতুন বিভিন্ন বর্ণের জাহাজ। ক্যালকাটার ঐতিহ্যকে বুকে নিয়ে তারা ইউরোপের বাজারে ছুটছে। ইণ্ডিয়ার গৌরব দিক্‌দিগন্তে।

বোম্বাই ট্রেণ এসে হাওড়া ষ্টেশনে থামছে। নামছেন কোন ট্যুরিস্ট জার্মাণ বা আমেরিকান কিংবা কোন য়ুরোপীয়ান যুবক যুবতী। তাদের চোখে বিস্ময় কণ্ঠে আর্তি। ফিস ফিস্ করে পরস্পরকে তারা জিজ্ঞেস করছে—এটাই কি সেই কলকাতা? একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে দেশকে লুটে নিয়েছিল।

ইতিহাস। এরা বোধ হয় ইতিহাসের স্টুডেণ্ট। তাই এরা ঐতিহাসিক সহর দেখবার জন্যে ছুটে এসেছে। এসেছে এয়ারে নয়, জাহাজে। সাতসমুদ্দর পাড়ি দিয়ে এসেছে এই ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে নয়, এই

কলকাতায়। কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে ইংরেজের পরিত্যক্ত সংসার দেখতে এসেছে।

চৌরঙ্গী ইংরেজের কাছে চিরকালই প্রিয় ছিল। তারা নিজের মনের মত করে সাজিয়ে গেছে চৌরঙ্গী। চৌরঙ্গী যেন ইংরেজের রাত্রিসহচরী। আজও দেখুন সেই চৌরঙ্গী। মুগ্ধবিস্ময়ে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন। রাত্রিকালে কলকাতার চৌরঙ্গী লণ্ডনের পিকাডিলীকেও হার মানায়।

সেই চৌরঙ্গীতে আছে গ্রাণ্ড হোটেল। নামের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। প্রায় বিদেশীরা দমদম এরোড্রাম থেকে সোজা এই গ্রাণ্ডেই আসেন। শুধু গ্রাণ্ডে কেন? তামাম চৌরঙ্গী ও ডালহৌসির চারিদিকে অনেক হোটেল। সব চেয়ে পুরোনো হোটেল 'গ্রেট ইষ্টার্ণ', 'স্পেন্সেস'। এই হোটেলগুলি কলকাতার ঐশ্বর্যের প্রমাণ দেবার জন্যে বিদেশীদের যথেষ্ট সুখ ঐশ্বর্য বিতরণ করে।

হোটেলের সুসজ্জিত অলিন্দে বসে বিদেশীরা পুলকিত। দুনিয়ার সেরা জায়গায় বুঝি তারা এসে পড়েছে। এখানে সব পাওয়া যায়। গাইডকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায়, বহু লোভনীয় দর্শনীয় দৃশ্যসম্ভারের খোঁজ। এখানে একটি চমৎকার বাজার আছে, সে বাজারের ব্যাখ্যা কিপলিং-এর বিখ্যাত বই "দি সিটি অফ্ দি ডেড্ফুল নাইটস-এ" লিপিবদ্ধ আছে। যাঁরা সে বই পড়েছেন তাঁরা বিজ্ঞের মত মাথা নাড়েন। যাঁরা পড়েন নি, তাঁরা সুন্দর স্বপ্ন দেখে মুগ্ধ হওয়ার মত মুখ চোখ রাঙান।

লিণ্ডসে ষ্ট্রীট জুড়ে অনেক গাড়ী পর পর সাজানো। গাড়ীর মেলায় চারিদিক ভরা। ভেতরে কেউ নেই। পথের ওপর আরোহীবিহীন গাড়ী কোন কোন গাড়িতে ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে। মিসিবাবা একতোড়া ফুল কিনতে গেছে পাকা দুঘণ্টা। হারিয়ে গেল কিনা কে জানে? কোচম্যান তার মিসিবাবার শ্রাদ্ধ করতে করতে বিড়িতে টান দিচ্ছে। মাঝে মাঝে অবশ্য গাড়ীর শব্দ। ব্রেক কষলে আর একটি শব্দের অনুরণ। একদল লোকের ঝগড়া ও মারামারি। তারপর দুটি প্রবাসী সাহেব-মেমকে নিয়ে টানাটানি।

লোকগুলি আসলে টিপসের জন্য এমনি তাণ্ডব চালাচ্ছে। গাড়ীতে যে আগে হাত দিয়েছে সেই টিপসের অধিকারী। কিন্তু কে হাত দিয়েছে প্রথম, তার ঠিক না হওয়ায় এই গণ্ডগোল। তারপর আছে মোটবাহীদের তৎপরতা।

তবে অধিকাংশ বিদেশী বিশেষ কিছু কেনাকাটা করে না। অল্প প্রয়োজনীয় কিছু ক্রয় করা ছাড়া তাঁরা এমনি বেড়িয়ে যান। এমনি বেড়ানোর জায়গাই এটা। অনেক দোকান। অনেক আলো। অনেক ঐশ্বর্যের বর্ণাঢ্য চারিদিকে। চমকে যায় দর্শনার্থী। *এমন মার্কেট কোথাও আছে কিনা তারা মনে মনে খুঁজতে থাকে। নিউইয়র্ক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী। লণ্ডনের সুখ্যাতি জগদ্বিখ্যাত। কোথাও এমন একটি মার্কেট আছে কিনা প্রত্যেক বিদেশী চিন্তা করে।

অদ্ভুত একটি স্বপ্নের মিঠেল আমেজ চোখে নিয়ে বিদেশীরা এই বাজারে প্রবেশ করে। একে তো বাইরে থেকে দেখা—কি অদ্ভুত কারুকার্যময় এই বাজারের বহির্ভাগ। যেন কোন মুসলমান নবাব-বাদশাহের প্রাসাদের সৌন্দর্য। উঁচু উঁচু মিনার দিয়ে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। একটি উঁচু ঘড়িঘর আছে। তার মাথার ওপর কাকের উৎপাত। বাইরের দর্শনে চোখে বিস্ময়ের আর্তি সুতরাং তার অভ্যন্তরে ঢোকার পূর্বে মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা করুন। কিন্তু ঢোকবার পরই অদ্ভুত ইংরিজী আপনার কানে যাবে। এখনও শোনা যায়।

'ইয়েস, ইয়েস, টেক, টেক, নো টেক বাট সি। ভেরি চিফ, ডোণ্ট বায়, ওন্‌লি সি।' তারপর মাতৃভাষায় গাল দিয়ে বলে: আরে শা? দেখে যা না একবার। না কিন্‌লি তো বয়েই গেল। সেলস-ম্যান যুবকটি একগাল হাসে। হাসির সঙ্গে হাসি মেশানো ভদ্রতা। বিদেশীও বোকার মত হেসে মাথা নেড়ে পথ দিয়ে চলে যায়। কিন্তু যেসব বিদেশী টুরিস্টরা এখানে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বই লিখেছেন, সেই বইয়ের পাতা ওল্‌টালে প্রায়ই পাওয়া যায়—এখানকার সেলস্‌ম্যানদের কৌতুকপ্রদ দুর্বোধ্য ইংরিজী ও তাদের অদ্ভুত ধরণের ম্যানারস্‌। তাই বলতে হয়—আমরা কাদের বলি বোকা?

হগ মার্কেটে আমার দোকান আছে। এ কথা খুব গর্বের সঙ্গেই অনেককে বলতে শুনেছি। (ফুটপাতের ওপর দোকান নয়)। সে দোকান যে কোন দরেরই হোক্। অল্প মূল্যের ক্যাপিটাল নিয়ে যত নিম্ন স্তরেরই হোক্। এখানে দোকান আছে শুনলে অনেক আচ্ছা আচ্ছা মেয়ের বাবা পাত্রের হাতে মেয়ে দেবার জন্য পাগল হন।

কিন্তু কেন? তার কারণ হল ঐ। এর মর্যাদা এখানকার অধিবাসীদের চোখ ধাঁধায়। তবে আর একটি কথা না বলেও পারা যায় না সে হল

বাঙ্গালীর 'সাহেব-প্রীতি'। এ কথা এই স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও উচ্চারণ করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের যেই মুখ দেখলেন, ওমনি একটু সাহেবী ঘেঁষা হয়ে উঠলেন। সাহেবী পোষাক পরা কথার মধ্যে ইংরিজীর টাক্‌না দেওয়া। চালচলনে লণ্ডনে বাস করছেন এমনি-ধারা ভাবভঙ্গি। বাড়ীর আসবাবপত্তরও যতদূর সম্ভব সাহেবী ধরণের করে রাখা—ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বায়নাই আপনার রপ্ত হয়ে উঠল। তাই তখনই আপনাকে ছুটতে হল, যাবতীয় সওদা করতে এই বিখ্যাত ষ্টুয়ার্ট হগ মার্কেটে। যেখানে পৃথিবীর সব জিনিষই পাওয়া যায়।

আজ এই মার্কেট, সাহেব চলে যাওয়ার পর এই সব সাহেব ঘেঁষা খদ্দেরেই পূর্ণ। তাই দোকানদাররা বলে আগের মত আর সেরকম খদ্দের নেই। তার মানে, উচ্চমূল্যে আর জিনিষ বিকোয় না। সাহেবরা দর করত না, আধা সাহেবরা দর করে।

দুপুরের শীতকালীন জোরালো রোদ্দুর কিছু পান করে তাড়াতাড়ি ছায়া-শীতল আশ্রয় খোঁজার জন্য এই বিখ্যাত মার্কেটেই ঢুকে পড়লাম। দেখি, আরও নতুন সাজ আরও নতুন ঐশ্চর্যের চেক্‌নাই লেগেছে ঐশ্চর্যময়ী যৌবনসম্ভবা তরুণী মার্কেটের সবদিকে। ব্যাপারটা প্রথমে আমাকে হতচকিত করল। তারপর স্মরণে এল বড়দিন আগত। তাকে স্বাগতম জানাতে আসছে বহু দেশ-বিদেশ থেকে নানাবিধ নতুন দৃশ্যসম্ভার। যে সব দোকানদার দুপুরবেলা একটু ঝিমোয়, তারাও দোকানে খদ্দেরের আবির্ভাবে তৎপর হয়ে উঠেছে। একটু নয় বেশ কলরব। বেশ গুঞ্জন আজ এই বিখ্যাত মার্কেটে। কাচের শো-কেসে কত জিনিষ, কত রং—কত লোভের হাতছানি পথচারিকে প্রলুব্ধ করছে। পকেটে পয়সা নেই, না হলে আমিও এই লোভের হাত থেকে রেহাই পেতাম না। কিনতাম নিশ্চয়ই যেকোন একটি জিনিষ। প্রিয়জনকে দেবার জন্যে না হোক, নিজেকে দিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভরিয়ে তুলতাম নিজের অপ্রশস্ত বক্ষস্থল।

মনে পড়ে স্যর স্টুয়ার্ট হগ সাহেবের কথা। আজ তাঁরই নাম স্মৃতি হয়ে এর আকাশে বাতাসে ফিরছে, কিন্তু একদিন তাঁকে এই মার্কেট তৈরী করতে কি কষ্টই পেতে হয়েছিল? অবশ্য সান্ত্বনা এই জন্যে যে, পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ করতে গেলেই অনেক বাধা এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়। সেদিন এই বাজারটি নির্মাণ করতে গিয়ে হগ সাহেবকে বার বার অপদস্থ হতে হয়েছে

এবং সহরবাসীর অনেক দুর্নাম হজম করেও তিনি আজ এই বাজার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

বিস্তারিত বিবরণে পরে আসছি। তবে সেদিন কেন এই বাজারটি প্রতিষ্ঠা হল, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। ১৮৬৩ সালে তখন এই অঞ্চলের অবস্থা খুব সঙ্গীণ ছিল। 'ফিভার হসপিট্যাল কমিটি এই অঞ্চলের মানুষের অসুস্থতার সন্ধান নিয়ে জানতে পারলেন যে, এখানে উত্তম কোন বাজার না থাকার জন্যে এই গণ্ডগোল হচ্ছে। সমস্ত বাজে জিনিষ আহার করে মানুষের উদরের অবস্থা সঙ্গীণ, এবং সেই জন্যে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। তখন এখানে ধর্মতলা বাজার ও টেরিটি বাজারই বিখ্যাত ছিল। কমিটি ঠিক করলেন এই বাজারগুলি সংস্কার করতে হবে। বাবু হীরালাল শীলের এই ধর্মতলা বাজার ছিল। অথচ সে বাজারটি উত্তম স্থানে না থাকার জন্যে সম্রান্ত ইয়োরোপীয়ানদের অসুবিধা।

১৮৬৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী জাষ্টিসরা ঠিক করলেন, এক লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটি নতুন বাজার নির্মাণ করতে হবে। এবং সেই জন্যে গ্রাণ্ড স্ট্রীট ও কর্পোরেশন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটি জায়গার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গেল।

তারপর ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে জাস্টিস মিঃ জেমস উইলসন একটি কমিটি তৈরী করে তার ওপর ভার দিলেন বেসরকারী বাজারগুলি তদারক করতে। কিন্তু সেই কমিটি সহরের বাজারগুলি তদারক করে তার বহু গলদের কথা এসে লিপিবদ্ধ করলেন। মিঃ জেমস উইলসন ঠিক করলেন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট তৈরী করে এইসব বাজার উচ্ছেদ করলেই তার প্রতিকার হবে, কিন্তু নভেম্বর মাসে জেমস উইলসনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে জাস্টিসরা বাজার প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন ভেঙে দিলেন। এর মধ্যে অবশ্য বেসরকারী বাজারের কর্তারা ছিলেন।

এরপর এলেন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও পুলিশ কমিশনার স্যার স্টুয়ার্ট হগ সাহেব।

১৮৭০ সালের ডিসেম্বরে তিনি একটি স্পেশাল কমিটি তৈরী করে বাজার প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করলেন, এবং তার জন্যে একটি কলিকাতা মার্কেট আইন তৈরী হল, (Calcutta Market Act VII of 1871) তার দ্বারা ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের মোড়ে বাজার নির্মাণ হতে লাগল।

উত্তমরূপে একটি বাজারের নক্সার জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর নক্সা প্রস্তুতকারী মিঃ আর আর বেন (R. R. Bayne) বর্তমানের এই শিল্পনৈপুণ্যসম্পন্ন প্রশংসিত হগ মার্কেটের কাঠামোটি প্রস্তুত করেছিলেন। এবং তাঁরই নক্সা অনুযায়ী ১৮৭১ সালের সেপ্টেম্বরে বাজারটি প্রস্তুত হতে আরম্ভ হল, শেষ হল ১৮৭৪ সালে। মেসার্স বার্ন এণ্ড কোম্পানী ২,৫৪,৭২০ টাকা নিয়ে এটি সম্পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তখন পঁচিশ বিঘা জমি ২,১৮০০০৲ টাকায় কিনে বাজার সুরু হয়েছিল তারপর অবশ্য অনেক বেড়ে যায়! সেই সময় জমির মূল্য ও এই বাজারের গৃহাদি নির্মাণের জন্য ছয় লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা ব্যয় হয়েছিল! এরপর অবশ্য নতুন জমি ক্রয় করেও আরও কয়েকটি সুপ্রশস্ত ও সুদীর্ঘ বিপণি গৃহ নির্মিত হয়। এই বাজারের মাঝখানে একটি ক্লক-টাওয়ার বা ঘণ্টাঘর আছে।

সেদিন ধর্মতলা বাজারের সঙ্গে এই বাজারের যে দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল, তা বেশ কৌতুকপ্রদ। হগ সাহেব নিজের বাজার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে সাহেব খদ্দেরদের গাড়ী ভাড়া দিয়ে বাজারে আনতেন, তাদের বিনামূল্যে বহু মূল্য দ্রব্যসামগ্রী বাড়ীতে তুলে দিয়ে নিত্য-নতুন ভোজ দিয়ে তাঁর বাজারের খদ্দের করবার জন্যে চেষ্টা করতেন। ব্যাপারীদের জোরজুলুম করে, রেট কমিয়ে দিয়ে বাজারে বসাবার চেষ্টা করতেন। এই জন্যে হীরালাল শীলের সঙ্গে তাঁর বহু বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের ১২৮০ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে প্রকাশিত 'বাজারের লড়াই' "The Battle of the Markets" নামক প্রহসনে তখনকার দিনের ধর্মতলার বাজার ও হগ সাহেবের বাজার সম্বন্ধে দলাদলির চিত্র বেশ উপভোগ করা যায়। একদিকে বাবু হীরালাল শীল অন্যদিকে স্যার স্টুয়ার্ট হগ। একবার হগ সাহেবের ২০ হাজার টাকা দরকার হল।

বাজারের লড়াই প্রহসন থেকে উদ্ধৃতি করছি—তৃতীয় অভিনয়। টাউন হল, জাষ্টিসদিগের সভা। উপস্থিত—হগ, রবার্টস্ ও আশ একজন সাহেব, রাজেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণদাস বাবু, উমেশ বাবু, হীরলাল বাবু ও তিনজন জাস্টিস।

হগ। সভ্যগণ, পূর্বে যে টাকা মিউনিসিপ্যাল বাজারের নিমিত্ত আপনারা মঞ্জুর করেন তাহা গিয়াছে। আমাকে আর ২০ হাজার টাকা না দিলে আর কাজ চলে না। আপনারা এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলে বোধ হয় ধর্মতলার বাজার আমি ভাঙ্গিয়া লইতে পারিব! আমি কলিকাতার সর্বময় কর্তা, আমি লোককে জোর করিয়া হীরালাল বাবুর বাজারে না যাইতে

দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি লাইসেন্স বন্ধ করিয়া ব্যবসাদারদিগকে জব্দ করিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি স্লটার হাউস বন্ধ করিয়া কসাইদিগকে একরূপ জব্দ করিতে পারি কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি কসাই কি বাগ্‌দিগণ পচা সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে বলিয়া তাহাদিগকে ফাটকে দিতে পারি, কিন্তু আমি তাহা করি না। আমি ছ লাক ন লাক টাকা চাহিতেছি না। সামান্য, অতি সামান্য গুটী কতক চাহিতেছি। আমি হাটের নিমিত্ত যে পরিশ্রম করিতেছি তাহা আপন মুখে বলা ভাল দেখায় না, কিন্তু আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই। আমি শুদ্ধ নিজে খাটিতেছি না আমার লোকজন সকলই ব্যস্ত। পোলিসের কনষ্টেবল, সরজন ইন্সপেকটর সকলই আপন আপন কর্ম কাজ ফেলিয়া ইহাতে ব্যস্ত। ফড়িয়াগণ হাট লইয়া ব্যস্ত, কলিকাতার তাবত লোক হাট লইয়া ব্যস্ত। রেটপেয়ারগণ হাট হাট করিয়া চীৎকার করিতেছে। এত দিবস তাহারা মনের সহিত হাট বাজার করিতে পারে নাই। হাট-বাজার না করিয়া তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এখন সেই হাট সম্মুখে উপস্থিত। হাটশুন্য কলিকাতাবাসী লোক তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিবে বলিয়া অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছে। আপনারা এই ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করুন, কোরে রেট-পেয়ারদের আশীর্বাদের ভাজন হউন।

জেমস। এ অতি উত্তম প্রস্তাব। এ টাকা দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু যাহাতে সাহেবরা হাটে যান তাহার কি উপায় করিয়াছেন? আমার বিবেচনায় যাঁহারা হাটে যান তাঁহাদের গাড়ি ভাড়া দেওয়া কর্তব্য।

রাজেন্দ্র। হগ সাহেব যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত হতে পারি না। হাটের নিমিত্ত বিস্তর ব্যয় হইয়াছে।……তিনি বিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, আপন ব্যয়ে লাঠিয়াল রাখিয়া হীরালাল শীলের সঙ্গে বিবাদ করুন, সাহেব সুবাকে খাওয়ান-দাওয়ান, নিজে ব্যয়ে করুন। আমরা কখনই ইহার নিমিত্ত টাকা মঞ্জুর করিতে পারিব না। করদাতারা মুখের অন্নে বঞ্চিত হইয়া ট্যাক্স দেয় এবং তাহাদের অর্থ এরূপ অপব্যয় করিলে আমাদের ধর্ম থাকে না।”

তারপর অনেক বাতবিতণ্ডার পর রবার্টস সাহেব বলেন—“হাঁ, হগ সাহেব কলিকাতার সর্বময় কর্তা। উনি মিউনিসিপ্যালিটির কর্তা, উনি পোলিসের কর্তা, উনি আমাদের ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার—সবই উনি। তবে তাঁর কথাতেই আমরা ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিতে পারি না।…

হগ। রবার্টস! এই নিমিত্ত বুঝি সেদিন এত টাকা ব্যয় করিয়া তোমাদের কাটলেট, কোরমা, কাবাব, স্যামপেইন, সেরি খাওয়াইয়াছিলাম! ও নেমখারাম আজ পর্যন্ত তা যে জীর্ণ হয় নাই?

রবার্টস। তুমি তোমার ঘরের টাকা আনিয়া আমাদিগকে খাওয়াইয়াছিলে না?"

তারপর যখন টাকা হগ সাহেব পেলেন না তখন ক্ষুব্ধ হয়ে—।

"হগ। (স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া) থাক্‌ল তোমাদের বাজার! বাজার পুড়ে যাক্‌, চুলোয় যাক্‌, উচ্ছিন্ন যাক্‌—তোমরা উচ্ছিন্ন যাও! তোমরা সকলই আমার বিরুদ্ধ! হা অদৃষ্ট! (দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণ গালে চপেটাঘাত) হা অদৃষ্ট! (বামহস্ত দ্বারা ঐরূপ করণ) এত টাকা দিলে আর ২০ হাজার টাকা দিতে প্যাল্লে না—হা পোড়া কপাল (দুই হাত দিয়া দুই গালে চপেটাঘাত) থাক্‌ল তোমাদের বাজার, থাকলো তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি, থাক্‌ল তোমাদের কাগজপত্র—(কাগজপত্র, চেয়ার প্রভৃতি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান)—যবনিকা।"

এ প্রহসনের যবনিকা হয়েছিল কিন্তু আসল হগ সাহেব কখনও নিরুৎসাহ হন নি, তিনি ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে ধর্মতলা মার্কেট কিনে নিয়েছিলেন। এবং নিজের বাজারটির উন্নতির জন্য নব নব পরিকল্পনা কাজে পরিণত করেছিলেন। তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে, আজকের এই বিস্তৃত জায়গা জুড়ে, পৃথিবীজোড়া নাম নিয়ে, হরেক দ্রব্যসম্ভার বুকে নিয়ে বিরাট বাজারটি।

দ্রুত এই বাজারটি কত উন্নতির শিখরে ওঠে মিউনিসিপ্যালিটির হিসেব লক্ষ্য করুন। ১৯০৩-৪ সালে আয় ২,২৬,৮০৮ টাকা, দশ বছর পরে বাড়ে, ৩,৯২,৭৮১ টাকা। ধর্মতলা বাজার ক্রয়, নতুন বাজার তৈরী, ব্যাপারীদের টাকা ধার প্রভৃতির ব্যয় পড়েছিল মোট ১৪½ লক্ষ টাকা এবং ১৮৮২-৮৩ সালে স্যার হেনরি হারিসন পরবর্তী হিসেবগুলি সংযোজন করে দেখেছিলেন আয় সাধারণতঃ বাৎসরিক শতকরা ৫½ বর্ধিত হচ্ছে। এবং টাকা ধারের ওপর শতকরা ৬½ সুদ পাওয়া যাচ্ছে।

তারপর এই নবনির্মিত বাজারটি পুনঃ পুনঃ সংস্কার ও স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার জন্য বাড়ানো হয়; তার যে মোট ব্যয় হয়েছিল তারও হিসেব লক্ষ্য করবার মত। ১৮৮৩-৮৫, ১৮৯৫-৯৭ এবং ১৯০৩-৪ সালে বাজারটি সংস্কার ও সারানো প্রভৃতিতে ব্যয় হয়েছিল—১,৫৭,০০০ টাকা। ১৯০৭ সালেও

এই বিষয়ে আবার ব্যয় হয়—১১½ লক্ষ টাকা। তারপর ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে মেসার্স মার্টেন এণ্ড কোং (M/S Marten & Co) ৫,৭৭,৯৪৭ টাকা গ্রহণ করে ৬½ বিঘার ওপর আবার নতুন ঘর তৈরী করে দিয়ে যান।

এরপর থেকেই এ বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর বিভিন্ন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ সৃষ্টি হয়। মাছের বাজার আলাদা, তরকারীর বাজার আলাদা, ফলের বাজার, জামা-কাপড় সমস্ত বিষয়ের বাজার আলাদা আলাদা। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। ষ্টল নম্বর অনুযায়ী বাজারের বিভাগ আলাদা এবং তার ভাড়াও আলাদা। এবং প্রত্যেক স্টলের অধিকারীকে মার্কেট অফিস থেকে স্টল রেজিষ্টারী করে নিতে হয়।

এর আরও বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে আলাদা একটি বিরাট কাহিনীর অবতারণা করতে হয়। তাই সংক্ষেপে প্রাথমিক অবস্থাটুকু লিপি-বদ্ধ করে ক্ষান্ত থাকতে হলো।

এবার আসুন একবার এই মার্কেটের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করি। আপনি কোন না সময় সটকাট পথের জন্য এই বাজারে ঢুকে পড়েছেন। আপনার জানা আছে, এর ভেতর দিয়ে গেলেই অন্য পথে যাওয়া খুব সুবিধে। কিন্তু বাজারের ভেতর প্রবেশ করতেই আপনার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। না-না আমি কোন তরুণীর অপরূপ যৌবন শোভা, দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল বলছি না। বলছি অদ্ভুত রংবেরংয়ের দ্রব্যসম্ভারের কথা। বিরাট বিরাট শো কেসে কত বিভিন্ন বর্ণের পোষাক, গয়না, তার উপর পড়েছে আলোর রোশনাই। এখানে দিনের বেলায়ও আলো জ্বলে। সেই আলো থেকে যদি বা চোখ সইয়ে নিতে পারলেন, কিন্তু এত গলিপথ চারিদিকে এঁকে বেঁকে গেছে যে, আপনাকে বিভ্রান্ত হতেই হবে। কোন্ গলি দিয়ে তাকাবেন আপনি? সব গলিই প্রায় এক। একবার এক বাজি হয়েছিল এই নিয়ে। যে সোজা বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু পুরস্কার কেউ পায়নি। আমি একাধিকবার এই পথে সোজা হেঁটেবেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মধ্যমণিতে এসে পথ আটকে গেছে।

মাঝখানে আছে একটি গোল ঘড়িঘর। তার সবদিকে গোল করে গলিপথ। সব গলি পথেই বিপণির সারি। সব গলিতেই আলোর ঝলমল। অবশ্য এখানে যাদের দোকান আছে তাদের এসব ভুল হয় না। তারা এই অনভিজ্ঞের কথা শুনে হাসে।

আপনি বাঘের ছানা দেখবেন? তাহলে চলে আসুন কলকাতার এই বিখ্যাত বাজারে। আছে লোহার খাঁচায় বাঘের ছানা। নানা দেশের, নানা বর্ণের পাখী, খাঁচার মধ্যে বানরেরা কিচিরমিচির করছে তার পাশেই আছে বাঘের খাঁচা। আপনি খাঁচার সামনে গেলেই সে হুম করে ক্ষুধিত চোখ নিয়ে আপনার দিকে তাকাবে।

বড়দিন এসে গেছে। যদি কখনও বড়দিনের সময় আসেন তাহলে দেখতে পাবেন এ মার্কেটের সজ্জা। তার নতুন সাজ দেখে আপনার চোখ ঈর্ষার ভাব জন্মাবে। বড়দিনের কার্ড ও কেক কিনতে আপনার এখানে আসাই সবচেয়ে সুবিধে। অন্ততঃ স্মৃতির ঘরে যে চমক জমা হবে, তার খতিয়ান করতে সারা জীবন কেটে যবে।

এই নিবন্ধটি লিখতে
Municipal Calcutta by S. W. Goode ও শ্রীশিশির কুমার ঘোষ প্রণীত 'বাজারের লড়াই' বই দুইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এখন নয়া পয়সার যুগ। রূপোর টাকার বদলে কাগজের নোট।

(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬১, যুগান্তরে প্রকাশিত)

এ'কশো ; দুশো, পাঁচশো হাজার টাকার খুচরো নোটের বাণ্ডিল অবলীলাক্রমে পকেটে রেখে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান যায়। চোর, পকেটমারের অসুবিধা হলেও সাধারণের সুবিধে। কিন্তু আজ সুবিধে হলেও একদিন অসুবিধে ছিল যেদিন ভারী ভারী রূপোর টাকা পকেটে ফেলে বাজাতে বাজাতে পথ চলতে হত।

তবে সে টাকায় যতটুকু রূপো ছিল আজ তার একটি স্বর্ণকারের দোকানে নিয়ে গেলে তার দেড়গুণ দাম দেয়। এখনও অনেকের সিন্দুকে তাই গচ্ছিত আছে, ভিক্টোরিয়া রাণীর ছাপ অঙ্কিত অথবা পঞ্চম জর্জ, ষষ্ঠ জর্জ অঙ্কিত মোটা মোটা ভারী ওজনের খাঁটি রূপোর টাকা। খাঁটী রূপোর মূল্য থাকলেও যুদ্ধের হিড়িকে তাকে একবারে কাগজে পরিণত করা হল।

তবে উপকার যে কোনটায় সেটা আজও বোঝা গেল না। খাঁটী রূপোকে আগুনে গালালে তার একটি ভিন্ন মূল্য আছে। কাগজকে আগুনে পোড়ালে তা ছাই হয়ে যায়।

কাগজের টাকা আজ এসেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতা ওল্টালে পূর্বে কাগজের টাকার কোন হদিস মেলে না। মেলে ধাতুর টাকার। হিন্দু রাজাদের সময়ও মাঝে মাঝে স্বনামাঙ্কিত সোনা ও রূপোর ধাতুর টাকার প্রচলন দেখা যায়। মুসললান রাজত্বেও ছিল। মোগল রাজত্বেও মোহর, আসরফি, টাকার প্রচলন দেখা যায়।

তবে এ প্রসঙ্গে টাকার ইতিহাস বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন, এই কলকাতার সহরে কড়ি থেকে টাকা এলো কবে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাণিজ্য করতে এসে প্রথম টাঁকশাল করেছিল বোম্বাই সহরে। অক্সেনডেনের পর, জেরাল্ড অঙ্গিয়ার বোম্বাই কুটির অধ্যক্ষ হন। অঙ্গিয়ার বোম্বের মধ্যে একটি টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত করেন। সমগ্র বোম্বেবাসী হিন্দু, মুসলমান ও পর্তুগীজ তাঁদের প্রজা। বোম্বাই তখন ইংরেজদের খাসজমিদারী। ইংলণ্ডের সম্রাটের বিবাহপ্রাপ্ত যৌতুক কাজেই ইংরেজের এই টাঁকশাল স্থাপন

সম্বন্ধে মোগালপক্ষ কোনরূপ আপত্তি করতে পারল না। ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লসও এ সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অনুমতি দান করলেন। বলতে গেলে ভারতের টাঁকশাল এই প্রথম স্থাপিত হল।

ইংরেজের অঙ্কিত মুদ্রাগুলি ভারতের পশ্চিম উপকূলে খুব বেশীভাবে চলতে লাগল। টাকাগুলির ওজন খাঁটী এবং খাদ্যও কম। কাজেই ব্যবসায়ীরা ইংরেজের সঙ্গে এই মুদ্রার বিনিময়ে দ্রব্যাদির আদান-প্রদান করতে লাগল। "সাহী" মুদ্রার একদিকে, পারসী লেখা ছিল বলে মোগল-সুবাদার এজন্য একটু আপত্তি করলেন; কিন্তু সে আপত্তি টিকল না।' "বোম্বের টাঁকশালে নিম্নলিখিত মুদ্রাগুলি প্রস্তুত হত :—

(১) জেরাফিন—মূল্য ১ শিলিং ৮ পেন্স

(২) পারসী

সাহী— „ ৪ শিলিং

(কাসগারের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য)

(৩) পাগড়া „ ৯ শিলিং

(কালিকটের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য)

এর আরও পূর্বে, বাঙ্গলায় পাঠান রাজত্বকালে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে 'বাংলার সামাজিক ইতিহাস'-এ (দুর্গাচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত ও ফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত (১৩১৭) উল্লেখ আছে—"তখন পয়সা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী ছিল না। টাকা ভাঙ্গালে এক বোঝা কড়ি পাওয়া যেত। তাই দিয়ে সাধারণতঃ সমস্ত জিনিসপত্তরক্রয় করতে হত।"

কড়ির প্রচলন যে আজকের নয় তার অনেক নিদর্শন আছে। কড়িকে বাঙ্গালী মেয়েরা লক্ষীর সঙ্গে তুলনা করে। লক্ষীর ঝাঁপিতে কড়ি রাখলে তবে ধন সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাহলে এই কড়ি যে টাকা-পয়সার মত পূর্বে সমাদৃত হত তা এই থেকেই বোঝা যায়। তাই টাকা-পয়সা কথাটি অধুনা প্রচলিত হলেও 'টাকা-কড়ি' কথাটি বহুল প্রচলিত আমাদের চলিত কথাতেই প্রকাশ পায়। টাকা বহুবার আসা-যাওয়া করলেও যে পয়সা, আধুলি, সিকি, দুয়ানী বেশী দিন আসেনি তার অনেক প্রমাণ আছে।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১৮ ভলিয়ুমের 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে এ আপজন, Calcutta in the olden Times—Its localities (1792-3) নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন :—কড়ির প্রচলন থেকে টাকার

প্রচলন কবে শুরু হল এবং কলকাতায় টাকশাল কবে হল। প্রবন্ধটির কতকাংশ এখানে উল্লেখযোগ্য: "১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত। কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হয়নি। পয়সার তখন চলন ছিল না বললেই হয়। কড়ির প্রচলনই তৎকালে অধিক ছিল। এর বহু পূর্বে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে স্মিথ নামক কোন সাহেব ইংলণ্ড থেকে বার্ষিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে 'অ্যাসে মাষ্টার' (মুদ্রা পরীক্ষক) নিযুক্ত হয়ে আসেন। পুরাতন টাঁকশাল সেণ্টজন্স চার্চ নামক গির্জার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। তথায় ১৭৯১ থেকে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী আপনার টাকা প্রস্তুত করতেন। ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপরিস্থ নূতন টাঁকশাল ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ফুরানে মুদ্রা প্রস্তুত করে লওয়া হত। তাম্র প্রধানতঃ প্রিন্সেপ সাহেব (পরলোকগত জেমস প্রিন্সেপের পিতা) করতেন। ফলতায় তাঁর একটি কারখানা ছিল। (১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সেপ সাহেব তাঁর যন্ত্রাদি গভর্নমেণ্টকে বিক্রয় করে দিয়ে যান।) আপনাদের নাম মুদ্রিত করা (মোগলের মস্তক ও পারসী-লিপি সংবলিত হলেও) ইংরেজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি গৌরবের বিষয় মনে করতেন।

ক্রমে ক্রমে কড়ির আদানপ্রদানে অসুবিধার উদ্ভব হয়; ১৩ই অক্টোবর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের একটি পত্রিকার উল্লেখ থেকে উপলব্ধি করা যায়। "এই সময়ে বহরমপুরে ইংরেজদের একটি ছোটখাট কেল্লা তৈরী হচ্ছিল। ইঞ্জিনীয়ার ব্রোহিয়ার সাহেব কুলী মজুরদের হিসাব প্রদান সম্বন্ধে কলকাতা কৌন্সিলের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে লেখেন—কারিগর ও কুলীদের কড়ি দিয়ে পারিশ্রমিক দিতে গেলে বড়ই অসুবিধা। কড়ির বদলে তাম্র কিংবা রৌপ্য-নির্মিত "আনির" প্রচলন হলে বড়ই কাজের সুবিধা হয়। কোম্পানীর দুজন "সরফ" এখানে এসে কড়ি ও আনির আদান-প্রদান কাজের ভার গ্রহণ করলে সুবিধা হয়। এই সরফেরা কড়ির জন্য কোনরূপ বাট্টার দাবী করতে পারবেন না। কারণ এরূপ বাট্টা নিলে গরীব শ্রমজীবিদের ক্ষতি হবে ও তারা কাজে আসবে না।"

"Court's Letter Dated 10th jany 1758" তে অফিসে কড়ির ব্যবহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। "বোর্ড অনেক টাকার কড়ি কিনে রেখেছে। এজন্য এর সদ্ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। সেজন্য আদেশ করা হচ্ছে যে, কোম্পানীর অধীনস্থ কলকাতার প্রধান প্রধান অফিসসমূহের কর্তারা, যাতে

কড়ির প্রচলন বেশী হয়, তার ব্যবস্থা করবেন। বক্সী-সাহেবকে লিখলেই তাঁরা প্রয়োজন মত "কৌড়ি" ইন্‌ডেণ্ট করতে পারবেন।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কড়ির মূল্য ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষ থেকে কমে যাচ্ছে ধাতুর মুদ্রার প্রচলন হওয়ার জন্ম। তবে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয়। মুদ্রা প্রস্তুতের পূর্বে কড়িই প্রধান ছিল। এবং মুদ্রা প্রস্তুতের পরেও আনি, দুয়ানি, পয়সা হওয়ার পূর্বে কড়ির আদর ম্লান হয়নি। গণ্ডায় কড়ির হিসাব থেকেই পরে পয়সা হিসাব তৈরী হয়, তার প্রমাণ আছে।

পয়সা চালু হবার পরেও যে পয়সা নিয়ে অনেক গণ্ডগোল হত; একটি উল্লেখে তা প্রতীয়মান হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই সংবাদপত্রে দেখা যায়—"বাজারে এক টাকার পয়সাতে এইক্ষণে ৬ পয়সা পর্যন্ত যাইতেছে। পোদ্দারেরা টাকাতে ঘসা পয়সা ১৬ গণ্ডা করিয়া দিতে চাহে, কিন্তু সেই পয়সা কোন কর্মের নহে। কল্য আমাদের একজন বেহারাকে আট আনার পয়সা দিতে হইয়াছিল। তাহাতে ঐ প্রকার ঘসা পয়সা দেওয়াতে সে কহিল যে ঘসা পয়সা কেহই লইবে না; এই আট গণ্ডা পয়সা এবং আট গণ্ডা লুড়ি তুল্য মূল্যই। কিন্তু, যখন তাহার সঙ্গে অনেক বচসা করা গেল, তখন কহিল, যে বরং নূতন পয়সার অর্ধেক আমাকে দিন।"

তখন যে ঘসা পয়সা ও নূতন পয়সা দুইই চালু হয়েছিল এই উল্লেখে তা প্রতীয়মান হয়।

ইংরেজের টাকা নির্মানের ইতিহাস অনেক দিনের। তারা তাদের প্রয়োজনে টাকা প্রস্তুতে তৎপর হয়েছিল। "১৭০৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর কলকাতা কৌশিলের এক মন্তব্যতে দেখা যায়"—বাঙ্গলার নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ কোম্পানীর মান্দ্রাজী টাকা মোগলের খাজনা বাবদ নিতে আপত্তি করেন। মান্দ্রাজী টাকার জন্ম কোম্পানীকে অনেক বাটা দিতে হয়—এজন্ম তাদের আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। তারা নবাবের কাছ থেকে মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত করবার অনুমতি পায়। যদি বাদশাহ তাঁর ফারমানে (১৭১৭ খৃষ্টাব্দে) বিনাব্যয়ে নবাবী টাঁকশাল থেকে মুদ্রা প্রস্তুত করবার আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ তা দেননি। কাশিমবাজারের কর্মচারীরা এ সম্বন্ধে চেষ্টা করে বিফল হয়েছে। এরপর নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ক্লাইভের সন্ধিপত্রের পঞ্চমধারা অনুসারে কোম্পানী মুর্শিদাবাদ টাঁকশালেই টাকা প্রস্তুত করবার সম্মতি পায়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের আমলে ইংরেজরা কলকাতায় নিজের টাঁকশালে
াকা প্রস্তুত করবার সম্মতি পায়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে যে নব-নির্মিত টাঁকশাল প্রস্তুত হয়, তা আজও বিদ্যমান।
বে সেখানে এখন আর টাকা তৈরী হয় না। রূপো পরিশোধনের জন্য
্যবহৃত হয়। এখন আলিপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরে কলকাতার টাঁকশাল। তবে
৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা যে টাঁকশাল—প্রসাদ তৈরী করে তা একটি দর্শনীয়
লে পরিগণিত হয়। তখনকার লোকে ষ্ট্রাণ্ড রোডের পথ দিয়ে যাবার
ময় ফিসফিসিয়ে পাশের প্রাসাদতুল্য বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে
লত—"হিজ্ ম্যাজেষ্টিস মিণ্ট।" এখানে টাকা তৈরী হয়।

ঠিক রাজপ্রাসাদের মত কারুকার্য করা বৃহৎ প্রাসাদ এই টাঁকশাল।
াইরের দৃশ্য দেখলে আথেন্স নগরীর মিনার্ভা দেবীর (Temple of
Minerva) মন্দির দৃশ্যের অনুকরণে নির্মিত। অসংখ্য স্তম্ভ শ্রেণী পরিবেষ্টিত
টাঁকশালের বৃহৎ প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। এই সুন্দর বাড়ীটি তৈরী
রেন মেজর ডবল্যু, এন, ফর্বস, আর, ই। এর সংলগ্ন আরও অনেকগুলি
্করিণী আছে। টাকা তৈরী করবার জন্যে যে সব ইঞ্জিন আছে তার জন্য
ই পুষ্করিণীগুলি। টাঁকশালের দুটি প্রধান বিভাগ। একটিতে তাম্রমুদ্রা
অপরটিতে Silver বা টাকা, সিকি, আধুলি, দুয়ানি তৈরী হত।

অবশ্য এখন আর এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু আলি-
রের টাঁকশালেই এখন বর্তমানে নয়া পয়সা ও কাগজের নোট তৈরী হয়।
াকশাল বলতে এখন বর্তমানের মানুষ আলিপুরের দিকেই দৃষ্টি সঞ্চালন
প্রাচীনকে নিয়ে আর কেউ বেশী মাথা ঘামায় না। সে এক পাশে
ড়ে থাকলে সবারই শান্তি।

কথাটা অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল। নতুন হাওড়ার পুল হওয়ার পূর্বে।
১০১ খৃষ্টাব্দের প্রস্তাব। সেই প্রস্তাব কার্যকরী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রবল হয়ে
। দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রচুর Coin দরকার হয়ে পড়ল। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে স্থান
র্ণয় করে নতুন টাঁকশাল তৈরীর ব্যবস্থা পাকা হল কিন্তু তাও বন্ধ হয়ে
প্রয়োজন মত কাজ লাহোরের ভগবানপুর থেকে সমাপ্ত হল। তারপর
১৪৬ খৃষ্টাব্দে আলিপুরে নতুন টাঁকশাল তৈরীর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হল। ষ্ট্রাণ্ড
। কলকাতা টাঁকশালের মেজর জে, এইচ, পারট্রিজ (J. H.
rtridge) টাঁকশাল সম্পূর্ণ করার ভার নিলেন। কিন্তু অন্যান্য অসুবিধার
টাঁকশাল সম্পূর্ণ হতে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ এসে পড়ল। অফিসিয়াল কাগজ-

পত্রাদি অনুযায়ী আলিপুরের 'ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট মিণ্ট' ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে হয়েছিল। তবে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ সুরু হতে আরও কিছু সময় ব্যয়িত হয়। আলিপুরের এই টাঁকশাল ২৬ একর বিস্তৃত জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত টাঁকশালটি তৈরীর প্লান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে এইচ. এ. এন. মেড (H. A. N. Medd) কর্তৃক কল্পিত (Souvenir, India Government Mint, Alipore).

তবে সেই পুরাতন টাঁকশাল না থাকলেও ডালহৌসি স্কোয়ারের পূর্বদিকে পেপার-কারেন্সি অফিস আছে। এই বাড়িটি ইটালিয়ান প্যাটার্নে নির্মিত। এটি গভর্ণমেণ্টের "Office of Issue and Exchange of Government Paper Currency" রূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে টাকা, নোট, গিনি থেকে সিকি, আধুলি প্রভৃতি বিনিময় কাজ হয়। আপনি এ অফিস চেনেন। এর সামনে অনেকবার এসেছেন। সামনে কটি লোক দাঁড়িয়ে থাকে। ছেঁড়া নোট বদলাতে হলে এদের সাহায্যই সুবিধা। এরা কিছু উপরি রেখে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়া নোট পালটে নতুন নোট দেবে। তারপর এরা ভেতর থেকে ছেঁড়া নোট পালটে নেবে।

এই বাড়িটি প্রথমে আগ্রা ও মাষ্টার ম্যান ব্যাঙ্ক কোম্পানী নিজের ব্যবহারের জন্য তৈরী করেছিল। তারপর কেম্পানী ফেল হতে গভর্ণমেণ্ট পেপার কারেন্সি অফিসের জন্য কিনে নেয়।

তবে নোটের প্রচলন কবে থেকে সুরু হল তার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৮।৮।১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি রিপোর্টে দেখা যায়— ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁর পরবর্তীকালে 'বেঙ্গল' ও 'জেনারেল' নামে দুটি ব্যাঙ্ক হয়েছিল। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছিল দুজন স্বাধীন ব্যবসায়ীর সম্পত্তি। জ্যাকব রাউডার ও এডওয়ার্ড হে। এঁদের নামেই ব্যাঙ্কের নোট চলত। এই বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি বিজ্ঞাপন থেকে পাওয়া যায়, উক্ত রাইডার ও হে সাহেব সাধারণে প্রচার করেন—"অতঃপর এই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, নোট প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করল।' স্বত্বাধিকারীদের স্বাক্ষরযুক্ত পঁচিশ টাকা, একশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও এক মোহরের নোট প্রচলিত হল। "জেনারেল ব্যাঙ্ক' এর পরে স্থাপিত হল। বেঙ্গল ব্যাঙ্ক যেমন দুজন ব্যক্তির সম্পত্তি, জেনারেল ব্যাঙ্ক সেরূপ ছিল না। এই ব্যাঙ্ক সাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রী করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কড়ির প্রচলন যে ভারতে অনেক কালের—সে সম্বন্ধে শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের

'বাঙ্গালীর ইতিহাস' থেকে কয়েক লাইন উল্লেখ করতে হয়ঃ—স্কন্দগুপ্তের আমলে গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রার ওজন ছিল ১৪২ মাষের কাছাকাছি এবং রৌপ্যমুদ্রার ওজন একটি রৌপ্য কার্যাপণের প্রায় সমান অর্থাৎ ৩৬ মাষ। পূর্ববর্তী সম্রাটদের কালে স্বর্ণমুদ্রা ওজনে আরও কম ছিল। গুপ্ত আমলে এই দুই মুদ্রাই যে বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল তার লিপি প্রমাণ প্রচুর; বিনিময় মুদ্রা হিসাবে এই মুদ্রাই ব্যবহৃত হত। রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। গুপ্ত আমলের অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে যখন স্ব স্ব প্রধান ছোট ছোট রাজবংশের স্বতন্ত্র আধিপত্য চলছে তখন রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন একেবারেই নেই অথচ স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অব্যাহত এবং এই স্বর্ণমুদ্রার যথার্থ মূল স্বর্ণমূল্য অনেক কম, অবনত (debased) স্বর্ণমুদ্রা, যদিও ওজনে তা কমে নি। বাংলাদেশের বহুস্থানে কিছু কিছু গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কালীঘাটে প্রায় ২০০ (গুপ্ত ?) সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তা অধিকাংশ গলিয়ে ফেলা হয়েছিল। গুপ্ত রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যশোহরের মহম্মদপুরে, বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় শশাঙ্ক, জয় (নাগ ?) সমাচার (দেব ?) এবং অন্যান্য রাজার নামাঙ্কিত এই ধরণের কিছু কিছু সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। রৌপ্যমুদ্রা একেবারে নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই, গুপ্ত আমলেও যখন স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা বহুল প্রচলিত তখনও মুদ্রার নিম্নতর মান কিন্তু কড়ি। চতুর্থ শতকে ফাহিয়ান বলেছেন, লোকে ক্রয়-বিক্রয়ে কড়িই ব্যবহার করত এবং নিম্নতম মান কড়ি একেবারে উনবিংশ শতক পর্যন্ত কোনোও দিনই ব্যবহারের বাইরে চলে যায় নি। চর্যাপদ (দশম একাদশ শতক)-গুলিতে দেখা যায়, কবাড়ি (কড়ি) এবং বোড়ির (বুড়ি) ব্যবহার।

মিন্‌হাজউদ্দীন তুরস্কাভিযানের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—অভিযাত্রী তুরস্কেরা বাংলাদেশে কোথাও রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন দেখতে পায় নি; সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় লোকে কড়ি দিয়ে করত; লক্ষণ সেনের নিম্নতম দান ছিল একলক্ষ কড়ি। ত্রয়োদশ শতকেও কড়ির প্রচলনের সাক্ষ্য অন্যত্র পাচ্ছি। পঞ্চদশ শতকে মা-হুয়ান একই সাক্ষ্য দিয়েছেন, মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকের সাক্ষ্য একই প্রকার। সেন আমলে কড়িই মনে হচ্ছে সর্বেসর্বা। নিম্নতম মান কড়ি সব সময়ই ছিল এবং ছোটখাট কেনাবেচায় ব্যবহার হত কিন্তু অর্থমান নির্ণীত হত সোনা বা রূপায়। সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী নানা অনুমানসিদ্ধ প্রমাণের সাহায্যে এই ধরণের ইঙ্গিতই করেছেন,

বলেছেন—"Payments were made in cowries and a certain number of them came to be equated to the silver coin, the Purana, thus liking up all exchange transactions ultimately to silver, just as at present, the silver coin is linked up to gold at a certain ratio. এমন কি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ বণিকেরাও দেখেছেন কলকাতা সহরে কর আদায় কড়ি দিয়ে। বাজারে অনেক ক্রয়-বিক্রয়ও কড়ির সাহায্যে হত।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে কড়ির প্রচলন বহু পূর্ব থেকে উনবিংশ শতক পর্যন্ত চালু ছিল। কড়ির পরিবর্তে যে এখন টাকার নিম্নতম বংশধররা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রচলন যদি কলকাতায় টাঁকশাল প্রচলনের পর থেকে ধরা যায় তাহলে অন্যায় হবে না।

(২৯শে অক্টোবর ১৯৬১—যুগান্তর)

কোন্ রাস্তা দিয়ে যাবেন ? পার্ক ষ্ট্রীটে ? চৌরঙ্গী রোড ধরে না লোয়ার সারকুলার রোড ক্রশ করে ? যদি চৌরঙ্গী রোড দিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে ঢোকেন তাহলে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যান। আর যদি লোয়ার সারকুলার রোড ক্রশ করে পার্ক স্ট্রীটের মুখে এসে দাঁড়ান তাহলে দুপাশে দেখতে পাবেন দুটি সিমেট্রী। সিমেট্রী নিশ্চয় চিনতে পারবেন ? কেননা সেখানে রয়েছে উঁচু উঁচু চুড়োওয়ালা অজস্র স্তম্ভের মেলা। মেলার পর মেলা। প্রতিটি স্তম্ভের নীচে শুয়ে আছেন অনেক গণ্যমান্য সাহেব-মেম। তাঁদের নাম, কীর্তি, জন্ম, মৃত্যু সবের ঠিকুজী লেখা আছে ঐ সব স্তম্ভের নোনাধরা পিঠে। আপনি হয়ত কখনও ঢোকেন নি এই সব কবরখানায়। ঢুকলে অবশ্য লাভবান হতেন। পেতেন কিছু ইতিহাস পড়ার আনন্দ। কয়েকজন সম্মানী ঐতিহাসিক লোকের খোঁজ।

যাই হ'ক, এই রাস্তা দিয়ে বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে যান। খানিকটা গেলে আপনিই চমকে দাঁড়িয়ে পড়বেন। আপনার চমকানো দেখে বিপরীত ফুটপাথে ফাঁড়ির টুলে বসা মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা সিপাইটা চমকাবে। কারণ তার তখন একটু ঢুলুনি এসেছিল। কিন্তু আপনার চোখ তখন সেদিকে না, সামনে বিরাট চারতলা বাড়িটির দিকে। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন ও সামনে দেওয়ালে আঁকা বড় বড় লেখাগুলি একবার উচ্চারণ করলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ। চোখের মণিদুটো চারদিকে আরও কবার ঘোরালেন। বিস্ময় জাগল বাড়িটির উচ্চতা দেখে নয়, কারণ এরকম বাড়ি কলকাতায় আজ কম নেই। বিস্ময় শুধু এর দেয়াল। এর দেয়াল-গুলির গায়ে যেন কোন গম্ভীর মুখের ছাপ। যেন দেওয়ালগুলি অধ্যাপক। কিন্তু আজকে যেমন এটা একটি বিখ্যাত শিক্ষা নিকেতন, অতীতে এই বাড়িটাই ছিল একটি বিখ্যাত থিয়েটার বাড়ি। নাম সাঁ-সুসী থিয়েটার।

আপনি হয়ত চমকাবেন। কারণ আপনি ত আর ইতিহাস হাতড়ান না তাই আপনার এই অবিশ্বাস। কিন্তু আজকে যে কলেজ বাড়িটি মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়িটিই সেদিনের সাঁ-সুশী থিয়েটার নয়। সেদিনের বিখ্যাত সাঁ-সুশী থিয়েটারের কোন স্মৃতিই নেই শুধু ক'টি সিঁড়ি ছাড়া। সেই সিঁড়িও আজকে তেমন ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। যা দেখলে আপনি ও আমি সহজে চিনতে পারব। শুধু ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে বলে তারা অক্ষয়। এই সিঁড়িগুলিকেই চিনে নিয়ে জেনে নিতে হবে সেদিনের সেই সাঁ-সুশী থিয়েটারের কথা। সাঁ-সুশী থিয়েটারকে আপনি ভুলে যান ক্ষতি নেই কিন্তু এই সিঁড়িগুলিকে স্মরণ করেই একটি মর্মন্তুদ ঘটনায় উপসংহারে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

১৮১৩-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চৌরঙ্গী ও থিয়েটার রোডের মিলনস্থলে চৌরঙ্গী নামে একটি থিয়েটার ছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে সে থিয়েটার। এবং তখনকার দিনে কলকাতার গণ্যমান্য লোকেরা এই চৌরঙ্গী থিয়েটার নিয়েই মেতে উঠেছিলেন। সেখানে অভিনয় করতেন নামজাদা সব অভিনেতা ও ও অভিনেত্রী। অভিনেত্রীরা অভিনয়ের বিনিময়ে বেতন নিতেন আর অভিনেতারা শখের অভিনয় করতেন অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বেগার খাটতেন। তারপর এই থিয়েটারটির জীবনের কাল ঘনিয়ে এল। সেদিন ছিল ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে'র সন্ধ্যা। হঠাৎ আগুন লেগে- এই থিয়েটারের যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়ে গেল। এত ক্ষতি হল যে, এই ক্ষতি পূরণ করে পুণরায় আবার নতুন করে থিয়েটার চালান তখনকার চৌরঙ্গী থিয়েটারের ক্ষমতায় হয়ে উঠল না। সেই থেকে চৌরঙ্গী থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েকজন বেকার হয়ে পড়ল। মিসেস লীচ নামে একজন নামজাদা অভিনেত্রী এই থিয়েটারে বহু বছর কাজ করেছিলেন এবং তখনকার দিনে মিসেস লীচের নাম আজকের একজন স্বনামধন্যা মঞ্চ অভিনেত্রীর চেয়ে অনেক গুণে বেশী ছিল। তখন দর্শকেরা একজন অভিনেত্রীর অভিনয়-কৃতিত্বে খুশী হয়ে তাকেই বহু উপাধি ও সম্মানদানে ভূষিত করতেন। সতের বছর বয়স থেকে মিসেস লীচ একাদিক্রমে অভিনয়শিল্পে যুক্ত ছিলেন। এই থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি বেকার হয়ে পড়লেন। এবং কোন কাজকর্ম না পাওয়াতে তাঁকে বাধ্য হয়ে ইংলণ্ডে ফিরতে হল।

ইংলিশম্যান পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্টকেলার সাহেব এ দেশে আবার তাঁকে ডাকলেন, তিনিও আবার ইংলণ্ড ছেড়ে ভারতগামী জাহাজে চড়ে বসলেন। স্টকেলার সাহেব মিসেস লীচের সহায়তায় বহু গণ্যমান্য লোকের কাছে গিয়ে কিছু চাঁদার ব্যবস্থা করলেন। চাঁদার টাকায়

তখনকার দিনে কলকাতার বহু অংশই সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত হয়েছিল, সুতরাং একটি থিয়েটার বাড়ি চাঁদার টাকায় তৈরী হবে এ আর নতুন কথা কি? গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড দিলেন এক হাজার টাকা। তারপর বহু ইংরেজ ও বাঙালীর একান্ত সহযোগিতায় বহু চাঁদা সংগৃহীত হল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই থিয়েটার বাড়ি সাঁ-সুশী থিয়েটার নামে মাথা তুলে দাঁড়াল আর প্রথম অভিনয়-রাত্রি ৮ই মার্চ ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন উইলিয়ম কেরের নাট্যরূপায়িত "দি ওয়াইফ" নাটকটি অভিনয় হয়েছিল। মিসেস লীচ ম্যারিয়েনার ভূমিকায় প্রথম রাত্রেই অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন। গভর্ণর জেনারেল অকল্যাণ্ড সাহেব লীচের অভিনয় দেখে ভীষণ খুশী হয়ে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সাঁ-সুশী থিয়েটার জমে উঠল। ছড়িয়ে পড়ল তার নাম। মিসেস লীচের নাম। স্টকেলার সাহেবের সঙ্গে এসে যোগদান করলেন, নামজাদা সিভিলিয়ান মিঃ এইচ ডবলু টরেন সাহেব ও তাঁর জামাতা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জেমস্ হিউম। ভাল ভাল কয়েকটি শিল্পীর জন্য তাঁরা পরামর্শ করে ইংলণ্ডে চিঠি লিখলেন। ইংলণ্ড থেকে দলে দলে ভাল ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এসে পৌঁছতে লাগল। সাঁ-সুশী থিয়েটার তখন উন্নতির চরম শিখরে।

এই উন্নতির চরম মুহূর্তেই ঘটল সেই বিস্ময়কর ঘটনা। সেটা ছিল ১৮ই নভেম্বরের সন্ধ্যা। থিয়েটার গৃহের মধ্যে কৌতূহলী দর্শকের অধীর প্রতীক্ষা। পর্দা সরে যেতে মিসেস লীচ উইংসের পাশ দিয়ে এসে মঞ্চে অবতীর্ণা হলেন। হঠাৎ মিসেস লীচ চিৎকার করে উঠলেন। চোখে তার মৃত্যু নীল আতঙ্ক। তেলের কুপীতে তাঁর কাপড়ে আগুন ধরে গেছে। কিন্তু দর্শকরা ভাবল, এও বুঝি এক অভিনয়-খেলা। হয়ত জাদুবিদ্যা। নতুন শিখেছে। দর্শক চিত্ত মাত করবার জন্যে এমন দুঃসাহসিক খেলায় মেতে উঠেছে। তাই তারা মিসেস লীচের কাপড়ে আগুন দেখে মুখ টিপে হাসতে লাগল। কিন্তু প্রাণভয়ে মিসেস লীচের পরিত্রাহি চিৎকার শুনে আর পাগলের মত ছোটাছুটি দেখে দর্শক-আসন নড়ে উঠল। তারপর পালাবার জন্যে ঠেলা-ঠেলি। মুহূর্তের মধ্যে সারা থিয়েটার-গৃহ শূন্য হয়ে গেল। চলে গেল অগণিত দর্শকবৃন্দ। শুধু যেতে পারলেন না একটি অসহায়া মেয়ে। তাঁর সুন্দর দেহটি যখন পুড়ে নিঃশেষ হয়ে এসেছে একটি ঠিকাদার এসে তাঁকে উদ্ধার করল। মিসেস লীচ তখন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছেন। তারপর আর মাত্র দুদিন বেঁচে ছিলেন।

সাঁ-সুশী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাত্রীর মৃত্যুর পর আবার নতুন করে থিয়েটার জমানর চেষ্টা হল, কিন্তু আর জমল না। কেউ ভুলতে পারল না মিসেস লীচের আর্ত চিৎকার। স্টকেলার প্রভৃতি কর্তারা থিয়েটারটি ভাড়া দিলেন কোন এক ফরাসী কোম্পানীকে। কিন্তু তাঁরাও চালাতে পারলেন না। মিসেস লীচের আত্মা যেন দগ্ধ দেহের জ্বালায় সেই থিয়েটার গৃহের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিখ্যাত থিয়েটার শেষ পর্যন্ত উঠে গেল। তারপর আস্তে আস্তে থিয়েটার-গৃহের সবকিছুই ভেঙে চূর্ণ হয়ে গেল শুধু কটি সিঁড়ি ছাড়া। প্রাগৈতিহাসিক ক'টি সিঁড়ি সেই সিঁড়িগুলিই আজ প্রমাণ করছে সাঁ-সুশী থিয়েটারের অস্তিত্ব। আর সেই বিদেশী মেয়েটির জীবনের একটি মর্মন্তুদ ঘটনার ইতিবৃত্ত।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

আপনি কি দেখেছেন—আজকের জনকলরব মুখরিত শিয়ালদহ অঞ্চল কখনও জনবিরল হয়েছে? রাত্রির কথাই ধরুন। রাত্রে সারাদিনের কর্মক্লান্ত নগরী ঘুমোয়। পথদিয়ে লোক যায়, তবে কখনও কখনও একেবারে যায়ও না। গেলে পরে দেখা যায় রাত্রে ষ্টেশনে এসে গাড়ি থেমেছে কিংবা ভোর রাত্রে গাড়ি ছাড়বে সেইজন্যে লোকের আনাগোনা। কিন্তু তবুও হলফ করে বলা যায় যে শিয়ালদহ কখনও জনবিরল হয় না। এ অঞ্চলে সদা-সর্বদাই লোক। তার ওপর ইদানীংকালের দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে গৃহহারারা এসে সংসার পেতেছেন। স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আর একটি ইতিহাসের সূচনা হয়েছে এই অঞ্চলে। সুতরাং লোকের কমতি নেই এ সহরের মহাকেন্দ্র বিন্দুতে। যেখানে যত লোক সেখানে তত মত সেখানে তত ইতিহাস। তাই বছরে বছরে এখানে ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এটি হয়েছে একটি ঐতিহাসিক মহামিলন কেন্দ্র।

সহর কলকাতার কেন্দ্র বিন্দু এই শিয়ালদহ। সারা শহরের লোক এই জায়গাটিতে দিনে রাত্রে একবার না এলে যেন হাঁফ ছাড়তে পারে না। এখানে আছে সব, মানুষের প্রয়োজনীয় যে কোন বস্তু। সামনে বৃহৎ রেল ষ্টেশন। দিনরাত ধরে অগণ্য লোক আসছে যাচ্ছে। তাদের পদধূলিতে ষ্টেশনের পিচকালো পিচের পথ রঞ্জিত হচ্ছে। আসছে আরও দেশ বিদেশের বিবিধ দ্রব্য সম্ভার। মাছ তরিতরকারী এসে পড়ছে সামনে নফরবাবুর বাজারে। সে সব জিনিস মিনিটে মিনিটে কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি সেই সব জিনিষ-পত্তর ক্রয় করে প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তা মেটাচ্ছে।

আজকে যেমন এই অঞ্চলটি বিখ্যাত তেমনি অতীতে একবার চলে যান। চলে যান প্রাচীন কলকাতার ইতিহাস হাঁতড়াতে হাঁতড়াতে। আপজনের ম্যাপের একটি জায়গায় গিয়ে থমকে দাঁড়ান। কি, কিছু দেখতে পাচ্ছেন? প্রাচীন কলকাতার ইতিহাসেও এ অঞ্চলটি ছিল উল্লেখযোগ্য। ছিল একটি

বটবৃক্ষ ঐ শিয়ালদহ ষ্টেশনের কোন এক জায়গায়। তারই ছায়া-শীতল তলায় বসে তখনকার দিনে বণিকরা তামাক খেতেন। কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নকও এখানে বসে তামাক খেয়েছিলেন একথা বেশ কয়েকখানি বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের ঐতিহাসিক গ্রন্থে লেখা আছে।

এবার বইগুলি বন্ধ করে জায়গাটিকে ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন সেই বটবৃক্ষের স্মৃতি খুঁজতে। কারণ শিয়ালদহ অঞ্চলে কখনও কোন বটবৃক্ষ ছিল একথা বিশ্বাসই হবে না।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের ঘেরাও অঞ্চলে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজতে থাকুন সেই বটবৃক্ষের কোন শিকড়। কিংবা এক টুকরো তামাকের ছাই, যা বণিকরা সেদিন বসে বসে মৌজ করে খেতেন। কিন্তু কোথায়? কোথায় সে সব! আপনার চোখ যখন অবিশ্বাসে কালো হয়ে উঠেছে এমন সময় পুলিশ এসে পিঠে লাঠির গোঁজা দেবে—ক্যায়া হ্যায় ইদার। কুছ নেহি বাবা। পালান। পালালেন এইজন্যে যে যদি চোর-পকেটমার বলে হাজতে পুরে দেয় তাহলে পুরনো কলকাতায় এঁটো-পাতকুড়োন খোঁজা এইখানেই শেষ হয়ে যাবে।

এ পাশে ট্রাম লাইনের মোড়ে দাঁড়িয়ে আর একবার ষ্টেশনের মাথার ঘড়ি থেকে চোখ দুটো বরাবর নামিয়ে দিন। চোখের ওপর জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করুন—সেই বৃহৎ বটবৃক্ষটি। যা মাথা উঁচু করে অতীতে এখানে নিজের অস্তিত্ব প্রকাশ করেছিল; কিন্তু না, কিছুতেই মনে করতে পারবেন না। আর মনে করবেন কি? কিছু কি আছে চিহ্ন যে সেই চিহ্নটির গোড়া ধরে একটা কল্পনার ভাব আনবেন? আমাদের সহর কলকাতা চিরকাল পুরোন খোলস ছেড়ে নতুন খোলস নিয়েছে কিন্তু পুরোনর কোন চিহ্নই দেহে ধরে রাখে নি। শুধু ঐতিহাসিকরা দয়া করে তাঁদের মহামূল্যবান পুস্তকে এই সব স্মৃতি ধারণ করে আমাদের জ্ঞান পিপাসা আরও বাড়িয়েছেন।

অথচ একদিন এই বিখ্যাত বটবৃক্ষের ছায়া-শীতল তলায় বসে বণিকরা বিশ্রাম করতেন, তামাকু সেবন করতেন আর আড্ডা দিতেন। শুনলে আশ্চর্য লাগে তখনকার দিনেও আড্ডার দল ছিল। আড্ডা যে একটা মহামিলনের মহৌষধ এ কথা আমরা অনেকদিন পরে বুঝতে পেরেছি।

আজকাল আড্ডা দিলে চরিত্র নষ্ট হয় না বরং দৃঢ় হয়। মানুষ সব বয়সে সর্বকালে আড্ডা দিতে ভালবাসে। সারাদিনের পরিশ্রম তারপর একটু মৌজ করে আড্ডা। এক কাপ চা, দুটো চারমিনার। আর কটি ইয়ার বন্ধু সে এক বয়েসের হোক বা যুবক বৃদ্ধর মিলন হোক কিংবা ছেলে মেয়েতে।

আড্ডা আড্ডাই। তার কোন রকমফের নেই। নির্মল বা দূষিত হোক তবু তার মূল্য আছে। আজকের যুগে আড্ডাতেই পৃথিবীর কাজ চলেছে। যুদ্ধ সুরু হচ্ছে, যুদ্ধ থামছে। বন্ধুত্বের সূত্রপাত হচ্ছে শত্রুর বৃদ্ধি হচ্ছে। ইদানীং-কালে আড্ডাতেই অনেক বড় বড় কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে। তাই আমাদের বাপ-পিতামহের সাবধানবাণীর আজকাল আর কোন মূল্য নেই।

তাই আশ্চর্য লাগে তখনকার দিনে বড় বড় মহারথীরা এই বটবৃক্ষের তলায় বসে আড্ডা দিতেন। উটের পিঠে ব্যবসায়ী মালপত্তর রেখে তাদের এই বটবৃক্ষের পাশে বেঁধে রাখতেন। তারপর বিশ্রাম করে আড্ডা সুখে তৃপ্ত হয়ে আবার যে যার পথে চলে যেতেন।

এই একটি প্রধান মহামিলন ক্ষেত্র কবে যে লোপ পেল তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। কোন তারিখ কোন খ্রীষ্টাব্দ কোথাও লেখা নেই। এবং কে এই রমণীয় স্থানটি এমন করে উচ্ছেদ করলেন তারও কোন নাম ইতিহাসে লেখা নেই।

তবে এ কথা হলফ করে বলা যায় যে এখানে সেই বটবৃক্ষটি ছিল এবং এখানে একটি আড্ডা ঘরও ছিল তা না হলে বৈঠকখানা নাম হল কেন? শুধু বৈঠকখানা বাজারের সীমানাটীকেই বৈঠকখানা বলা হত না। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আপজনের ম্যাপ অনুসারে লালবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অঞ্চলটিকে বৈঠকখানা রোড বলা হত। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের হিকির গেজেটেও পাওয়া যায় এই বৃক্ষটি ও তার বিপরীত দিকে ইংরেজদের আর একটি বেড-এণ্ড-চিজ বাঙ্গলো আড্ডা ঘর ছিল। এবং এই আড্ডা ঘরটি সেকালে ইংরেজদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ছিল এবং বিখ্যাত একটি টাভারণ নামে সর্ব-সাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বাঙ্গলোটি নিলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। তখনকার দিনের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল বলে এ তত্ত্বটি সহজে পাওয়া গিয়েছে।

তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমাদের বাড়ির বৈঠকখানার মত এই অঞ্চলটি একদিন ইংরেজদের পুরো বৈঠকখানা ছিল। ইংরেজরা চৌরঙ্গীতে বাস করত আর বৈঠকখানায় আড্ডা দিত। সেইজন্যই এখন বৈঠকখানার সমগ্র অঞ্চলটি এমন কি শিয়ালদহর চারদিকে আড্ডা দেওয়ার মত লোকের মিছিল।

দিনরাত কেবল লোক কেবল কলরব। আড্ডা দেওয়া ছাড়া যেন কারুর আর কোন কাজ নেই। দেশবিদেশ থেকে লোক আসছে ট্রেনে করে এই পথ দিয়ে যাচ্ছে আড্ডা দিতে দিতে। ব্যাপারীরা মাছ তরিতরকারী নিয়ে

এরই পাশে বাজারে বসে যাচ্ছে বিক্রি করতে—আর তার সঙ্গে ভিন্ন দেশের লোকের সঙ্গে হাসি-তামাসার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। তারপর সারা সহর কলিকাতার সব লোকের আসা যাওয়া। সবই সেই প্রাচীন কলকাতার আড্ডা ঘরের স্মৃতি রক্ষার্থে। সেই বটবৃক্ষের অমর স্মৃতিকে রক্ষা করবার জন্য এই তোড়জোড়। ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মানুষের এই পরিত্রাহি চেষ্টা।

কিন্তু যদি প্রাচীন কলিকাতার এই স্মৃতি চিহ্নগুলি ঐতিহাসিকদের পুস্তকের মত কেউ চিহ্নিত করে রাখতো? কিন্তু কে জানতো একদিন এর এত মূল্য হবে? আজ মানুষ খুঁজবে তাদের আবার? তাদের বাঁচাবার জন্যে মানুষের চলবে অপরিসীম পরিশ্রম।

(জনসেবক)

আমার চিরকালের বিস্ময় এই রাইটার্স বিল্ডিং। ছোটবেলায় দেখেছি, এখনও দেখছি, বোধহয় বৃদ্ধ হয়েও দেখব। তবু কী বিস্ময়ের আমার শেষ হবে? জানি না এর উত্তর কী?

জব চার্নকের কলকাতার আজ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক পুরনো জিনিস ধ্বসে পড়েছে, আবার তার স্থান অধিকার করে নতুনের আবির্ভাব হয়েছে। এই লালদীঘির চারপাশেই তো প্রত্যহ দেখছি, বছরের পর বছর ধরে শুধু পরিবর্তনের স্রোত। শুধু পরিবর্তন। কত নতুন নতুন বাড়ী উঠে কত নতুন চেকনাইয়ের সৃষ্টি করছে। চেষ্টা করছে পুরনোকে দাবিয়ে নতুনরা তার বিজয়নিশান ওড়াবে। হয়ত উড়িয়েছে তাদের বিজয়-নিশান। কিন্তু যে পুরনো ঐতিহ্য আজ বিস্ময়ের মত পথিকের চোখের দৃষ্টিতে—তাকে ম্লান করার সাধ্য কী নতুনের আছে? নতুনের আবির্ভাব সাময়িকভাবে চোখকে ধাঁধাতে পারে কিন্তু তার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী।

এসব রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সম্বন্ধে বলতে হল এইজন্যে যে, আপনি এরই আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন। দেখলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার তারতম্য। অথচ এর মত কায়দায় নতুন বানানো কোন বাড়ী কী তামাম এই কলকাতার শহরে দেখেছেন! সেইজন্যেই বলতে হয় এর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। যে ঐতিহ্যকে ম্লান করতে আরো ঐতিহ্যময় কোন সৃষ্টির প্রয়োজন। অথচ তা আজও দেখা যায়নি। অবশ্য দেখা গেছে কী, কতকগুলি আধুনিক ডিজাইনের পায়রার খোপের মত আট-দশতলা বাড়ী! সে যাক্‌গে—হয়ত এরই একদিন মূল্য হবে। এই পায়রার খোপই আগামী বংশধরদের চোখে বিস্ময় জ্বালবে।

আজকে রাইটার্স বিল্ডিং বলতে চিনবেন সরকারী অফিস। এবং যিনি আজকের এই বাড়ীটিকে চেনেন না তিনি লজ্জার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চুপি চুপি গিয়ে লালদীঘির জলের ধারে দাঁড়াবেন। কিন্তু কোন্‌টা সেই বাড়ী? এ প্রশ্ন সহজেই আসবে এইজন্য যে লালদীঘির চতুর্দিকেই বড় বড়

বাড়ী মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেল পোষ্টাফিসটা সহজেই চেনা যায় কারণ তার মাথায় একটা ঘড়ি আছে। এপাশে টেলিফোন-ভবন আর ওপাশে স্টিফেন হাউস। তাদেরও মাথায় লেখা আছে তাদের নামের সাইনবোর্ড। আর একপাশে যে চুড়োওয়ালা প্রাগৈতিহাসিক ডিজাইনের লালবাড়ী—এটাই কি তবে সেই বাড়ী? আপনি জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পাবেন এইজন্যে যে উত্তরদাতা আপনার মুখের দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবেন। তারপর আপনি নিজেই অনুমান করে নেবেন এইজন্যে যে, এ বাড়ী থেকে যেরকম লোক যাওয়া আসা করছে এটি সেই সরকারী অফিস বাড়ী না হয়ে যায় না।

তবে এটাই কী এককালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রাইটারদের থাকবার জায়গা ছিল? উত্তর আসবে, কিন্তু এ বাড়ীটি নয়। এখানেই আর একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আর সে বাড়ী রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৮০ সালের। তাহলে রাইটারদের থাকবার জন্যে এই অঞ্চলে বাড়ী তৈরী করার প্রয়োজন হল কেন? তখন কোম্পানীর কাজে 'রাইটার' বলে এক শ্রেণীর ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত হতেন। এঁরা প্রথমে কোম্পানীর দপ্তরে লেখাপড়ার কাজ করতেন পরে কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মালে—নানা স্থানের ব্যবসা-কেন্দ্রে বা কুঠীতে প্রধান কর্মচারী-রূপে নিযুক্ত হতেন। তখনকার কালে রাইটার সিভিলিয়ানদের বেতন খুব কম ছিল। রাইটারগণ তাঁদের প্রাপ্য-বেতনের অতিরিক্ত খরচপত্তর করে নিঃস্ব হয়ে পড়তেন এবং সেই সমস্ত খরচপত্তরের ব্যয় কোম্পানীর তহবিলের স্কন্ধে চাপাতেন। কোম্পানীর বিলাতের কর্তৃপক্ষরা বড়ই বিরক্ত হতেন। সময়ে সময়ে তাঁরা এই সমস্ত কর্মচারীদের শায়েস্তা করবার জন্যে, মিতব্যয়ী রাখবার জন্যে বিলাত থেকে কলকাতায় কড়া মেজাজে চিঠি লিখতেন। ১৭৫৪ সালে বিলাতের 'কোর্ট অব ডাইরেকার'দের লিখিত একখানি পত্র থেকে আমরা দেখতে পাই তাঁরা কলকাতার গবর্ণর সাহেবকে লিখছেন—"আমাদের নির্ধারিত আদেশ এই, আপনি রাইটারদিগকে বুঝাইয়া দিবেন, যতদিন তাঁহারা রাইটাররূপে সামান্য বেতনে কার্য করিবেন, ততদিন কেহ পাল্‌কী বা গাড়ী ব্যবহার করিতে পারিবেন না। করিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে।"

পলাশী যুদ্ধের পর বিলাতের কর্তারা এই সমস্ত সিভিলিয়ান রাইটারদের উপর সদয় হয়ে অনেক ব্যবস্থায় পরিবর্তন করেন। বিলাতের কর্তাদের সেই

ব্যবস্থা থেকে আমরা জানতে পারি—রাইটারগণ শীত ও বর্ষাকালে যাতায়াতের জন্যে কেবলমাত্র পাল্‌কী ব্যবহার করতে পেতেন। কারণ তাঁদের মধ্যে অনেকে দূরতম স্থানে বাস করতেন। কিন্তু কলকাতার মধ্যে কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কার্যালয় ও বাড়ীগুলি নির্মাণ হয়ে গেলে তাঁরা সেই বাড়ীতেই থাকতে শুরু করেন। তখন আর পাল্‌কী প্রভৃতির জন্যে অতিরিক্ত খরচের আবশ্যক হত না।

এই রাইটারদের মধ্যে অনেকেই পরিণত বয়স্ক যুবক ছিল। ক্লাসের দুষ্ট ছেলেদের শাসনে রাখতে গেলে অতি কঠোর প্রকৃতির মাষ্টারমশায় যেরূপ এক একসময়ে অসমর্থ হয়ে পড়েন—সেকালে সিভিলিয়ান অথবা রাইটারদের শাসনে রাখতে কোম্পানী-কর্তৃপক্ষগণকেও অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। এই সময়ে রাইটারদের শায়েস্তা করবার জন্যে একটি "তদারকী-সভা" আহূত হয়। সেই সভার বিচারে, রাইটারদের মিতব্যয়ী করবার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির প্রচলন হয়। প্রথম—অবিবাহিত কর্মচারিগণের পক্ষে দুইজন চাকর ও একজন রাধুনীই যথেষ্ট। এই দুইজন চাকরের একজন গৃহস্থালীর ভার নেবে। রাইটার যখন কোম্পানীর কার্য উপলক্ষে কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাবেন তখন দ্বিতীয় চাকর তাঁর সঙ্গে যাবে ও অন্য ব্যক্তি তাঁর কলকাতার সম্পত্তি রক্ষা করবে। কিম্বা তিনি পীড়িত হলে একজন তাঁর গৃহস্থালী দেখবে, অপর ব্যক্তি রুগীর সেবা করবে। দ্বিতীয়—কোন রাইটারই গবর্নরের অনুমতি ব্যতীত ঘোড়া ব্যবহার করতে পারবেন না। নিজের খরচে বা দুই তিনজন মিলে বাগান-বাগিচা করতে পারবেন না। তৃতীয়—তাঁরা এমন কোনরূপ পরিচ্ছদ পরতে পারবেন না, যাতে বিলাসিতা প্রকাশ পায়। ভদ্রলোকোচিত সাদাসিদে পরিচ্ছদই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট।

এত করেও কিন্তু সেকালের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির রাইটারদের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নারী-প্রীতি এত বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁদের কথা আজ ভাবলেও ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়।

সেই রাইটারদের থাকবার জন্যেই এই রাইটার্স বিল্ডিং নামের বাড়ী তৈরি হয়েছিল। রাইটারদের আবাসগৃহের সঙ্গে এখানে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছিল। লর্ড ওয়েলেস্‌লী রাইটাররা প্রথমে এদেশে এলে তাঁদের এদেশ সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্যে পণ্ডিত ও মুন্সী রেখে ভারতীয় ভাষা শেখবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রবর্তন করেছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮০০ মাঝামাঝি কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়।

এই কলেজ থেকেই একদিন বাংলা গদ্যসাহিত্যের জন্ম-ইতিহাস শুরু। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে কলেজের বিভিন্ন বিভাগের জন্যে পণ্ডিত, মৌলবী প্রভৃতির নিয়োগ মঞ্জুর হয়। বাংলা বিভাগের কর্তা হন শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরী। তাঁর অধীনে যে-সকল পণ্ডিত নিযুক্ত হন, তাঁদের নামের তালিকা: প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, বেতন ২০০'০০; দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, বেতন ১০০'০০; সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, বেতন ৪০'০০। আনন্দ চন্দ্র, ৪০'০০; রাজীবলোচন (মুখোপাধ্যায়) ৪০'০০; কাশীনাথ (মুখোপাধ্যায়) ৪০'০০; পদ্মলোচন চূড়ামণি, ৪০'০০; রামরাম বসু, ৪০'০০। এই সকল পণ্ডিতের অনেকেই কেরীর সুপারিশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কেরীর উৎসাহে কলেজের পণ্ডিতগণ পাঠ্যপুস্তক রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন। ফলে আমরা যে-সকল পুস্তক লাভ করেছি তাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমালা—১৮০১, ১৮০২ সালে; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন, প্রবোধচন্দ্রিকা—১৮০২, ১৮৩৩; গোলকনাথ শর্মার হিতোপদেশ—১৮০২; তারিণীচরণ মিত্র ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট—১৮০৩; চণ্ডীচরণ মুন্সীর তোতা ইতিহাস—১৮০৫; রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় সৎ চরিত্রং—১৮০৫; রামকিশোর তর্কচূড়ামণির হিতোপদেশ—১৮০৮; মোহনপ্রসাদ ঠাকুরের ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ—১৮১০, ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান—১৮১১; হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ-পরীক্ষা—১৮১৫; কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থকৌমুদী ১৮২১।

১৮৩৬ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় একটি বিধি নির্ধারিত হওয়ায় সিভিলিয়ানরা তাঁদের ইচ্ছামত অন্যত্র থাকতে আরম্ভ করেন। সেই থেকে এই রাইটার্স বিল্ডিংটি সাধারণের অফিসেও গুদোমরূপে ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। ১৮২১ সালের পর একে সংস্কৃত করে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এখানে অনেকদিন ছিল তারপর সরকারী অফিসে পরিণত হয়।

এই বাড়ীটির ভিতরের অবস্থা বর্ণনা করতে গেলে ইংরিজী উদ্ধৃতি করতে হয়;

"The Writers' Buildings were now ornamented with three pediments in front, supported on colounades which

formed handsome verandahs. The centre one adorned the front of four suites of apartments, appropriated to the use of the college. The lower floor contained the lecture rooms, and the second was fitted up for the reception of the college library, which occupied four rooms, each 30 by 20 feet. On the upper floor there was a large hall, 68 feet by 30, intended for the examination room. Each of the pediments at the extremities of the building, fronted two suites of apartments for the accommodation of the secretary and one of the professors. The intermediate buildings, eleven in number, were for the accommodation of twenty-two students".

প্রবাদ আছে—"কলিকাতার মাটি পোড়াইয়া লাল করিয়া ইংরাজ কর্মচারিগণের জন্যে লালদীঘির উত্তরে এই রাইটার্স বিল্ডিং নামে বৃহৎ লালবাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল।"

এই নিবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

Roebuch : Annale of the college of Fort William ও
W. H. Capy : Good old days of Honorable John Company, voll II.

ফ্যাশানেবল কলকাতা। নিত্যনতুন ফ্যাশানের হুজুগে কলকাতার মেয়েপুরুষেরা সর্বদাই ব্যস্ত। আজ যে জামাকাপড়ের কাটিং দেখছেন কাল দেখবেন তার রকমফের। বিশেষ করে শহরের মেয়েরা। মেয়েদের জামা-কাপড়ের নিত্যনতুন অতি-আধুনিক ডিজাইন দেখে আপনার চোখ সর্বদা চমকে যাবে। মেয়েদের একচিল্‌তে কাপড়ের ব্লাউজ দেখুন, সে ব্লাউজের হাতা কখনও কবজি পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে আবার তা কনুইয়ের ওপর উঠতে উঠতে কাঁধের প্রান্তসীমায় উঠে পড়ছে। তারপর রয়েছে কাপড়ের নানারকম ফ্যাসানেবল অতি-আধুনিক ডিজাইন। বিশেষ বাঙ্গালী মেয়েদের অতি আধুনিক ফ্যাশানেবল চেহারা সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির একটি রকমফের। আর তার প্রধান ক্ষেত্র এই কলকাতা।

এ শহরের মেয়েরা, যেমন নিত্যনতুন ফ্যাশনের হুজুগে সর্বদা ব্যস্ত তেমনি ছেলেদের ক্ষেত্রেও সেই একই ধারা চলে আসছে। অবশ্য তারা মেয়েদের মত অত নয় তবে একেবারে কমও যায় না। বোম্বাই থেকে ছুটে এল মানুষ আঁকা মেমসাহেবের নৃত্যরত মার্কা ছিটের বুশ-শার্ট। তার নাম হল 'আওয়ারা জামা'। ইংরেজ অনেকদিন চলে গেছে কিন্তু যাবার সময় তাদের অতি অভ্যস্ত হাতে-পরা পরনের প্যাণ্টটি উপহারস্বরূপ দিয়ে গেছে। এখন এদেশের ছেলেরা কাপড় পরতে পারে না, কারণ কোমর থেকে খসে পড়ে যায়। তাই ইংরেজের পরিত্যক্ত সেই প্যাণ্ট পরিধান করে—সর্বভারতীয় পোশাক, ইণ্টারন্যাশনাল ড্রেস বলে জয়ধ্বনি করে। এ পোশাক পরলে কাজ করবার অনেক সুবিধে (কিন্তু কাজ যে তারা কি করে—জগদীশ্বরই জানেন!) সেই প্যাণ্টও শেষপর্যন্ত আওয়ারার কল্যাণে হাঁটু পর্যন্ত গোটান হল। মেমসাহেব আঁকা উড়োজাহাজ-মার্কা বুশ-শার্ট পরে প্যাণ্ট গুটিয়ে হাঁটুতে তুলে এল্‌ভি প্রিস্‌লের আবিষ্কৃত "রক এন্‌ রোলের" নাচ নেচে এ শহরের যুবকেরা বর্তমানের ফ্যাশনকে অভিবাদন জানাল।

কিন্তু এই ফ্যাশনের হুজুগ আজকের নয়। এ শহরও যেমন খুব বেশী

দিনের নয়, খুব তাড়াতাড়ি তার উন্নতি হয়েছে তেমনি এ দেশে ফ্যাশনও খুব দ্রুত এগিয়ে গেছে। বনজঙ্গলঘেরা গণ্ডগ্রামকে সভ্যসমাজের গোচরিভূত করেছিলেন ইংরেজ রাইটার ওয়াশিপফুল জব চার্ণক। সে তারিখটি খুব বেশীদিনের নয়। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ এমন কি আর বেশীদিনের? একটি শহরের জন্ম-ইতিহাসের তারিখ এত অল্পদিনের হলে মনে হয় শহরের পূর্ণরূপ সৃষ্টি হতে এখনও দেরী আছে। কিন্তু এ শহর সে অপেক্ষা রাখেনি। তবু অল্পকালের মধ্যেই দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজ পৃথিবীর একটি সভ্যনগরী হয়ে উঠেছে। তাই এই দ্রুত পরিবর্তনটি আজ মানুষের বিভিন্ন ধরন-ধারণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। ইংরেজরা এদেশে আসবার পরে এ শহরের ওপরে তখনকার দিনে এক ধরনের বড়মানুষদের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল তাঁদের নাম—'বাবু'। তাঁরা দিনে ঘুড়ি ও পায়রা উড়িয়ে সন্ধেবেলা বাবু সেজে ইয়ারবক্‌সী নিয়ে জুড়িগাড়ী করে যেতেন বেশ্যালয়ে। পড়ে থাকত তাঁদের ঘরে সুন্দরী বৌয়েরা। বাবুরা ফুর্তি করে ফিরতেন সকালে। তখনকার দিনে এই ধরনের ফ্যাশানের চালু হয়েছিল এই শহরে। যে সব বড়মানুষেরা এই ধরনের আচরণ না করতেন তখনকার সমাজে তাঁরা প্রতিপত্তিশালী ধনী বলে স্বীকৃতি পেতেন না। এমনকি ঘরের বৌয়েরা স্বামীর প্রতিপত্তি সম্বধে সন্দেহ প্রকাশ করতেন। সেইজন্য এই ধরনের মারাত্মক ফ্যাশান উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতাকে চেয়ে ফেলেছিল। [শ্রীকালীপ্রশন্ন সিংহ রচিত হুতোম প্যাচার নক্‌শা দ্রষ্টব্য।]

তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব। ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স আলবার্ট মাথার চুলে বাঁকা সিঁথি কাটতেন। তাঁর দেখাদেখি শহরের লোকেরা বাঁকা সিঁথি কাটতে শুরু করে এবং তার নাম দিল আলবার্ট ফ্যাশন। এখনও এদেশে সেই 'আলবার্ট কাটা' নিশ্চিহ্ন হয়নি। এখনও কেউ কেউ বাঁকা সিঁথি কেটে সামনের দিকে চুলকে ফাঁপিয়ে প্রিন্স আলবার্টের সম্মান রক্ষা করে। কিন্তু আলবার্ট ফ্যাশান লুপ্ত না হলেও তখনকার দিনের ওয়েল্‌সী ফ্যাশান লুপ্ত হয়ে গেছে। লুপ্ত হয়ে গেছে বলেই এখন শুনলে অবাক লাগে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মস্তকের মধ্যভাগ থেকে ঘাড় পর্যন্ত স্ত্রীলোকের সিঁথির মত চুল ফিরোতেন। এ দেশের লোকেরা যখন প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে অনুকরণ করল তখন তার নাম হল "ওয়েল্‌সী ফ্যাশান"।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত নিশাচর রচিত (শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

'সমাজ কুচিত্র' পুস্তকে ওয়েল্‌সী ফ্যাশানের ধারাবাহিক বিবরণী আছে। তখনকার দিনে এই ফ্যাশান চালু হওয়ার জন্য মানুষে মানুষে কি রকম রঙ্গ-তামাশা করে এই ফ্যাশানকে ব্যঙ্গ করত তারই একটু নমুনা দেওয়া প্রয়োজন। "আলবার্ট ফ্যাশান পুনরাম্ভ হলো। অনেকে নূতন ফ্যাশানের ক্রীতদাস হয়ে নীলামের বস্ত্রে এক একটি চায়না-কোট তৈয়ের করিয়ে নিলেন। আলপাকারা নবযৌবন ধারণ করে অনেকের গাত্র পবিত্র কল্লে। কেউ কেউ আলবার্ট ফ্যাশানের জায়গায় ওয়েল্‌সী ফ্যাশানকে ভর্ত্তি করেছেন। পাড়া-গেঁয়ে বারুইয়েরা তাহাদের পর্ণক্ষেত্রে (বরোজে) যেরূপ আল দেয়, ইহা ঠিক সেইরূপ।

একদিন বেলা ১০টার সময় একজন গন্ধবেণে বাবু ওয়েল্‌সী ফ্যাশানে চুল ফিরিয়ে চায়না-কোট গায় ও ষ্টকিং পায়ে দিয়ে তালতলার বড় রাস্তা দিয়ে ধর্ম্মতলার দিকে যাচ্ছিলেন, নেউগীপুকুর লেনের ঠিক উত্তরে সোনা-রুপোর পোদ্দারের দোকানের ঠিক মাথার উপর একজন ভদ্রলোক রাস্তাপানে চেয়ে বসেছিলেন, নূতন রকম বাবু অথবা জানোয়ারটিকে দেখে, তাঁর বড় ইচ্ছা হলো যে, একবার তঁা'কে কাছে এনে ভাল করে দেখেন। এই কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্যে বাবুটিকে সম্বোধন করে বললেন, "মহাশয়! আপনারে যেন চেন চেন কচ্চি, একবার এইখানে এসে তামাক খেলে ভাল হয়।" বাবু এই কথা শুনে, তাঁর মুখপানে তাকিয়ে "ব্লডী ফুল আবার চেন চেন করে কেন?" মনে মনে এই কথা বলে, ঘাড় নেড়ে চেঁচিয়ে বললেন, "আই হ্যাভ মেনি বিজনেস টু পারফরম, গোইঙ টু দি অফিস, মিষ্টার গ্যাম্পার ইজ ওয়েটিং ফর মি, আই অ্যাম দি হেড্‌ ম্যান অফ হিজ ডিপার্টমেণ্ট, দ্যাট ইজ অ্যান আর্টিকেল্‌ড ক্লার্ক, সারভিং ফাইফ ইয়ার্স, গেটিং এইট্রি রূপীজ পার মেন্সেম, আই শ্যাল সুন পাস্‌ অ্যান্‌ একজামিনেশন; অ্যাণ্ড টরণ টু এ ব্যারিষ্টার। কাণ্ট ওয়েট বাবু! আই হ্যাভ সো মেনি বিজনেস।"* ভদ্রলোক এই সকল কথা শুনে মনে কল্লেন, এ ব্যক্তি ইহার অন্নপ্রাশন অবধি জীবন বৃত্তান্ত আওড়ায় নাকি? যা হোক, উহারে আনতে হয়েচে। এই ভাবে পুনরায় বললেন, "বাবু! আপনি ও সকল আত্মবিবরণ বল্‌ছেন কেন? আমি ও

---

* আমাকে অনেক কাজ নির্বাহ কর্ত্তে হবে। আপিসে যাচ্ছি। গ্যাম্পার সাহেব আমার মুখ চেয়ে আছেন। আমি তাঁর আপিসের কর্ত্তাবাবু। ৫ বৎসর কাজ কচ্চি। মাসে ৮০ টাকা মাইনে পাই। শীঘ্র পরীক্ষা দিয়ে ব্যারিস্টার হবো! দেরী কর্ত্তে পারি না বাবু! আমার এত কাজ!

সকল শুনতে চাচ্চি না, একটি কথা শুনে শীঘ্র বিদায় করে দিচ্চি ; একবার অনুগ্রহ করুন।" বেণে বাবু বল্লেন, "বেটা উল্লুক কিছুতেই ছাড়চে না ; করি কি? যেতে হলো।" এই ভেবে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লেন। ভদ্রলোক ওদিকে মনে মনে হেসে, কিঞ্চিৎ নারকেল তৈলে আধ বাণ্ডিল চীনের সিঁদুর গুলে সাজিয়ে রাখলেন। বণিক্ যাইবামাত্র "আসতে আজ্ঞা হোক, তামাক দে রে।" বলেই ওয়েল্‌সী সিঁড়ি পরিপূর্ণ করে তেল· সিঁদুর লেপে দিলেন! চমৎকার খোল্‌তা বেরুলো! চাকরেরা ওদিকে জোড়া শাঁক বাজিয়ে হুলুই দিলে! বোধ হলো যেন, সাক্ষাৎ মা কুলকুণ্ডলিনী চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী তালতলার বারাণ্ডায় বিরাজমানা হলেন! সভাবাজারের একজন বাবুও ঐরূপে এক ব্যক্তিকে ভগবতী সাজিয়ে দিয়েছিলেন! আজকাল যেরূপ অনুকরণের ধুম, তাহাতে এইরূপ করাই ভাল।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে 'সমাজ কুচিত্র'-এ বর্ণিত সে ওয়েল্‌সী ফ্যাশানের চলন আজকে আর নেই। সেদিনের সেই রঙ্গ-তামাশার কল্যাণে এমনি উদ্ভট একটি ফ্যাশান যে বাধ্য হয়ে মুখ লুকিয়েছে বর্তমানে তাই রক্ষে—না হলে সেদিনের সেই ফ্যাশানটি যদি আজকের অতি-আধুনিক শহরে বলবৎ থাকত তাহলে পাঠক একবার চিন্তা করুন সেই দৃশ্যটি। নাপিত আর দেশে থাকত না, হেয়ার সেলুনগুলি উঠে গিয়ে উকুন-মারার দোকান বসে যেত এবং ওয়েল্‌সী ফ্যাশানের বাবুরা বসে যেত সেইসব দোকানে তাদের লম্বাচুলের মাথা থেকে উকুন বেছে বের করবার জন্যে। মেয়েদের কল্যাণে এদেশে অজস্র সেণ্টেড হেয়ার অয়েল কোম্পানী দু'পয়সা কমিয়ে নিচ্ছে, ওয়েল্‌সী ফ্যাশান চালু থাকলে এ শহরে হেয়ার অয়েলের ব্যবসাই বেশী মুনাফার ব্যবসা বলে সর্বজনস্বীকৃতি পেত।

যাই হোক ; ফ্যাশনেবল কলকাতা যে আজকে সেই অদ্ভুত ফ্যাশানের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে, অতি-আধুনিক শহরের এই বর্তমান সময়ে বসে ভাবতে বেশ রোমাঞ্চ লাগে।

সাহিত্যের খবর, চৈত্র ১৩৬৭

একটু অবাক লাগে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আবার আলোচনা কেন? নিজেদের কেউ মরলে দাহ করবার জন্যে ওখানে তো যেতেই হয়। কাটাতে হয় কয়েক ঘণ্টা, তারপর ফিরে এলে আর কিছু মনে থাকে না। মনে থাকে না শবদাহের স্থানটিকে, কিন্তু মনে থাকে পরিজনের কান্নার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই মানুষটিকে। মানুষটিকে কতবার দেখেছি, কতবার কথা বলেছি, তারই একটি হিসাব মনের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়। তারপর একদিন সব স্তব্ধ।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থানটিও যেমন মনে থাকে না, মনে থাকে না সেখানে আমি কোনদিন গিয়েছিলুম, কিম্বা কোনদিন যাবার প্রয়োজন হবে।

সেদিন তাই একটু অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ নিজের কোন প্রিয়জন-বিয়োগ না হতেই চলে এসেছি। পাড়ায় একটি শবদাহ দল ছিল, সেই দলটি সমস্ত পাড়ার মানুষগুলিকে দাহ করবার জন্যে তৈরি। তাদের সঙ্গেই কেমন করে জানি, বেমক্কা চলে এসেছি। তবে কি মরবার আগেই চিতায় ওঠবার পরিকল্পনা মাথার মধ্যে জেগেছে? কিন্তু সে চিন্তার চেয়ে নিমতলার ঘাটে দাঁড়িয়েই তিনটি চিতার অগ্নিলেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে মনে জাগলো—আমিও একদিন এই চিতায় শুয়ে ঐ বীভৎস আগুনে দগ্ধ হব? আমার এই বুদ্ধিতে গজগজে মাথাটি কে এক অর্বাচীন ডোম চ্যালা কাঠের বাড়ি দিয়ে মেরে মেরে ভেঙে দেবে। আর আমি আমার একান্ত নিকট-পরিজনদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখবো। তারা হয়ত আমার বিহনে রোদন করবে কিন্তু তাদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে জ্বালা অনুভব করবো।

শুনেছি মানুষ মরে গেলে সব অপরাধের মুক্তি পায়। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, মানুষের দেহের শেষচিহ্ন লীন হবার সময় এই স্থানটিতে এলে। এই নিমতলা ঘাটেরই কথা বলি। এ ঘাটে কত মনীষীর সমাধি দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীতে যিনি অমর, বিশ্বের কবি রবীন্দ্রনাথ এখানেই শুয়ে আছেন। কেওড়াতলা শ্মশানের পাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন

নিশ্চয়, মাথা উঁচু করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সমাধি-স্তম্ভ তাঁর স্মৃতি সগর্বে ঘোষণা করছে। এই সব স্থানেই আছে হারিয়ে যাওয়া মানুষের উপস্থিতি, এরই মাটিতে আছে কত মনীষীর চিহ্ন।

কখনও শ্মশানের চুল্লি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকে না। মানুষের মৃত্যুরও কখনও শেষ নেই। তাই নিমতলা ঘাটের অফিসের সর্বদা কর্মচাঞ্চল্য। অথচ এই স্থানটি নির্মাণের পূর্বে বহু আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮২৬ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৮২৮ সালের ২২শে মার্চ পর্যন্ত সংবাদপত্র তার প্রমাণ। সব কিছু নির্মাণের পূর্বে একটি আন্দোলন। সে ভাল বা মন্দ হোক্। তাই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত স্থানের জন্য আন্দোলন হয়েছিল, এতে আর অবাক হবার কিছু নেই। উদ্ধৃতটুকু লক্ষ্য করুন :—

"……শবদাহ বিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর ২ বাঙ্গলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্বিষয়ে ক্লেশের বর্ণনা বা তন্নিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই। কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে যে মরে তাহার পরিবার বা যে ঐ শব লইয়া দাহ করিতে যায়, তাহারা তৎ-কালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিস্মৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসী হিন্দুলোক সকলেই এক ২ বার দায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো যাঁহারা বর্ষাকালে মরেন তাঁহারদিগের পরিবারেরা বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন। এ শহরে হিন্দু লোক দুই লক্ষ হইতে পারে। প্রতি মাসে আন্দাজ তিনশত লোক মরিয়া থাকে। কাশি মিত্রের ঘাটে গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন ২ সময়ে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউঠা হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ মরিয়া থাকে। শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪০ হাত চওড়া ১৬ হাত। জোয়ার হইলে ইহারো অল্পতা হয় গঙ্গার জল বৃদ্ধি হইতেছে কিছুদিনের মধ্যে ইহাও জলমগ্ন হইবে ভাটা না পড়িলে দাহকর্ম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয়া আসিয়া জমা হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২।১৮ ঘড়ী বসিয়া থাকিবে ভাটা পড়িলে উন্নত বড় ধনি মরারা ঐ অল্প স্থানে রাজা হইবেন অর্থাৎ তাঁহারা অগ্রেই স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগারা অপেক্ষা করিবেক।"

এর পর ১৮২৭ সালের ২৭শে জানুয়ারী ও ১৮২৮ সালের ২২শে মার্চ তারিখের দুটি সংবাদ লক্ষ্য করবার মত। "আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে পূর্বোক্ত বিষয়ে আমারদিগের অনির্বচনীয় যে ক্লেশ

আছে তাহা নিবারণার্থে কোন কোন মহানুভব মহাশয়েরদিগের চেষ্টা দ্বারা উপযুক্ত উপায় হওনোদ্যোগ হইয়াছে শুনিলাম যে নিমতলা হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত তিনটা শবদাহের নিমিত্তে স্থান হইবেক তাহা সম্পন্নার্থে এই শহরের ভাগ্যবান লোকেরদিগের মধ্যে একটা চান্দা হইয়াছে।......"

"অবগত হওয়া গেল যে মোং নিমতলার ঘাটে যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান নির্মাণ হইতেছিল তাহা এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ গত সোমবার অবধি ঐ স্থানে শবের সৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহাতে অনেকের পরিশ্রম দূর হইয়াছে।"—তিং নাং

তাহলে দেখা যাচ্ছে নিমতলা ঘাটের শ্মশানক্ষেত্রের স্থান নির্দিষ্ট হয় ১৮২৮ সাল থেকে। অবশ্য এর বহু পূর্ব থেকে কাশী মিত্রের ঘাটের উৎপত্তি। ঢাকার নায়েব রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয় এই কাশী মিত্র। ১৭৭৪ সাল থেকে কাশী মিত্রের নামে এই শ্মশানক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই শ্মশানক্ষেত্রের রেজিষ্টার হইতে দেখা যায়, ১৯১৩—১৯ সালের মধ্যে ৪,৭১৬টি শবদাহ করা হয়েছে। অবশ্য ঐ একই সালে নিমতলা ঘাটে ১০,৩৪৪টি শবদাহ হয়েছিল। নিমতলা ঘাট শ্মশানক্ষেত্র সেদিনের চেয়ে বর্তমানে আরো প্রসার লাভ করেছে। তবে তার জন্ম থেকে বহু সংস্কারের পর বর্তমানের এই রূপ। ১৮৫৭ সালে তার নতুন ব্যবস্থা লক্ষ্য করুন। কর্পোরেশনের কমিশনাররা ৬১৮০ টাকা ব্যয় করে এই ঘাটের আমূল পরিবর্তন করেন। বাবু রামনারায়ণ দত্ত তার মধ্যে ২৫০০ টাকা কমিশনারদের হাতে অর্পণ করেন।

এই অঞ্চলের তিনটি স্থানকে ঘিরে এই শ্মশানক্ষেত্রটি প্রস্তুত হয়েছিল। তিনটি পার্শ্বে পনেরো ফুটের সমান উঁচু দেয়াল দিয়ে গঙ্গার দিকের অংশটি খোলা রাখা হয়েছিল। প্রতিটি স্থানের অংশ ছিল দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ১৬০ × ৯০।

আরও বারবার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল, তার মধ্যে ১৮৬৮ সালে ডোমেদের থাকবার জন্যে কতকগুলি নতুন ঘর হয় ও গঙ্গার দিকে নতুন দেয়াল দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১৮৭৫ সালে পোর্ট কমিশনাররা জানান যে, এই শ্মশানঘাট থাকার জন্যে তাঁদের কাজকর্মের বড় অসুবিধা হচ্ছে। যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। সেইজন্যে এক বছরের মধ্যে পোর্ট কমিশনারদের চেষ্টাতে একটি সম্পূর্ণ নতুন শ্মশানঘাট প্রস্তুত হয় এবং পূর্বের ঘাট সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে যায়। এই নতুন ঘাটটি প্রস্তুত করতে কনট্রাক দেওয়া হয়েছিল, মেসার্স ম্যাকিনতোষ (Messers Mackintosh), বার্ণ এণ্ড কোং

(Burn & Co.)কে। ব্যয়ভার পড়েছিল মোট ৩০,০০০ হাজার টাকা। তারমধ্যে পোর্ট কমিশনাররা ২৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। এই ঘাট এরপর বহুবার সংস্কারের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার ব্যয় পড়েছিল ১৭০০০ টাকা। বাৎসরিক হিসাব দাখিল করলে দাঁড়ায়—১৮৯১—৯২ সালে ৪৫৮২ টাকা; ১৮৯২—৯৩ সালে ১৮৯৪ টাকা; ১৮৯৪—৯৫ সালে ১৭০০ টাকা; ১৯০৫—৬ সালে ৫১৪৪ টাকা; ১৯১২—১৩ সালে ২৩৭৯ টাকা; ১৯১৩—১৪ সালে ২০৭৯ টাকা।

আজকের এই শ্মশানক্ষেত্রটির কোন অভাব নেই। এক বিঘা জায়গার ওপর একটি বৃহৎ শ্মশানক্ষেত্র কিন্তু সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ হয়ে গেছে শুধু যে সব মহাত্মারা এখানে দেহরক্ষা করেছেন তাঁদের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে। এখন এখানে এলে বহু মনীষীর বিলীয়মান স্মৃতি মাটির স্পর্শের মধ্যে আবার জেগে ওঠে।

শ্মশানক্ষেত্র কখনও নিঃসঙ্গ থাকে না তাই নিমতলার ঘাটেও লোকের শেষ নেই। সারাদিন থেকে সারারাত্রি। চোখে যদি কখনও ঝিমুনি আসে ওমনি আচমকা ঘুম ভেঙে যাবে 'বল বরি হরিবোল' স্বর শুনে। এ স্বরের মধ্যে কি আছে জানি না—কিন্তু প্রাণের অন্তঃস্থলে আচমকা কিসের যেন সজাগ চমকানির ধাক্কা লাগে। এখানে একটি অফিস আছে, সে অফিস কখনও বন্ধ হয় না। সেখানে সর্বদা কাজ। কাজ আর কাজ। অবিরাম গতি তার। সেখানে সর্বদা ভিড় আছে শবদাহযাত্রীদের। তাদের কোমরে গামছা হাতে প্যাকাটির বাণ্ডিল চোখেমুখে মৃতের জন্যে কাতরতা। এই দৃশ্য এখানে সর্বত্র। তবে পাড়ার শবদাহদলেরা এলে একটু অন্য কোলাহল। কিংবা কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা দেহত্যাগ করেছে। খুব একটা শোকের ছায়া কারো মুখে চোখে ফুটে ওঠে না। তবে মাঝে মাঝে নারীকণ্ঠের চীৎকারে স্তব্ধক্ষেত্র যেন আচমকা কেঁপে ওঠে। আর দেখা যায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী। একসঙ্গে অনেকগুলি চুল্লি জ্বলে উঠলে মনে হয় বুঝি এ শ্মশানক্ষেত্র ধ্বংসের মুখে পড়ে শেষ হবার মুহূর্তে এসে পৌঁছেচে।

মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটি হয় মৃতদেহের জামাকাপড় ও তার খাটের শয্যাবস্ত্র নিয়ে। ডোমেদেরই প্রাপ্য, ডোমেরাই নেয়। কলহ যেটা হয় সেটা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে বড় বেশী সীমা ছাড়িয়ে যায়।

বিচিত্র মনে হয় সবকিছু। মানুষের মাংস পোড়া গন্ধ। সে গন্ধে মাঝে মাঝে বমনোদ্বেগ হয়। আর কান্না। বিচিত্র স্বরে ও সুরে বিচিত্র কথার

যোজনায় বহু রমণীর কণ্ঠের শব্দ শোনা যায়। কার অল্পদিন বিবাহ হয়েছে, সে ভাগ্যহীনা হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোরে কাঁদতে পারছে না—লজ্জায়। এখনও তার লজ্জা দেখে আশ্চর্যই মনে হয়। আশ্চর্য মনে হয় যে রমণীটি স্বামীবিহনে পরিত্রাহি চীৎকার জুড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে বিচিত্র ছন্দসুরে কবিতার কলকাকলি—'ওগো আমার কি হলো গো' ?

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ এখানে পুড়েছে, পুড়ছে আরও পুড়বে। হয়ত একদিন দেখা যাবে সংখ্যাতীত হয়ে গেছে। কর্পো-রেশনের রেজিস্টার-বইতে আর জায়গা নেই আর খাতা বানানো যাচ্ছে না। যাচ্ছে না রাখা আর কোন হিসাব।......যদি কখনও এমন দিন আসে। অবশ্য এসব উদ্ভট চিন্তা। এমনও তো হতে পারে—যে একদিন শ্মশানক্ষেত্র সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে সঙ্গী অভাবে গালে হাত দিয়ে কাঁদতে বসবে।

প্রতিদিন যত শবদাহ করা হয় তার সমস্ত ছাই আগে নৌকায় করে গঙ্গায় দেওয়া হত। দেওয়া হতো এইজন্যে যে, গঙ্গারই প্রাপ্য হিন্দুর ধার্মিক দেহের অবশিষ্ট। আজ অবশ্য অন্য ব্যবস্থা; আজ অনেক কিছুরই কড়াকড়ি, ডেথ সার্টিফিকেট না হলে শবদাহ স্থগিত—আর যদি মনে হয় সহজ উপায়ে মৃত্যু হয়নি, তাহলে আপনার প্রাণ নিয়ে টানাটানি। পুলিশ সর্বদা খোঁজ নিয়ে চলেছে শ্মশানক্ষেত্রে।

সেই পাড়ার শবদাহদলের সঙ্গে বেরিয়ে এসে ট্রামরাস্তার মোড়ে দাঁড়ালুম। অনেক রাত, ট্রাম নেই পথে, লাইন আছে শুয়ে। নিঝুম নিস্তব্ধ প্রান্তর। অন্ধকারকে কিছু হালকা করবার জন্যে মাথার ওপর কটি বৈদ্যুতিক আলোর চেষ্টার অন্ত নেই। আমি তখন ভাবছিলুম, আচ্ছা, এই শ্মশানক্ষেত্রে এলে মানসিক অবস্থা এত দ্রবীভূত হয় কেন? মনে হয় যেন আমি এই জীবনের রঙ্গমঞ্চে এতদিন ধরে বাঁচবার জন্যে—অধিকারের জন্যে যে চেষ্টা করেছি, সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ।

একটি মাতাল হঠাৎ আমার চিন্তাজাল ছিন্ন করে দিয়ে চীৎকার করে বলল—'সব তুচ্ছ, সব তুচ্ছ। সবারই গতি ঐ একই পথ। একই মঞ্চে আরোহণ—শ্মশান। খি-খি করে মাতালটা হাসতে হাসতে টলায়মান দেহ নিয়ে চলে গেল। আমি অভিভূতের মত শুধু সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ পাড়ার শবদাহদল তাড়া দিল—'কি হে যাবে না? না-কি এখান-কার মায়া কাটাতে মন ছটফট করছে?

ট্রাম-বাস-মোটরের মিছিল চলে পথ দিয়ে, আর লোক চলে সেই পথের দুপাশের ধার ঘেঁসে। লোক চলে পথের দুপাশের বড় বড় বাড়ীর কোল দিয়ে, অতি সাবধানে, সন্তর্পণে। যদি এই সীমানা একবার ফস্‌কায় তাহলে সরকারের বপুষ্মান ডবলডেকার সর্বদাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে, আপনাকে পায়ের তলায় পিষে ফেলতে তার এতটুকু কষ্ট হবে না। এমন তো কত কাহিনী প্রত্যহ খবরের কাগজের পাতার বুকে ঝুলছে। ঝুলছে আরও অনেক কাহিনী। আপনি আরও কত ঘটনা প্রত্যহ লক্ষ্য করেন। এও নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, মাঝে মাঝে পথচারীদের জন্যে এই নির্দিষ্ট পথচলা স্থানটুকুতে কোন ডবল-ডেকার বা কোন মোটরগাড়ী পড়েছে। তখন নিশ্চয় আপনি দারুনভাবে বিরক্ত হয়ে এইসব গাড়ীর চালকদের কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিকৃতমস্তিষ্ক মদ্যপায়ী বলে সম্ভাষণ করেছেন।

কিন্তু কেন করেছেন? আপনার অধিকারের ওপর অপরের হস্তক্ষেপেই কি আপনার বিরক্তির কারণ নয়? হয়ত না, হয়ত ঠিক। কিন্তু আপনার এই পায়ে-চলা পথটুকু অন্য যে কোন অজুহাতেই হস্তান্তরিত হলে আপনি আর কারুরই খাতির রাখবেন না, সে আপনার চলার ভঙ্গিতেই প্রতীয়মান। তাই আপনার ঐ ফুটপাতটুকুর সম্বন্ধে আপনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

ট্রাম থেকে নেমে ছুটে গিয়ে ফুটপাতে ওঠেন। কেন একবার রাস্তার মাঝখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিন না? ছোটবেলা থেকেই মাতাপিতার নিষেধ বাক্য শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন—ওরে খোকা, কখনও ফুটপাথ ছাড়া পথে নামিস না? এখন আপনি খোকা'র পিতৃদেব হয়েও সে কথা ভোলেননি। এখন আপনি কচি-কিশোর নাগরিকদের ঐ নিষেধবাক্য শুনিয়ে সাবধান করে দেন।

অথচ ঐ ফুটপাতের কোথাও কোন অংশ করপোরেশনের জলকলের লোকেরা এসে খুড়লে, তারা যাবার সময় ভাল করে পূর্বাবস্থায় বজায় না রেখে গেলে আপনি চলতে চলতে খোঁড়া জায়গার মুখে এসে খুঁড়িয়ে যান।

ওমনি আপনার মুখের ফুলঝুরি আকাশ স্পর্শ করে। করপোরেশনের চোদ্দ হুগুণে আটাশ চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করতে করতে আপনি বাড়ী ফেরেন। ফিরে গৃহিণীর সামনেও আর এক দফা আস্ফালন করেন। ফুটপাতের কোন অংশ একবার ভাঙাচোরা হলে হয়, তারপরেই যে ভুরি ভুরি আবেদন আসল জায়গায় গিয়ে পৌছবে, তার অনেক নজীর আছে। এ তো গেল ফুটপাতের আর এক অবস্থা।

আপনি নিশ্চয় চিৎপুরের দিকে গেছেন! এ শহরে থেকে উত্তরের ঐ পথে যাননি এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেখেছেন নিশ্চয় সেখানের পথগুলির অবস্থা? ফুটপাত আছে সেখানে। কিন্তু একেবারে টানা, লম্বা, বরাবর, দীর্ঘ ফুটপাত নেই। ওখানে আপনাকে পথ দিয়েই চলতে হয়। মাঝে মাঝে যেটুকু ফুটপাত জেগে আছে সেটুকু দিয়ে আপনার একার দুপা দিয়ে দাঁড়ানো যেতে পারে, কিন্তু অন্য আর কারুর নয়। তাই ওসব ঝামেলায় না থেকে পথকেই পথচলার সম্বল করে আপনি চলেন। তাতে ক্ষতি কিছু হয় না। তবে ফুটপাতের গুরুত্ব এখানে ম্লান।

ফুটপাতের গুরুত্ব আছে চৌরঙ্গীতে। তামাম কলকাতার যে অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে শহরের যা কিছু রূপ, সেই চৌরঙ্গীতে আছে ফুটপাত। একপাশে ফুটপাত। হোক্ একপাশে। কিন্তু পথ-চলার সময় আরামের ঘুম আসে। প্রাণে আসে হিল্লোল। চোখে স্বপ্ন। মাণ্ডোলীনের মৃদুমূর্ছনা শুনতে শুনতে যখন আপনার কণ্ঠে গান এসে আকুলি-বিকুলি করে, তখন কি আপনি এই ফুটপাতেই কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন না?

গ্রাণ্ড, ফিরপো, ব্রিষ্টল, মেট্রোর সামনের ফুটপাতে একটু অন্য জগতের নেশা। সেই নেশা কি আপনার চোখেও লাগে না? তখন কি মনে হয় না—হ্যাৎ ত্যেরি বাসা। এইত আমার স্বপ্নের পাওয়া, স্বপ্নেরই বাসা।

এবার আসতে হল এই ফুটপাতের প্রথম আবিষ্কার দিনটিতে। আজ এই ফুটপাত আছে বলে মাঝে মাঝে ফুটপাতের গুরুত্ব বুঝি। যেখানে থাকে না, সেখানে ফুটপাতের প্রয়োজন আছে বলেই গুরুত্ব আরোপ করি। স্লোগান ছড়াই। নতুন পথ ও স্থান গড়ে ওঠার সময় ফুটপাত অবশ্যই থাকবে বলে প্ল্যান তৈরী হয় করপোরেশনকে ফুটপাতের জন্য আলাদা করে জমি ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু যখন প্রথম ফুটপাত এল? মানে জন্ম হল। কেন তার জন্ম? আজ যে উপকারে ফুটপাতের প্রয়োজন, সেদিন এই উপকারের জন্য ফুটপাত লাগবে—এ কথা কার মাথায় প্রথম এসেছিল? মিউমিসিপ্যালিটির

ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক পথের ওপর থানা বুজিয়ে ড্রেন তৈরীর সময় এই ফুটপাতের কথা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন। পথের দুপাশে ড্রেনের ওপর দিয়ে লোক চলাচলের পথ করে দিলে লোকেরও উপকার হবে, আর ড্রেন সুরক্ষিত রাখারও সুব্যবস্থা হবে।

একথা যখন বাইরে প্রচারিত হল, তখন সাধারণ মানুষদের মাঝে ক্লার্কের প্রস্তাব খুব একটা শোরগোল তুলল। পথের পাশে বাড়ীর নীচের দোকান-দারেরাও ক্লার্কের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে অভিনন্দন জানাল। খরিদ্দার-দের পথে দাঁড়িয়ে জিনিস কেনা যে বিপদজনক ; যে কোন সময় গাড়ী এসে তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারে—সেখানে ফুটপাত যে ব্যবসায়ীদের পরমবন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ক্লার্কের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে ব্যবসায়ীরা ফুটপাতের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠল। শেষে প্রশ্ন এল, খরচের কথা। এই বাড়তি খরচের জন্য দায়ী থাকবে কে ?

তখন গ্যাসলাইট পথে ঝোলানর ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ী থেকে কুড়ি ফুট দূরে গ্যাসলাইট বসাতে হবে। অতএব এই কুড়ি ফুট স্থানটিকে নিয়ে লোক-চলাচলের জন্য ফুটপাত হোক। প্রথম হল চৌরঙ্গীতে। পরীক্ষার জন্যে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই সূত্রে কমিশনারদেরও সমর্থন করপোরেশনের ঠিকুজিতে দেখা যায়। (By Section 9 of Act XIV of 1856.)

সর্বপ্রথম চৌরঙ্গীর সুরম্য পথের ওপর ফুটপাতের সৃষ্টি শুধু এক্সপেরিমেণ্টের জন্য। কথাটা আজকের আধুনিক কলকাতার অধিবাসীদের ভাববার বিষয়। আজকের এই ফুটপাতকে ভুলে গিয়ে সেদিনের সেই ফুটপাতহীন পথের কথা ভাবুন। আর তারপর ভাবুন হঠাৎ ফুটপাত তৈরীর জন্য আলকাতরা, সিমেণ্ট, টালিপাথর, কাঁকর, সুরকী প্রভৃতি দ্রব্যাদি এসে পড়ল। কয়েকদিনের মধ্যে পথের দুপাশে ঢালাও ফুটপাত বিছানো হল। তার ওপর দিয়ে পথবাসীরা চলতে শুরু করল। সেদিন এমনি করেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। সেদিন ঐ পরীক্ষামূলক ফুটপাত করতে চার হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। তারপর ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা যথাক্রমে ৬০০০ টাকা, ১৬,৭১১ টাকা ও ১৩,৩১৮ টাকা শুধু ফুটপাতের জন্য ব্যয় হয়েছিল। শহরের চারিদিকে যত ড্রেন তৈরী হতে শুরু হয়, ফুটপাতও তত বেশী শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ মাইল বিস্তৃত পথ ফুটপাতের উপস্থিতিতে ধন্য হয়েছে।

এর পর শহরের চারিদিকে বহু উন্নতি হতে থাকে। পথের দুপাশের বাড়ীগুলিও নতুনরূপে আবার সেজেগুজে দাঁড়ায়। রাস্তাও সাজে। রাস্তার পাশে অনেক অলিগলিরও সৃষ্টি হয়। সেইজন্যে ফুটপাতেরও আরও উন্নতি হতে থাকে। আগে বাড়ী-ভাঙ্গার রাবিশ, খোয়া-ইঁট প্রভৃতি পিটে ফুটপাতের সাময়িক শোভা বাড়ান হত। ১৯০২ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফুটপাতকে পাকা করার তোড়জোড় সম্পূর্ণ হয়, এবং দেখা যায় ১৯১৩ থেকে ১৯১৪র মধ্যে ৬½ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখুন—শহরের এই ফুটপাত। আপনার পায়ের চাপে তার বক্ষ দমিত হলেও আবার তাকে সংস্কার করে পূর্বাবস্থায় ফেরানো হচ্ছে।

আরও একটি কথা এই ফুটপাত প্রসঙ্গে এসে গেল—দেশ বিভাগের পর থেকে উদ্বাস্তদের স্বপ্ন এই ফুটপাত। এতটুকু বাসা যদি উদ্বাস্ত কখনও ভাবে—সে ঐ ফুটপাতের একটি কোণ। যেন সেখানে যুগ যুগ বাস করে বংশবৃদ্ধি করে সংসারের বাহাদুরী দেখিয়ে একদিন চোখ বুজতে পারে। না থাক্ ফুটপাতের মাথায় কোন আচ্ছাদন। রাত্রের নির্মল আকাশ যখন নক্ষত্রের বর্ণাঢ্যে মুগ্ধ হয়ে ওঠে তখন যে সমস্ত দিনের অনাহারও ভুলিয়ে দেয় ঐ আকাশপানে চেয়ে। তাই, কি দরকার মাথার ওপর আচ্ছাদন ?

আর মনে পড়ে প্রত্যহ রাত্রে কলকাতার ফুটপাতের আর একটি ভূমিকা। হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে আপনাকে। এই ফুটপাত যদি সেদিন তৈরী না হত তাহলে যারা আজ এই ফুটপাতের ওপর শুয়ে রাত কাটায় তারা নির্ঘুম যন্ত্রণা নিয়ে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করত। রিক্সাওয়ালা, কুলি, ঠেলাওয়ালা, দোকানী, পথবাসী এই রকম কলকাতার বহু গৃহহারাদের রাতের আস্তানা এই ফুটপাত। বিশ্রামের তীর্থক্ষেত্র এই ফুটপাত এদের চিরকালের আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ তারিখে কোন এক পত্রিকায় এই সংবাদটি বের হয়েছিল—"ইংলণ্ড দেশে নলদ্বারা এককল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার দ্বারা বায়ু নির্গত হইয়া অন্ধকার রাত্রিতে আলো হয়। সম্প্রতি শুনা গেল যে মোকাম কলিকাতার ধর্মতলাতে শ্রীযুক্ত ডাক্তর টৌম্লিন সাহেব আপন দোকানে ঐ কল সৃষ্টি করিয়াছেন অনুমান হয় যে লাটিরির অধ্যক্ষেরাও লাটিরির উপস্বত হইতে কলিকাতার রাস্থাতে ঐরূপ আলো করিবেন।"

অর্থাৎ কোলকাতার রাস্তায় তখন আলোর কথা স্বপ্ন। সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকারকে বিদুরিত করতে চাঁদের আলোর আশায় বসে থাকতে হত। তখন প্রকৃতির আলোই মানুষের প্রার্থনা। এমনকি জোনাকিরাও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলত পথিককে। তবে রাত্রিবেলা পথে বড় একটা কেউ চলত না। যারা চলত তাদের হাতে থাকত মশালের আলো। মশালের আলোর বেশী প্রচলন ডাকাতরের মধ্যেই দেখা যেত। সেকালে বনজঙ্গলে ঘেরা .কালকাতার ডাকাতের সংখ্যা যে বেশী ছিল একথা অনেকেই জানেন। পথে পাল্কী আক্রমণকরে লুঠ্ করা যেন একটা রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। তারপর এল তেলের বাতি।

তৈলপ্রদীপের আলোর গুরুত্ব আমরা আজও ভুলিনি। এখনও আমাদের প্রদীপ না হলে একেবারেই চলে না। কি পূজোপার্বণে কি অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে। দীপালিকায় আমরা আলো জ্বালাই, মন্দিরে মন্দিরে স্ফটিকদীপে গন্ধ তেল জ্বালিয়ে উপাসনা করি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বিজ্ঞানের এই উন্নতিতে এখনও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক লণ্ঠন, প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘর আলোকিত করে।

প্রাচীন মিশর, মহেঞ্জোদরো বা মেসোপটামিয়ায় পোড়ামাটির প্রদীপে আলো জ্বলতো। তারপরে কোন কোন অঞ্চলে তামা ও ব্রঞ্জের সুন্দর সুন্দর বাতিদান পাওয়া গেছে। মধ্যযুগে সর্বশাস্ত্রবিশারদ্ লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এক নতুন ধরনের আলো আবার তৈরী করেন। তাতে জলে-

ভরা একটা কাঁচের পাত্রের উপর একটি কাঁচের পাত্র বসান ছিল। এ থেকেই পরে লণ্ঠন হল বলা যেতে পারে।

কৃত্রিম আলোর সবচেয়ে উন্নতি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ঈষৎ গোলাকার কাচের পাত্রে দেখা গেল আলোর দপ্ দপ্ করা ভাবটা কমে যায়। সেই সঙ্গে সলতে ওঠানামার কলও বের হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তেলের আলোর বাজার জমজমাট। ঘরদোরের চেহারাই পাল্টে গেল। কোনটা দেওয়ালে টাঙানো কোনটা ছাদ থেকে ঝোলানো। ধনীগৃহে ঝাড়লণ্ঠনের নীচে গানের জলসা বসল। বাগানে এলো চীনা লণ্ঠন। তখনকার সে একদিন। ঝাড়লণ্ঠনের নীচে ফরাসের ওপর খানদানী বাইজীর মিঠে তালের গজল আর চৌদুনে নৃত্যের মহড়া—দুটি কোমল পায়ের ঘুর ঘুর ছন্দ!

তবে এই সময় মোমবাতি শিল্পেরও উন্নতি হচ্ছিল। হিন্দুদের প্রদীপের মত খৃষ্টানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মোমবাতির ব্যবহার হয়। কিন্তু প্রাচ্যে মোমবাতি ব্যবহৃত হত না। ইউরোপ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে যে দীপদান বা মোমবাতির আঁধার দেখা যেত তাতে নারী-মূর্তি বা পশু-পক্ষীর মূর্তি ছাড়াও সূক্ষ্ম নক্সা থাকত। রূপো ছাড়াও আরো অনেক জিনিষ তৈরী হত। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এখনো অনেক সুন্দর দীপদান পাওয়া যায় যা হস্তশিল্পের নিদর্শন বলে বিদেশে সমাদৃত

তারপর এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলো আসবার আগে আমাদের এই কোলকাতা সহরের পথঘাট কিরকম আলোকিত ছিল সে সম্বন্ধে একটু বলা উচিত। গ্যাসের আলোর আগেই তেলের আলো। গ্যাসের আলো কাল পর্যন্ত রাস্তায় ছিল। এখন আলো নেই, শুধু অস্তিত্বটুকু আছে, তাও হয়ত একদিন লোপ পেয়ে যাবে।

শুনলে আশ্চর্য লাগে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের আগে পর্যন্ত এই বিরাট কোলকাতা সহরে মাত্র ৩১৩টি তেলের আলো ছিল। সে আলোর ব্যবস্থা কর্পোরেশনের দ্বারাই হয়েছিল। তেলের আলোর উদ্ভব কোলকাতায় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের পর। তারপর থেকেই পথে আলোকস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। কণ্ট্রাক্টর পরিবেশন করতেন তেল, পলতে প্রভৃতি। প্রতিটি আলোর জন্যে পরিষ্কার প্রভৃতি ব্যয় বাবদ মাসে এক টাকা দু'আনা ছ'পাই করে খরচ পড়তো। মোট পড়ত সমস্ত আলোর জন্যে আনুমানিক সাত হাজার টাকা। কণ্ট্রাক্টরের

কাজের কতৃত্ব করার জন্যে একজন ওভারসিয়ার থাকত, তার বেতন ছিল মাসে ষাট সিক্কা টাকা।

এইভাবেই কোলকাতা সহরের পথঘাট বহু বছর ধরে স্বল্প আলোয় উজ্জ্বলতা নিয়ে কাটাচ্ছিল, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী পাঁচ বছরের জন্য নতুন চুক্তির সময় কিছু পরিবর্তনের ব্যবস্থা হয়। মিষ্টার স্টেথাম (Mr. Statham) পূর্বের কণ্ট্রাক্টর, এই নতুন চুক্তির সময় কিছু নতুন ব্যবস্থার কথা শোনান এবং তার জন্যে প্রতিটি আলোর জন্যে মাসে তিন টাকা আট আনা করে খরচ পড়বে বলে জানান। কর্পোরেশনের কমিশনাররা মঞ্জুর করেন স্টেথামের প্রার্থনা কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে বলে অঙ্গীকার করিয়ে নেন।

মিষ্টার স্টেথাম শেষ পর্যন্ত গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তা অন্য কোন নতুন ব্যবস্থা পর্যন্ত ছিল।

আলোর জন্যে অনেক ব্যবস্থাই নিত্য-নতুন হত তার মধ্যে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে (under Section 50 of Act XII of 1852) গৃহস্বামীদের ওপর একটি বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছিল। প্রত্যেক ভাড়াটেরা মাসে সত্তর টাকা ব্যয় করে নিজের বাড়ীর গেটের সামনে আলো দেবে। এই আলো দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল এইজন্যে যে, অন্ততঃ পথঘাট একটু নিজের নিজের ব্যয়ে আলোকিত হবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অপর আইনানুসারে এর ব্যবহার একশ' কুড়ি টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছিল।

কোলকাতা সহরে গ্যাসের আলোর আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে অন্যান্য স্থানের গ্যাসের আলোর আবির্ভাব নিয়ে কিছু বলতে হয়। ইউরোপের রাস্তায় গ্যাসের আলোর প্রচলন খুব বেশীদিন হয়নি। কিন্তু চীনাদের মতে কয়েক হাজার বছর আগেই চীনদেশে গ্যাসের আলো ছিল। এক পাহাড়ের ভেতর থেকে খনিজগ্যাস বাঁশের নল দিয়ে সহরে আনা হত। সে যাই হোক, পশ্চিমী জগতে ইংলণ্ডেই সর্বপ্রথম ১৭৯২ সালে উইলিয়াম মারডক নামে এক ভদ্রলোক আলো জ্বালতে গ্যাস ব্যবহার করেন। আর কোলকাতার কথা তো প্রথমেই বলা হয়েছে।

সেই গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবে ঠিক হল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীর ওপর সেই ভার পড়ল। ভার দিলেন সরকার। কোম্পানী ৬০০ বাতির ব্যবস্থা করল এবং সেগুলি জ্বালানো ও পরিষ্কারের দায়িত্ব কোম্পানীর কর্মচারীর। প্রত্যহ রাত্রে দশ

ঘণ্টা করে আলো জ্বলবে এবং তার ব্যয় প্রতিটি বাতি পিছু বছরে ৯০ টাকা। এর মধ্যে অবশ্য কিছু রিবেটেরও ব্যবস্থা হল। এই ব্যবস্থা অনুসারে ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোষ্ট ও ব্রাকেট আনিয়ে নিয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললো। এক সন্ধ্যায় আলো জ্বললো চৌরঙ্গী এলাকায় প্রথম।

তারপরই ঐ বছরের মধ্যে ১,১৯,১১৭ টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। আরো আলো চাই। কিন্তু টাকা খুব সংগ্রহ হল না। অথচ বছরের শেষে ৫৪,২৯৩ টাকার একটি বিল হয়ে গেল। করপোরেশনের কমিশনাররা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের শেষে উপায় না দেখে মঞ্জুর করলেন:—

৬০০ গ্যাস বাতির ব্যয় বাবদ বছরে প্রতিটি ৯০ টাকা হারে
=টাকা ৫৪,০০০

১০০০ তৈল বাতির ব্যয় বাবদ বছরে প্রতিটি ৪২ টাকা হারে
=টাকা ৪২,০০০

মোট=টাকা ৯৬,০০০

৭৫০০০ টাকা আরো বাড়তি দেওয়া হল, কোলকাতায় আরও বাতির ব্যবস্থার জন্যে। কমিশনাররা বড় বড় রাস্তার মাঝখানে স্থায়ী পোষ্ট বসিয়ে পথবাসীর সুবিধার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলেন। দিন দিন উত্তরোত্তর আলোর সংখ্যা বেড়ে চললো। আলোও বাড়ল, ব্যয়ও বাড়ল। শেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ১০০০ গ্যাস বাতি ও ৮০০ তেল বাতির জন্য নতুন পোষ্ট ইত্যাদি ব্যয় বাবদ খরচ পড়ল ১,১৫,৩০৫ টাকা এবং সেই খাতে মঞ্জুর হল বাৎসরিক ১,২৩,৬০০ টাকা। এই সময় এই আলোর জন্য বাড়ীওয়ালার চেয়ে ভাড়াটের দায়িত্ব ছিল বেশী, তাদের খরচ দিতে হত। নতুন নতুন আলোকস্তম্ভ ইংলণ্ড থেকে নিয়ে এসে রাস্তার শোভা বাড়ানোর চেষ্টা হত। ময়দানের পুলিশের কমিশনার ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, ইডেন গার্ডেন, ময়দান প্রভৃতি স্থানে আলো দিয়ে সাজাবার কাজে খুবই আগ্রহশীল হয়েছিলেন।

গ্যাস পোষ্টের জন্য ইংলণ্ডে খবর গেল। সম্পূর্ণভাবে বসানো এবং আলো জ্বালা পর্যন্ত খরচ প্রতিটি ৩৫ টাকা। গ্যাস কোম্পানী সেই আলো প্রতিটির খরচ নেবে ৮ টাকা ৪ আনা। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গ্যাস কোম্পানী গ্যাস সরবরাহের জন্য ৭৭৩৩ টাকা কমিশনারদের কাছে চাইল। তার উত্তরে কমিশনাররা জানালেন কোম্পানীর কর্মচারী দিয়ে প্রয়োজনীয় স্থানগুলিতে

আরো আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। তাছাড়া আরও একটি অসুবিধে—গ্যাস কোম্পানী ঠিকমত গ্যাস ব্যয় করে হিসেব দেখাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধেও সঠিক নির্ধারণ করার ক্ষমতা নেই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের শেষে দেখা গেল ৮০৫টি তেলের বাতি অবশিষ্ট আছে এবং নতুন চুক্তির সময় দেখা গেল তার ব্যয় প্রতিটি বাতির জন্য বছরে ৩৯ টাকা হয়েছে। এই সব হিসাব নিকাশের ভেতর দিয়েই বরাবর চলছিল—কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সাইক্লোনের সময় সমস্ত কিছু নষ্ট করে দিয়ে এক বিরাট ক্ষতি করে দিল। সে ক্ষতি পূরণ হতে অনেকদিন সময় লেগেছিল।

তারপর দেখা যাচ্ছে গ্যাস কোম্পানীর সঙ্গে নতুন একটি চুক্তি। সে চুক্তি হচ্ছে ১৮৫৭ থেকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের পর। এই চুক্তির সময় কতকগুলি নতুন নিয়ম সংযোজিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রতিটি আলো পিছু, মাসিক ব্যয় ৪,১৩.৪ পাই হিসাবে।

এরপর একেবারে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে হয়। তখন সহরের গ্যাস অথবা বিজলী বাতির জন্য নতুন টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। শেষ পর্যন্ত পুনরায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানীকেই ক্ষমতা দেওয়া হয়। তবে মিস্টার ম্যান্সফিল্ড উপদেশক হিসাবে করপোরেশন ও গ্যাস কোম্পানীর মধ্যস্থতায় কাজ করেন। তিনি গ্যাস কোম্পানীর লণ্ডনের অফিসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আধুনিক আলোক সরঞ্জাম আনানোর ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয় না।

দু'বছরের মধ্যে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর করপোরেশন নিজে জানায়, শুধু গ্যাস কোম্পানীর কাছ থেকে ক্রয় করে আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা তারা নিজেদের লোক দিয়ে করবে। এর পর আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করপোরেশনের একটি বিভাগের দ্বারা চালিত হয়।

বলতে গেলে কোলকাতার প্রথম বিজলীবাতি অন্ধকারের রহস্য দূরীভূত করে হ্যারিসন রোডের। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জঙ্গল কেটে সুরম্য পথ নির্মাণের পর কমিশনাররা ইলেকট্রিসিটির কণ্ট্রাক্টরের শরণাপন্ন হলেন। কণ্ট্রাক্টররা পেল তিন মাসের সময়। ডায়নামো স্থাপন করা হল হ্যালিডে ষ্ট্রীট পাম্পিং স্টেশনে। ব্যয় বরাদ্দ হল ১২০০০ টাকা।

১৮৯৫ থেকে ৯৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মাটির তলা দিয়ে ইলেকট্রিক তার প্রভৃতি প্রবেশের জন্য ১০৬০০ টাকা খরচ পড়লো। মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানী (Messrs Kilburn and Co.) বাৎসরিক ৯৭৫০ টাকা গ্রহণ করে এই ভার

গ্রহণ করলেন। ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের এক চুক্তিতে 'ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন' একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু দেখা গেল মেসার্স কিলবার্ণ এণ্ড কোম্পানী'র পুরাতন চুক্তিতেই যথেষ্ট সুবিধাজনক। সুতরাং কিলবার্ণের চুক্তি অনুযায়ী তাদের ওপরই হ্যারিসন রোডের ব্যবস্থা বলবৎ থাকলো। তবে ১৯০৪-৫ খৃষ্টাব্দে 'ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী' ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই এ্যাসোসিয়েশন' হ্যারিসন রোডের জন্য ভিন্ন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাৎসরিক ৮২২০ টাকা হিসাবে একটি খসড়া প্রস্তুত হয়। এবং ১৯০৫-৬ খৃষ্টাব্দে হ্যালিডে স্ট্রীটটি ক্রয় করা হয়।

১৯০৯-১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শক্তিশালী গ্যাস বাতির সঙ্গে ইলেকট্রিক বাতির তুলনা হয়েছিল। এই জন্যে ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন নিজ ব্যয়ে জোরালো বিজলী বাতির আলো দিয়ে করপোরেশন স্ট্রীট ও চৌরঙ্গী অঞ্চল সাজিয়ে দিয়েছিল। তারপর ফিরিঙ্গি এরিয়া মেন রোড, মানিকতলা, উল্টোডিঙ্গি প্রভৃতি আলোকিত হতে আরম্ভ হয়।

১৯১৪-১৫ খৃষ্টাব্দের একটি হিসাব থেকে দেখা যায়, ৭,৮৪,১৪৫ টাকা সাধারণের কাছ থেকে আলোর বাবদ আয় হয়েছিল।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তৈল ও গ্যাস বাতির ক্রমোন্নতি

বৎসর	তৈলবাতি	গ্যাসবাতি	ব্যয়ের পরিমাণ
১৮৬৪	৬৭৭	১০৮৪	টাঃ ১,১৫,০৬৬
১৮৭০	৬২১	২৭১১	,, ২,১২,২০২
১৮৮০	১৫১	৩৮৫৯	,, ২,৪৬,৭৬০
১৮৮৯—৯০	সহরে ৩৬৮	৪৫২৪	,, ৩,০০,৭৪৭
	অন্যান্য ৬৮৭	৪৯৪	
১৮৯০—৯১	১১৫৮	৫৩৯৭	,, ৩,২৩,০১৫
১৯০০—১	২২১৫	৬৮১৯	,, ৪,৬১,৮০৪
১৯০৫—৬	২৩৭৯	৮৯৯৭	,, ৫,৮৩,২৪৬
১৯১০—১১	২১৯২	১০১৮৫	,, ৬,৬৫,৮২৯
১৯১৪—১৫	১৭৫৯	১১৯০০	,, ৭,৯৭,০৩৯

বৈদ্যুতিক আলের পরিকল্পনা প্রথম সৃষ্টি হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। স্থানীয় সরকার ও কর্পোরেশনের সম্মিলিত চেষ্টায় এই ব্যবস্থা সংঘটিত হয়। প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয় 'কোলকাতা ইলেকট্রীক লাইটিং কর্পোরেশন লিমিটেড'।

সেই সময় ইলেকট্রীক ট্রামওয়েও শুরু হয়। তারপর আস্তে আস্তে বৈদ্যুতিক আলোর প্রসারই বেড়ে যায়। জোরালো গ্যাসবাতির সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলোর তুলনা করে চৌরঙ্গীর পথ আলোকিত হয়েছিল। সেই থেকেই গ্যাসবাতির প্রচলন কমতে শুরু হয়।

বর্তমানে সেই গ্যাসবাতি একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। আছে শুধু পথের ধারে তারই শেষ অস্তিত্ব স্তম্ভগুলি। তার ওপর এখন ঝুলছে জোরালো পাওয়ারের বৈদ্যুতিক আলো।

এখন এই বৈদ্যুতিক আলোর প্রথম উদ্ভবের ইতিহাস শুনুন। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মাণীতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল যে গন্ধকের একটা গোলককে তাড়াতাড়ি ঘোরালে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা যায়। বৈদ্যুতিক আলোর এটাই হচ্ছে আদি কথা। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর আসল জন্মদাতা ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী টমাস আলাভা এডিসন। পরের বছর এডিসন কলম্বিয়া নামে এক জাহাজে ১১৫টি আলো জ্বালান ব্যবসায়িক ভিত্তিতে, সেটাই প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন।

এরপরে আলোর উন্নতি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আলোর চেহারা, তার রং ধরণ-ধারণ সবই অভিনব হচ্ছে। আজ শুধু সাধারণ আলো নয়, ফ্লোরেসেণ্ট, নিওন, এসবেরও প্রচলন বেড়ে উঠেছে। অনেক বাড়িতেই আজকাল ফ্লোরেসেণ্ট আলো দেখা যায়, আর নিওন আলোর বিজ্ঞাপনে রাতের শহর নতুনরূপে দেখা দিচ্ছে। নিওন আলোর আবিষ্কর্তা মঁসিয়ে ক্লদ নিওন জানতেন না যে, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বাড়ির সামনের রাস্তা নানা রংয়ের নিওন আলোয় ছেয়ে যাবে।

কোলকাতা ও তার ক্রমবর্ধমান শহরতলী অঞ্চলে আরো আলোর জন্যে তৃতীয় পরিকল্পনায় ব্যাণ্ডেলে ৩০০ মেগাওয়াট পরিমাণের একটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে, এটাই হবে এশিয়ার বৃহত্তম কেন্দ্র। প্রায় সব জায়গাতেই কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প করে টার্বোজেনারেটর যন্ত্রে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়। তাপ-বিদ্যুৎ ছাড়াও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। বিদেশে আণবিক শক্তিতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে দূর গ্রামাঞ্চলকে আলোকিত করা হচ্ছে।

অনেকে এখন বলছেন যে, যত অভিনব আলোই বের হোক না কেন, ভবিষ্যতে রাস্তার আলোই থাকবে না। বাড়ির গায়ে আর রাস্তায় এমন আণবিক রং লাগানো থাকবে রাত্রিবেলা জ্বলতে থাকবে।

সম্প্রতি এক সোভিয়েট বিজ্ঞানী বলেছেন যে, দু'হাজার খৃষ্টাব্দের নববর্ষে সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ের সঙ্গে এই সংবাদ শুনবে যে, মস্কো শহরের উপরে এক কৃত্রিম সূর্য তৈরী হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কিলোওয়াট দিয়ে গঠিত এই আলোকপিণ্ড বারো তেরো মাইল উপরে থেকে সমস্ত শহরকে আলোকিত করবে।

সে যাই হোক, আলোর যে এত উন্নতি চারধারে তার যে এত সমারোহ তা বিদ্যুতেরই কল্যাণে। কিন্তু বৈদ্যুতিক গোলমালে আলো নিভে গেলে আবার সেই অন্ধকার। তখন মনে হয় আমরা যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছি। তখন অন্ধকারে আরো একটা কথা মনে হয়, বোধ হয় 'পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপই' ভালো ছিল, সেই সঙ্গে 'রূপকথা শোনা নিভৃত সন্ধ্যে-বেলাগুলো' যা হারিয়ে গেছে, তা বোধ হয় আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

অতীত রোমন্থনে মন আবার ফিরে যেতে চায়।

Municipal Calcutta—S. W. Goode-র বই থেকে এই নিবন্ধের জন্য অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারের মানুষ, সেই পরিবার সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়। ঠাকুর পরিবারের কথা আজ আর কারও অজানা নয়। কিন্তু এই ঠাকুর পরিবার কবে কলকাতায় এলেন সে সম্বন্ধে অনেকেরই জানার কৌতূহল। কারণ আজ কলকাতাবাসী ধন্য এই কারণে যে এই সহরেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে সর্ব্বজনবন্দিত রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

পুরুষোত্তমের বংশে কলকাতার ঠাকুরগোষ্ঠী। পুরুষোত্তম কুশারীর পুত্র বলরাম, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্র রামানন্দ। রামানন্দের দুই পুত্র হয়—বড় মহেশ্বর ও ছোট শুকদেব। মহেশ্বর থেকেই কলকাতার জোড়াসাঁকো এবং কয়লাহাটার ও পাথুরিয়া ঘাটা প্রভৃতি ঠাকুরগোষ্ঠীর উৎপত্তি, আর শুকদেব থেকে চোরবাগানের ঠাকুরগোষ্ঠীর উদ্ভব।

শোনা যায় মহেশ্বর ও শুকদেব দু'ভাই জ্ঞাতিকলহে দেশ ত্যাগ করে কলকাতা গ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দপুরে এসে বাস করেন। এই সময়ে কলকাতা ও সুতানুটীতে শেঠ বসাকগণ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং সুতানুটী-হাটখোলার দত্ত চৌধুরীরাও বিশেষ বিস্তৃতভাবে বাণিজ্য ব্যবসা করতেন।

মহেশ্বরের পুত্র পঞ্চানন ও শুকদেব গোবিন্দপুরে এসে আদিগঙ্গার তীরে বাস স্থাপন করেন। তখন মুসলমানের ইতিহাসে ও ইউরোপীয়গণের কাজে আদিগঙ্গার নাম ছিল গোবিন্দপুর খাঁড়ী।

যে সময়ে এঁদের বাস স্থাপিত হয়, প্রায় ঠিক সেই সময়েই ইংরাজেরা হুগলী থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে সুতানুটি গ্রামে প্রবেশ করেন এবং এখানে আপনাদের কুঠি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ তারা সুতানুটীর দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী কলকাতা ও গোবিন্দপুর নামে গ্রাম কিনে তিন গ্রামের একত্র "কলকাতা" নাম দেন (১৬৮৬-১৬৯০ খৃঃ)। তখনও পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয় নি।

পঞ্চানন ও শুকদেব যে স্থানে বাস করেন সেই স্থানে মৎস-ব্যবসায়ী জেলে, মালো ও কৈবর্তের বাসই অধিক ছিল এবং কতকগুলি বণিক-বৃত্ত পোদও বাস করত। এই সকল পোদ-বণিক সাদরে ও মহা আগ্রহে পঞ্চাননের বাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এতগুলি অব্রাহ্মনীয় জাতির মধ্যে পঞ্চাননই একা একঘর ব্রাহ্মণ বাস করায়, পঞ্চাননের নাম এবং উপাধি ক্রমশঃ ডুবে যায়। ক্রমে তিনি অব্রাহ্মনীয় সুলভ ব্রাহ্মণের সাধারণ সম্বোধন "ঠাকুর-মশাই" নামেই প্রসিদ্ধ হন।

এই সময় আদি গঙ্গার মুখে গঙ্গার ওপর ইংরাজের যে-সব জাহাজ থাকতো তাদের কাপ্তেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় আরোহীদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা উভয়ে প্রথমতঃ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে ব্যবসা আরম্ভ করেন। চলতি কথায়, এই ব্যবসাকে জাহাজের মুৎসুদ্দি ও ইংরাজী Stevedor বলে। সর্বপ্রথমে তাঁরা ফলমূলাদি সরবরাহ করতেন। ক্রমশঃ সব দ্রব্যই সরবরাহ করতে থাকেন।

যাই হোক, পঞ্চানন ও শুকদেব এরূপে জাহাজের সরবরাহকারের ব্যবসায়ে বেশ কিছু উপর্জন করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁদের অর্থ সঞ্চিত হলে গোবিন্দপুরে গঙ্গাতীরে ভূমি ক্রয় করে তাতে বাসভবন নির্মাণ ও একটি শিব প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্গীর হাঙ্গামার পর ইংরাজ বণিকেরা যখন নবাবের অজ্ঞাতসারে কলকাতার কুঠিকে কেল্লায় পরিণত করে তোলেন তখন তাঁরা উভয়ে ইংরাজ গভর্ণর কাপ্তেন ও কুঠিয়ালদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হন! সেই পরিচয়ের বলে তাঁরা শেষে ইংরাজ-দুর্গের সমস্ত দ্রব্য সরবরাহ করেন। ইংরাজ বণিক ও কাপ্তেনরাও অর্ডার দেওয়া, বিল করা সমস্তই 'ঠাকুর' নামে করতেন। এরূপে পঞ্চানন ও শুকদেব উভয়ের 'ঠাকুর' উপাধিই প্রচলিত হয়।

পঞ্চানন ঠাকুরের জয়রাম ও রাম সন্তোষ নামে দুই পুত্র ও কৃষ্ণচন্দ্রের এক পুত্র হয়। ইংরাজ বণিকদের কাছে প্রতিপত্তি থাকায় জয়রাম, রামসন্তোষ ও কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র কিছু কিছু ইংরাজী লেখাপড়া শিখেছিলেন কিন্তু তখনকার বৈষয়িক ব্যাপার নির্বাহের জন্য পারসী-বিদ্যায় তাঁদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।

জয়রাম লেখাপড়া শিখলে পর পঞ্চানন ইংরাজ মুরুব্বীদের ধরে ইংরাজ কুঠিতে তাঁর একটি চাকুরী করে দেন। তখন কোম্পানীর সরকারে বেতন বিভাগের অধ্যক্ষের অধীনে প্রধান কর্মচারীর পদশূন্য ছিল। জয়রাম সেই চাকুরীটি পেলেন।

তারপর ১৭০০ খৃষ্টাব্দে কালেকটর পদের সৃষ্টি হয়। রালফে সেল্‌ডন নামে এক ব্যক্তি কলকাতার জরীপের ব্যবস্থা করে দুজন আমীন নিযুক্ত করেন। এই সর্বপ্রথম ইংরাজী আমলের প্রথম জরিপ। পঞ্চানন ঠাকুরের অনুরোধে জয়রাম ও রামসন্তোষই আমীন পদে নিযুক্ত হন।

জয়রাম ও রামসন্তোষ কোম্পানীর চাকুরী করে বুদ্ধিবলে বিস্তর অর্থোপার্জন করেছিলেন। পঞ্চানন ঠাকুর মারা যাবার পরও কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর জীবিত ছিলেন। বিষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে জয়রাম ও কৃষ্ণচন্দ্রের মনান্তর হলে তিনি ধনসায়রের পৈতৃক বাটী ত্যাগ করে সুতানুটীর মধ্যে বর্তমান চোরবাগান নামক পল্লীতে বাসস্থাপন করেন (চোরবাগান মুক্তরামবাবুর স্ট্রীটে অবস্থিত)। এখন যে স্থানকে ধর্মতলা বলা হয়, সেই স্থানকেই সেকালে ধনসায়র (ধনসাগর) বলা হত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর নূতন নবাব মীরজাফর আলী খাঁর সঙ্গে যখন ইংরাজদের সন্ধি হয় তখন সিরাজউদ্দৌল্লার কৃত নগরবাসীর ক্ষতিবাবদ কয়েক লক্ষ টাকা দিবার এক সর্ত হয়। জয়রাম ঠাকুরের পুত্ররাও ক্ষতিস্বরূপ কিছু টাকা পেয়েছিলেন। এই সময়ে গড়ের মাঠ বাড়াবার জন্যে জয়রাম ঠাকুরের বাড়ী বাগান ও বৈঠকখানা ইংরাজেরা গ্রহণ করেন। তাতেও তাঁরা কিছু টাকা পান। তখন জয়রামের মধ্যম পুত্র নীলমণি ঠাকুর একেবারে ডিহী কলকাতা গ্রামে এসে জমি কিনে বাসের ব্যবস্থা করেন। পাথুরেঘাটায় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীর অন্তর্ভুক্ত যে পুরোনো ভাঙা-বাড়ী এখনও ঠাকুর-গোষ্ঠীর আদিবাড়ী বলে নির্দিষ্ট হয়, ১১৬৭ বঙ্গাব্দে তার সূত্রপাত হয়। নীলমনি ঠাকুর ১১৬৭ বঙ্গাব্দের ১৬ই চৈত্র তারিখে এখানে রামচন্দ্র কলুর কাছ থেকে ৫২৫ টাকায় তার ঘর-বাটী সমেত সাড়ে দশকাঠা জমি নিজ নামে ক্রয় করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল জমির সংলগ্ন জগমোহন দাস সৌর (সাহার) কাছ থেকে তার বসত-বাটী মায় দু'বিঘা সাতকাঠা জমি ৯০০০ টাকায় নীলমণি ঠাকুর নিজ নামে ক্রয় করে পাথুরেঘাটায় আপনাদের সম্পোয্য মত বাসস্থানের পত্তন করেন।

ইংরাজ কোম্পানী ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। নূতন দেওয়ান হয়ে ক্লাইভ যখন রাজস্ব আদায়ের নূতন ব্যবস্থা করেন, সেই সময়েই নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যার কালেকটরের সেরেস্তাদার হয়ে উড়িষ্যায় যান। নীলমণি উড়িষ্যার চাকুরীতে বিপুল অর্থ উপার্জন করে কলকাতায় কতকগুলি ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। এ সমস্তই নীলমণির নিজস্ব

ছিল। এর উপর তিনি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে আপোষে একলক্ষ টাকা নিয়ে পৈতৃক আবাস ত্যাগ করেন। জোড়াবাগানের সুপ্রসিদ্ধ শেঠ বংশীয় বিখ্যাত বৈষ্ণব ও তখনকার প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বৈষ্ণবচরণ শেঠের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্ভাব ছিল। বৈষ্ণবচরণ মেছুয়াবাজার নামক পল্লীতে নিজ জমির মধ্যে এক বিঘা জমি নীলমণিকে বাসের জন্য নিষ্কর দান করেন; কিন্তু নীলমণি ব্রাহ্মণ বলে শুদ্রের কাছে এই ভূমি-দান নিতে অস্বীকার করেন। শেষে বৈষ্ণবচরণ নীলমণির গৃহদেবতা 'লক্ষ্মীজনার্দন শিলার নামে দান করায় নীলমণি ঐ জমিতে বাস করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর-গোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত হয়। তখন এই পল্লীর জোড়াসাঁকো বা সিংহবাগান নাম ছিল না। পার্শ্ববর্তী মেছুয়াবাজার পল্লীর অন্তর্গত বলে এই সকল স্থানও মেছুয়াবাজার নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

নীলমণির তিন-পুত্র রামলোচন, রামমণি ও রামবল্লভ। জোড়াসাঁকোয় বাসস্থানের সময় রামমণির বয়স ২৫ বৎসর, রামবল্লভের ১৭ বৎসর ও রামলোচনের বয়স ৩৫ ছিল। ঠিক কোন্ তারিখে বৈষ্ণবচরণ শেঠ নীলমণিকে ভূমিদান করেন, তা জানা যায় না, কারণ নীলমণির বংশে ঐ জমির দান-পত্রখানি বর্তমান নেই। রামলোচনের একটি কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল কিন্তু অধিক দিন জীবিত থাকে নি। সেই জন্য রামলোচন মধ্যম ভ্রাতা রামমণিব পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

এই দ্বারকানাথ ব্যতীত রামলোচনের আর কোন সন্তান হয় নি।

এই সময়ে সাধারণ ভদ্রলোকে পাল্কী ও ধনী লোকেরা তাঞ্জাম ব্যবহার করতেন। পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে তখন খিড়্কীদার পাগড়ী, চুড়িদার পাজামা, জোড়া ও দোপাট্টা প্রধান ছিল। যুবকরা তাজ, সদ্‌রি, (ফতুয়া) লম্বাকোর্তা, রুমাল, দোপাট্টা এবং ধুতি ব্যবহার করতেন। মধ্যবিত্তেরা বেনিয়ান ও উড়ানী ব্যবহার করতেন। শোনা যায়, বিকেলে হাওয়া খেতে বার হবার প্রথা রামলোচন ঠাকুরই প্রথম প্রবর্তিত করেন। তিনি লম্বাকোর্তা, দোপাট্টা ও তাজ পরিধান করে তাঞ্জামে চড়ে বাড়ী থেকে বের হতেন এবং বড় রাস্তা হয়ে চোরবাগানে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুরের বাড়ী পাথুরেঘাটায়, আপনাদের পৈতৃক বাড়ী ঘুরে নানা দেবালয় দর্শন করে সন্ধ্যাকালে ফিরতেন। মেছুয়া-বাজারে তখনও বাইজীর বাস ছিল। ইংরাজ বণিক ও আমিরচাঁদ, রাজা হাজারীমল ও শেঠ-বসাকগণের মজ্‌লিসি আমোদের জন্য মুরশিদাবাদ থেকে কয়েকজন বাইজী এই সময়ে এসে কলকাতায় বাস করেছিল। রামলোচন ঠাকুরের সময়ে বাইনাচ ও কালোয়াতী গান ভিন্ন অন্য কোন মজলিসি আমোদ ছিল না। রামলোচন ঠাকুর থেকেই এই কলকাতায় এইসব আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়।

(যুগান্তর, ২৫শে জুন, ১৯৬১)

কালী, করালবদনী, ভয়ঙ্করী মুক্তকেশী চতুর্ভুজ বিশিষ্টা মুণ্ডমালা ভূষিতা, তাঁহার অধোব্যমহস্তে সদ্যঃ কর্তিত মুণ্ড এবং উর্ধ বামহস্তে খড়্গ, উর্ধ দক্ষিণ হস্তে অভয় চিহ্ন ও অধো দক্ষিহস্ত বরদান ভঙ্গিমা বিশিষ্ট। তিনি মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা উলাঙ্গিনী ; তাঁহার কণ্ঠ দেশে মুণ্ডমালা, তাহা হইতে রক্ত ধারা বিগলিত হইতেছে ; কর্ণদ্বয়ে কর্ণভূষণ স্থলে দুইটি শব লম্বিত রহিয়াছে ; তিনি ভীমদর্শনা করাল মুখী পীনোন্নত স্তনী শবগণের হস্ত সমূহ নির্মিত মেখলা ধারিণী হাস্যমুখী।

উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রক্তধারা গলিত হওয়ায় স্ফুরিতমুখী, ভয়ঙ্করশব্দ-কারিণী, ভয়ঙ্করমূর্তি, শ্মশানবাসিনী, অরুণতুল্যলোচনত্রয় বিশিষ্টা, করাল-দন্তা, দক্ষিণাঙ্গব্যাপমুক্ত কেশপাশ যুক্তা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়স্থিতা, ভয়ঙ্করশব্দকারি শিবাগণ, পরিবেষ্টিতা, প্রসন্ন ও হাস্যমুখী।

[বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য]

এই হচ্ছে কালীর মূল প্রাকৃতি। স্বল্পবুদ্ধি ও দুর্বল মানুষের উপাসনা কার্যে সুবিধার জন্যই তন্ত্রাদিশাস্ত্রে এই প্রকৃতি কালীর রূপ পরিকল্পিত আছে। আদ্যশক্তির প্রধানা মূর্তি এই কালী। শক্তি উপাসকের মধ্যে প্রায় দশ আনা লোক এই মূর্তির পূজা করে।

তবে দীপান্বিতা কালীপূজাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার খুব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কোনো স্মৃতিগ্রন্থে এর উল্লেখ নাই। কাশীনাথ পুরাণ ও তন্ত্র থেকে নানা বচন উদ্ধৃত করে প্রতিপাদন করেছেন—দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন কালী পূজার অনুষ্ঠান প্রশস্ত। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সকল প্রজাকে এই পূজা করতে আদেশ দিয়ে ছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এই পূজা না করলে গুরুদণ্ড ভোগ করতে হবে। এই আদেশের ফলে প্রতি বৎসর দীপান্বিতার দিন নদীয়ায় দশসহস্র কালীমূর্তি পূজিত হত।

আর এই মূর্তিরই নানা আধুনিক অঙ্গিক সৃষ্টি করে বর্তমানে দীপান্বিতার

দিন হেমন্ত অমাবস্যায় নগরে নগরে সার্বজনীন উৎসব কার্য চলে আসছে। এই পূজা উপলক্ষ করে অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকারকে বিদুরিত করবার জন্যে দীপালীর আলো সাজানো হয়, বাজী পুড়িয়ে সেই অন্ধকারের স্তব্ধতাকে শব্দে ও আলোর ছটায় বিদীর্ণ করে দেওয়া হচ্ছে।

শারদোৎসবের পরেই এই কালী পূজার উৎসব। এবং এ উৎসবে আছে ভয় ও ভক্তি। কালীর এই ভীষণাদর্শন করাল মূর্তি দেখে সচরাচর হৃদয়ের লোমকূপে জাগে শিহরণ কেমন যেন হিমশীতল হয়ে যায় দেহের শোণিত।

কতকাল থেকে যে এই মূর্তির কল্পনা হয়েছে তা জানা যায় না। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও তন্মতাবলম্বী প্রাচ্য পণ্ডিতেরা বলেন, এই মূর্তি হিন্দুদিগের মৌলিক মূর্তি নয়, ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যগণের দেবদেবী থেকে এই মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে। তবে এর কথা স্বীকার করতে হয় যে, তান্ত্রিক যুগেই এই মূর্তির উপাসনার নানাবিধ বিধি নিয়ম সঙ্কলিত ও বহুল প্রচার হয়েছে।

সে যা'হক, আজ বাঙ্গালী এই পূজায় সবিশেষ আগ্রহী। তার কারণ শাক্ত ভক্ত মনে করে, এই, শক্তির দেবীকে পূজা করলে তার বাহুতে আসবে শক্তি। তাই বাঙ্গালী এই করাল বদনা কালীর উপাসনার মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করে ধ্বংসময়ী মায়ের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে নবসৃষ্টির পূর্ণালো। যেন মহাশ্মশানের দীপান্বিতার অন্ধকার ঘুচিয়ে মঙ্গলের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য অকম্পিত হাতে দীপালীর বর্তিকা নিয়ে এই কালীর আবির্ভাব।

আজ এই বর্তমান ও অতীত কলকাতাকে নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা। বর্তমান কলকাতায় সার্বজনীনের কল্যাণে ইদানীংকালে পাড়ায় পাড়ায় পূজার আয়োজন হয়েছে। সরস্বতী পূজার মত কালী পূজারও খুব প্রচলন দেখা যায়। তবে এই শহরে পূজাকে উপলক্ষ্য করে যে উৎসবের আয়োজন করা হয় তার মধ্যে ভক্তি থাকে না, থাকে আড়ম্বর। আর সেই আড়ম্বরের তারতম্যের উপর ও সুদক্ষ শিল্পীর সুদক্ষ হাতের কারুকার্যে মর্তের নানা ভঙ্গি প্রদর্শনের ওপর প্রতিযোগিতার প্রচলন বহু বেশী বিস্তার লাভ করেছে। সেখানে ভক্তির চেয়ে আড়ম্বর, পূজার চেয়ে দর্শনটাই বড় হয়ে উঠেছে। মাইকের গগনভেদী চীৎকার ও রঙীন কাপড়ের ডেকরেটিংয়ের ওপর এত বেশী মানুষ ঝুঁকে পড়েছে যে আসল যে মাতৃমূর্তির বন্দনা তার আর হদিশ খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর কালীপূজার অমাবস্যা তিথিতে আছে ঘরে ঘরে প্রদীপ দেওয়া ও বাজী পোড়ান। এই আলো দেওয়া নিয়ে একটি

উশৃঙ্খলতা চোখে পড়ে, বাজী পোড়ানর মধ্যেও যথেষ্ট অসংযম প্রকাশ হয়ে পড়ে—যার জন্য সরকার থেকে প্রতি বছর ইস্তাহার ছেপে সহরের দেয়ালে লটকে দেওয়া হয়। এছাড়া শক্তির উপাসনায় তন্ত্রমন্ত্রে দীক্ষিত। তান্ত্রিকরা কারণবারি পান করে থাকেন।

এতো গেল বর্তমান কলকাতায় কালীপূজাকে কেন্দ্র করে মানুষের কতকগুলি আনন্দের ধরণ ধারণ। কিন্তু অতীতে ফিরে গেলে দেখাযায় কালী উপাসনার ভেতর দিয়ে এই কলকাতার বুকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কালীকে তুষ্ট করার জন্য গোপনে নরবলি দেওয়া হত।

জব চার্ণক তখনও এদেশ উদ্ধার করেননি। এদেশ তখনও ভাগীরথীর কূলে জঙ্গলময়, হিংস্র জন্তু জানোয়ারে পূর্ণ, লোকবসতীহীন তিনটি গণ্ডগ্রাম নামেই পরিচিত ছিল। সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট জব চার্ণক সুতানুটি হাটের সন্নিকটে নঙ্গর করেন। তারপর থেকেই কলকাতার ইতিহাস সুরু। কিন্তু তারও বহু পূর্ব থেকে এই স্থানটি কালীর জন্য ও কালীঘাটের জন্য দেশবিদেশের লোকের কাছে পরিচিত ছিল। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে রচিত চণ্ডিকাব্যে গঙ্গাতীরের যে বর্ণনা দিয়েছেন—তাতে কালীঘাটের নামোল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই কালীঘাট ও কালীর প্রকাশ এই কলকাতায় বহুকালের। এমন কি এই থেকে বলা যায় কালীঘাটের জন্যেই কলকাতার উৎপত্তি। তাহলে আরও বলা যায় যে, কালীর আশীর্বাদী অঞ্চল এই কলকাতা এবং এখানকার সকল মানুষই কালীর আশীর্বাদী ভক্তজন।

এই কালীঘাটের কালীমন্দিরের পুরণো ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, "কালীক্ষেত্র দীপিকায় আছে—পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে, দিল্লীর পাঠান রাজগণের সময়ে কালীঘাটের অনতিদূরে, স্থানে স্থানে মনুষ্যের বাস ছিল। এসময় কালীঘাটের চতুঃপার্শ্বে—বেত্র, কচুই প্রভৃতি লতা এবং দুশ্ছেদ্য গুল্মাদ-ময় ভীষণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বর্তমান কালীবাটীর পূর্বদিকে ঐ বনের মধ্য দিয়ে এক অপ্রশস্ত পথ ছিল। এই পথ বর্তমান কালের "রসা রোড" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। বন-মধ্যস্থ এই অপ্রশস্ত পথ দিয়ে, কালী দর্শনার্থী নাগা, ফকির ও সন্ন্যাসীগণ দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করত এবং কালিঘাটের কার্য শেষ করে পদব্রজে গঙ্গাসাগরে কপিলাশ্রমে যেত। ইংরেজরা আসবার আগে কলকাতায় দুটি মাত্র কালী মন্দিরের অবস্থান

লক্ষ্য করা যায়, একটি কালীঘাটের কালী মন্দির অপরটি চিত্রেশ্বরী কালীমন্দির। জনশ্রুতি যে, মন্দিরটি চিতে ডাকাতের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। এই চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী মন্দির দর্শন করে একটি মাত্র পথের ওপর দিয়ে তখনকার দিনে তীর্থযাত্রীরা কালীঘাটে যেত, সেই পথটির পরে নামকরণ হয়েছিল— Pilgrims Track ও The road leading to collygot চিৎপুর থেকে কমাই টোলা ওরফে বর্তমানে বেন্টিক ষ্ট্রীট হয়ে এসপ্লানেডের ওপর দিয়ে ভবানীপুর টপকিয়ে কালীঘাটে গমন।

মনে হয় এই অতি পুরাতন পথটিও এই তীর্থময় মন্দিরের জন্য পরে এই শহরের অভ্যুত্থান। তবে এই পথ ও শহর তৈরী হবার আরও বহু পূর্বে এখানে কালীর কি করে অভ্যুত্থান হল এ বিষয়ে চমৎকার কিম্বদন্তী আছে। তবে এ সকল কিম্বদন্তীকে ছাড়িয়ে একটি জনরবই আমাদের মনে বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সে হল বিষ্ণু কর্তৃক সুদর্শন ছেদিত সতী অঙ্গ।

তখনকার দিনে এই কলকাতা ছিল তিনটি গণ্ড গ্রামকে কেন্দ্র করে এবং এখানে গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই ভীষণ জঙ্গলের জন্য এ সকল স্থানে কোন লোক বাস করত না। জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘ, ভল্লুক, সিংহ প্রভৃতি গর্জন করত। শুধু এই কালীঘাট ও চিত্রেশ্বরী মন্দিরের জন্য একটি পথ দিয়েই লোক চলাচল করত। আর সে লোক আসত বহু দেশ বিদেশ থেকে। সঙ্গে আনত ধন-দৌলত, নারীরা পরে আসত সব মূল্যবান অলঙ্কার। সেই জন্যে ডাকাতের সংখ্যাই বেশী হয়েছিল। তারা দিনে ও রাতে ওৎ পেতে বসে থাকতো এই তীর্থযাত্রীদের জন্যে। তারপর তাদের পেলে মেরে ধরে সব কেড়ে নিত। ডাকাতদের কালীপূজা সর্বজনবিদিত। তখনকার কলকাতার এই সব গভীর জঙ্গলে ডাকাতরা গোপনে কালীপূজা করে ডাকাতি করতে বের হত। এবং অনেক সময় তারা নরবলি দিত, নররক্ত ও নরমুণ্ড কালীর কাছ থেকে পাওয়া যেত। ২৪।৪।১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শনিবার অমাবস্যার রাত্রে চিত্রেশ্বরী মন্দিরে কে বা কারা নরবলি দিয়েছিল তার সব চিহ্ন পরদিন সকালে মন্দিরে প্রাঙ্গনে পাওয়া যায়। যে মানুষটিকে বলি দেওয়া হয় তার রুধিরাক্ত মুণ্ডটি, মন্দিরের প্রতিমার পদতলের ওপর ছিল—ধড়টি মন্দিরের বাইরে একটি স্থানে পড়েছিল। তাছাড়া একখানি বহুমূল্য বেনারসী শাড়ি, সোনার কণ্ঠমালাও দুই একখানি রৌপ্যালঙ্কার ও সেই প্রতিমার কাছে ছিল। এই নরবলি-যজ্ঞের উপযুক্ত যে সমস্ত পাত্রাদি প্রয়োজন, তাও সেখানে পাওয়া যায়। যে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে এইরূপ নরবলি দেবার নিয়ম

আছে, তদনুযায়ী এই সমস্ত পাত্রাদি নির্মিত হয়। পূজার উপকরণ, জিনিসপত্র ও মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি দেখে প্রমাণ হয় যে এর পিছনে কোন তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত তান্ত্রিক ছিলেন।

তখনকার দিনে এইরূপ নরবলির দৃশ্য বহু দেখতে পাওয়া যেত। তারপর ইংরেজ আসবার পর আস্তে আস্তে এদেশে সভ্যতার আলোকপাত হয় এবং বহু কালীর মন্দির এই শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু নরবলির কথা আর প্রায় শোনা যায় নি। তবে গোপনে যে তান্ত্রিকরা এ বিষয়ে আয়োজন করেন না, এ কথা হলফ করে বলা যায় না।

কলকাতার বাইরে এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায় ২ একটি এই রকম ঘটনা। তবে কলকাতার মধ্যে মনে হয় পুলিসের ভয়েই এই প্রথার সঙ্কোচন হয়েছে। তবে বলি প্রথা এখনও বন্ধ হয় নি। বিশেষ করে ছাগ বলি, মোষ বলি প্রভৃতি। এখনও প্রতিদিন কালীঘাটের মন্দিরে নিয়মিত ছাগ বলি চলে আসছে। শহরে এখন কালীমন্দির অনেক, তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য, ঠনঠনের কালীবাড়ী, কবিয়াল এন্টনী ফিরিঙ্গী কৃত ফিরিঙ্গী কালী। নিমতলায় মা আনন্দময়ী প্রভৃতি।

আপনি যখন এই শহরের পথ দিয়ে যান তখন নিশ্চয় দেখতে পান, ট্রাম ও বাস চলা পথের পাশ দিয়ে কত মন্দিরের চূড়ো সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আপনারও হয়ত দুটি হাত জোড় হয়ে অজান্তে মস্তকে উঠে গেছে। এই শহর পত্তনের সময় বাঙ্গালীর ভক্তিতে ও ইংরেজের উৎসাহে বহু মন্দিরের সৃষ্টি ও কালী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ইংরেজরাও এই কালীর মূর্তি দেখে বলেছিল—Goddess of Kali—Goddess of fear, বহু ইংরেজকে দেখা গেছে, ব্যবসায় উন্নতি, চাকুরিতে পদোন্নতি হলে জুতা খুলে কালীঘাটে গিয়ে পূজা দিয়ে রক্তজবার মালা গলায় পরে পূজার ডালা নিয়ে মেমসাহেবদের হাত ধরে প্রফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরতে।

এই কলকাতার চারিদিকে বহু কালী প্রতিমা শাখঘণ্টা নিনাদে প্রতিদিন পূজা হয়, তাতেই বোঝা যায় এই বহুল প্রচারের হেতু! তবু অতীতের এই কলকাতার জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে মানুষের আসার সঙ্গে সঙ্গে কালীর প্রাদুর্ভাব। বাঙ্গালী যে শাক্তমন্ত্রশক্তিকে বেশী পছন্দ করে, এথেকে তারও খানিকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাঙ্গালী ভীরুজাতি নয়, বাঙ্গালীর শক্তি সর্বজনবিদিত। সেই বাঙ্গালীর শক্তি এই কালীর উপাসনা থেকে আহৃত বললে কোন অত্যুক্তি হয় না।

তা থেকেই জানতে পারা যায় যে তিনি তাঁর চাকরীর মেয়াদী সময় বাড়িয়ে নিয়ে কোম্পানীর কাজে লিপ্ত ছিলেন। এবং তখন থেকে তিনি পাটনা ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ও তাঁর বেতন বেড়ে যায়। জব চার্নক এই পাটনায় ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বহাল ছিলেন।

এই পাটনায় থাকাকালীন একদিন গঙ্গার তীরে বায়ুসেবন ও গঙ্গার শোভা দেখছেন। হঠাৎ একটি সতীদাহ চোখে পড়ে। তখন ভারতে সতীদাহ প্রথার হিড়িক্। জলজ্যান্ত মেয়েগুলোকে নিয়ে মৃত সব লোকগুলোর বুকে চাপিয়ে দিয়ে জীবন্ত ও মৃত একসঙ্গে আগুনে পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। ধর্মের নামে তখন হত্যালীলা চলছে পুরোদ্যমে এই দেশে।

চার্নক নদীর তীরে ভ্রমণকালে জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণে উদ্যতা পরমা সুন্দরী একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখতে পান। কন্যাটি পূর্ণ যুবতী। চার্নক তাঁকে দূর থেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রহরীগণের সাহায্যে সেই সহগমনোন্মুখ সতীকে উদ্ধার করে স্বগৃহে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে বিবাহ করেন। তখন ছিল ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ।

চার্নকের দাম্পত্য জীবনের মোটামুটী কাহিনী হচ্ছে এই। কিন্তু তখনকার দিনের বহুগুণী ব্যক্তি চার্নক সম্বন্ধে এই কাহিনী বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করেন নি চার্নক কোন সদুপায়ে ঐ ব্রাহ্মণ কন্যাকে পেয়ে ছিলেন।

তখনকার দিনের কয়েক জন লেখক বলেন— চার্নক ঐ মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে বলপূর্বক তাকে অধিকার করেছিলেন, আসলে চার্নক কোন ভাল কাজ করেন নি। মেয়েটির রূপ দেখে তাঁর তরুণমনে বাসনার বহ্নি জ্বলেছিল। তাই গভর্নর হেজেস তাঁর ডাইরীর একস্থানে লিখেছেন, 1682 Decr, this morning a gentoo sent by Bulchand Governor of hoogy and Cosimbazar made a complaint to me that Mr. Charnock did shame fully to the great scandal of our Nation keep a gentoo woman of his kindred, which he had done then 19 years. I was further infomed by this and divers other persons that when Mr. Charnock lived at pattana upon complaint made to the Nobob that he kept a gentoo's wife (her husband being still living, or but lately dead) who was run away from her husband and stollen all his money

and jewels to a great value the said Nabob sent 12 soldiers to seize Charnock &c. (Hedge's Diary)

আর একজন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত লেখক আলেকজাণ্ডা হ্যামিলটন বলেন কিন্তু অন্য কথা। তিনি বলেন মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার আগে চার্নক এক সতীদাহ দেখতে পান। তিনি সেই মরণোন্মুখ যুবতীর সৌন্দর্য দেখে এতদূর মোহিত হয়ে যান যে সিপাইদের সহায়তায় বলপূর্বক সেই রমনীকে আসন্ন মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করে নিজের ঘরে নিয়ে আসেন। তারপর বহুকাল সেই রমনীকে নিয়ে তিনি স্বামী-স্ত্রীর মত সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করেন। এমন কি চার্নকের যে কটি কন্যারত্ন জন্মেছিল তাঁর মধ্যে সবগুলিই এই হিন্দু পত্নীর গর্ভে।

চার্নকের এই হিন্দু রমনী প্রেম তখনকার অনেকেই ভাল চোখে দেখেন নি বলে নানা জনে নানা কথা তাঁকে নিয়ে বলেছেন। চার্নক কোম্পানীর স্বার্থের জন্যে অনেক অত্যাচার করেছেন মানুষের ওপর কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর এই দাম্পত্য প্রেমে কোন গলদ ছিল না বরং তিনি এই হিন্দু পত্নীর সঙ্গেই বহুকাল সংসার যাত্রা করে ছিলেন।

চার্ণকের এই হিন্দু পত্নী গ্রহণ ব্যাপারে বহু লোকেরই চার্ণকের ওপর রাগ সৃষ্টি হয়েছিল—বিশেষ করে একজন সাহেব হয়ে কি করে একজন বাঙ্গালী মেয়ে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘ কুড়িটা বছর কাটাতে পারেন—তখনকার দিনে চার্ণকের সম-সাময়িক বিদেশীরা কোন মতেই বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁর এই দাম্পত্যজীবন নিয়ে নানাজনে নানাকথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালে প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ রেণী, রেভারেণ্ড কেরি, কটন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ চার্ণকের এই দাম্পত্য জীবনকে সমর্থন করেছিলেন।

ভারতে ইংরেজ রাজলক্ষ্মীর প্রধান প্রবর্তক এই চার্ণক। কিন্তু ধর্ম্মান্ধ ইংরেজ চার্ণকের মধ্যে অখৃষ্টান আচরণের ইঙ্গিত দেখে তাঁকে একেবারে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা দয়া করে তাঁর নামটি কলকাতা প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে তাঁদের গ্রন্থে অবহেলাভরে স্থান দিয়েছেন মাত্র। আর বৃটিশ মিউজিয়ামের কিছু কিছু কাগজপত্র থেকে চার্ণক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়।

চার্ণক এই ব্রাহ্মণকন্যাকে বিয়ে করে খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন। এইজন্যে তাঁকে অনেক বলত—আধা-খৃষ্টান। তারও কারণ ছিল—চার্ণক তাঁর পত্নী মরবার পর প্রতিবৎসর মৃত্যু তিথিতে তাঁর গোরে

মোরগবলি দিতেন। পত্নীর প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য এই প্রথাটিকে তিনি আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই মোরগবলি প্রথাটি কেমন যেন শুনলেই চার্ণক সম্বন্ধে অন্য ধারণা মনে উদয় হয়। সেইজন্য তখনকার লোকেরা চার্ণক সম্বন্ধে নানাকথা বলেছিলেন—চার্ণক যে প্রথা অবলম্বন করেছেন—সে প্রথা হিন্দু প্রথা নয় এমন কি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যেও সে প্রথার চল নেই। কিন্তু আসল কথা জানতে পারা গেল—চার্ণক বহুকাল বেহার প্রদেশে ছিলেন। বেহার প্রদেশের লোকেরা পাঁচপীরের উদ্দেশ্যে এরূপ মোরগ বলি দেয়। চার্ণক হয়ত এই প্রথার অনুকরণ করেছেন শত্রুপক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করে তাঁকে অখৃষ্টান ইত্যাদি বলে গেছেন।

দোষত্রুটী মানুষ মাত্রে থাকে কিন্তু সবার উপরে চূর্ণ করা পত্নীপ্রেম তাঁর কর্মজীবনের আর একটা দিক্ উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি হিন্দু বা খৃষ্টান বলে পত্নীকে বিচার করেন নি, একটি মনের মত সঙ্গিনী পেয়ে তিনি তাঁর কর্মজীবনের কুড়িটা বছর পরম সুখে কাটিয়ে গেছেন। সেই পত্নীর জন্যে তাঁর মৃত্যু বাৎসরিকে সামান্য একটা মোরগবলি এ যে তার কাছে কত অমূল্য ছিল এই তিনশ বছর পরও তা অনুভূত হয়। তিনি তাঁর হৃদয়ের সবটুকু প্রেম-উজাড় করে পত্নীর সমাধিতে ঐ মোরগবলি দিতেন। ঐ মোরগবলির সঙ্গে কয়েক ফোঁটা অশ্রু দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন তার কান্নাভরা মনের স্মৃতি আজও সেই একটি নারীকে কেন্দ্র করে তাঁর মনে ব্যথা জাগায়।

চার্ণকের দুফোঁটা অশ্রু আর মোরগবলি তাঁর পত্নী প্রেমের নিদর্শন। ইতিহাস শুধু কলকাতার হিসাবে জব চার্ণকের নাম অক্ষয় করেছে কিন্তু তিনি যে একদিন এই ভারতের মাটিতে তার হৃদয়ের আর একটি দিক উন্মুক্ত করে প্রেমের একটি সম্পূর্ণ কাহিনী রচনা করে গেছেন সে কথা সেদিন ইতিহাস বিস্মৃত হলেও আজ আর হবে না। আজ শুধু নতুন করে চোখের ওপর ভেসে ওঠে সেই প্রেমিক চার্ণকের সর্তটি; আর মনে পড়ে, তার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণ কন্যাটি দীর্ঘ কুড়িটি বছর তাঁর সজল শ্যামল চোখের দুটি কাজলকালো দৃষ্টি নিয়ে নরম কোমল ভালবাসার স্বর্গ রচনা করেছিল তাকে।

সবদেশে সব নারীরাই প্রায় এক। বাঙ্গালী নারীর সঙ্গে ইংরেজ নারীর তফাৎ খুঁজলে ঐ গাউন আর শাড়ি ছাড়া কোন তফাৎই খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাঙ্গালী নারী যেমন দাবী করে, স্বামী তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে গিয়ে স্ত্রীকে সুখী করবার আমরণকাল চেষ্টা করুক তেমন ইংরেজ মহিলাদের ক্ষেত্রে সেই একইধারা স্বামীকে কেন্দ্র করে। আপনারা যতই ভাবুন ঐ সাদা চামড়া ও ববকরা টয়েলেট মুখী ইংরেজ মহিলারা অনেক বড় বড় হাই সোসাইটির হাই অ্যাম্বিসন নিয়ে তারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠা ; তবে আপনাদের ভুল ধারণা অবিলম্বে মুছে যাবে। আপনারা প্রায় একটি সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে সর্বকালের সর্বদেশের নারীদের মনের গতি প্রায় একই এবং অভিন্ন। সে ইহুদী হোক বা সাগর পারের রাজকন্যা হোক।

একটি ইংরেজ মহিলার মনের পরিচয় নিয়েই এ কাহিনীর প্রস্তাবনা। স্বামী তাঁর দেশকে ভালবেসে দেশের জন্য নিজের সৌভাগ্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে দেশকেই সারা বিশ্বের চোখে সৌভাগ্যশালী করে তুলেছিলেন, তার জন্য তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে তাঁকে অনেক গঞ্জনা শুনতে হয়েছিল। স্ত্রী দেখেছিলেন নিজের স্বার্থ কিন্তু স্বামী চেয়েছিলেন দেশের উন্নতি। এবং দেশকে ভালবেসে বৃহত্তর স্বার্থকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে সারাজীবন ধরে এই স্বামী বেচারার কপালে যে দুঃখ জুটেছিল তা কল্পনাও করা যায় না। স্ত্রীও সারাজীবন ধরে ভেবেছিলেন তার কপালে এমন অপদার্থ জোটালে কেন ভগবান? যে নিজেরটা না বুঝে, নিজের ঘরটা না বুঝে পরের ভাল করতে যায়। নিজে চিরদিন দরিদ্র হয়ে থেকে দেশকে করে দিল বিত্তশালী!

এমন কি এই মহিলাটি শেষ পর্যন্ত স্বামীর এই নির্বুদ্ধিতার জন্য বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়ে স্বামী মারা গেলে দ্বিতীয় স্বামীকে সঙ্গে করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেছিলেন। আবেদন করেছিলেন এই বলে

যে—আমার স্বামীর প্রাপ্য এখনো তোমরা দাও নি, আমি তাঁর ন্যায্য অধিকারিণী সুতরাং অবিলম্বে দেওয়ার ব্যবস্থা কর।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পাঠিয়েছিল যে তোমার স্বামী আমাদের কাছে কিছুই পায় না। সুতরাং তোমার কোন পাওনা আমাদের কাছে নেই।

কথাটা তাহলে খুলেই বলতে হয়।

যে ভদ্রলোকের স্ত্রী ইংরেজ সরকারের কাছে এমনি তাড়ুনি খেয়েছিলেন তিনি ইতিহাস বিখ্যাত ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বৌটনের স্ত্রী। ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বৌটনের নাম হয়ত ইতিহাস পড়ুয়ারা কেউ কেউ শুনে থাকবেন, তার কীর্তিকাহিনীর কথাও আজ আর একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে নেই তবে যারা এখনও তার নাম এবং তার কীতির বিষয় জানেন না তাদের জন্যই এই প্রস্তাবনা।

সারা ভারত জুড়ে যে এতদিন ইংরেজরা রাজত্ব করে গেল সেই সমগ্র ইংরেজ জাতির সাফল্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন এই ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বৌটন। নিজস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে স্বজাতি ও স্বদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত ইংরেজ চরিত্রে বিরল নয়। তবু বলতে দ্বিধা নেই যে গ্যাব্রিয়েল বৌটন ভারতে ইংরেজদের বাণিজ্য করবার সনন্দ যেভাবে গ্রহণ করে ইংরেজ জাতিকে ভারতে এনেছিলেন, সেদিনের তাঁর সে মানসিক ইচ্ছা ও মনবলের জন্য আজও তাকে স্মরণে আনলে চমকিত হতে হয়। গ্যাব্রিয়েল বৌটন সমগ্র ইংরেজ জাতির মধ্যে একটি মহৎ শক্তি এবং তাঁর কথা প্রতিটি ইংরেজের মনের মধ্যে চিরকাল জেগে থাকা উচিত। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ইংরেজ সরকারের কাছে পত্র লেখার উত্তর কি পেয়েছিলেন তাই থেকেই আপনারা অনুমান করতে পারবেন—গ্যাব্রিয়েল বৌটনও জাতির কাছ থেকে কতখানি সম্মান পেয়েছিলেন। একটি অবহেলিত ও অসম্মানিত মহৎ জীবনের দুঃখ নিয়েই এ কাহিনীর সুত্রপাত। তবে একটি কথা প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে যে, গ্যাব্রিয়েল বৌটন যেদিন জাতিকে সাহায্য করবার জন্যে বিশ্বের চোখে তুলে ধরবার জন্যে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি যে মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে-ছিলেন, তার বিনিময়ে তিনি জাতির কাছ থেকে কিছুই চাননি। তবে মহৎ কাজের জন্য মহৎ ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়া উচিত এবং সে সম্মানও যে ডাঃ বৌটনের প্রাপ্য ছিল সেইটুকু দেওয়া অন্ততঃ স্বদেশবাসীর উচিত ছিল। ঈর্ষাপরায়ণ ইংরেজ জাতির চরিত্রের এদিকটা লক্ষ্য করবার মত।

সে যা হক, বৌটনের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অর্ম (orme) ও ষ্টুয়ার্টের বক্তব্যই উল্লেখযোগ্য। অন্যতম বক্তা ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট তাঁর লিখিত "History of Bengal"-এ বলেছেন—"Having been desired to rame his reward, Boughton, with that liberality which characterises Britons, sought not for any private emolument but solicited that his nation might have liberty to trade free of all duties, to Bengal and to establish factories in that country."

"History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan" গ্রন্থের প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অর্ম ও বৌটনের সম্বন্ধে একই কথা বলেছেন। তাঁদের লিখিত বক্তব্য থেকেই সেদিনের বৌটনের কীর্তিকলাপের কাহিনী এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

১০৪৬ হিজিরায়। (১৬৩৬ খ্রীঃ), একদিন রাত্রে সম্রাট সাজাহানের প্রিয়তমা কন্যা জাহানারা অসুস্থ পিতার কক্ষ থেকে ফিরছিলেন হঠাৎ সরু অলিন্দের পাশে মশালের আগুনে তাঁর মসলিনের পাতলা ওড়নায় আগুন ধরে যায়। পাছে চীৎকার করে উঠলে পুরুষেরা ছুটে আসেন এবং জানানা ইজ্জত ক্ষুণ্ণ হয় এইজন্য সেই অগ্নিদগ্ধ, অবস্থায় নিজের মহালে গিয়ে উপস্থিত হন কিন্তু ততক্ষণে আগুন তাঁর সালোয়ার পাঞ্জাবীকে স্পর্শ করেছে।

তারপরদিনই বাদশাহের রংমহলে শোকের ছায়া পড়ে গেল। সাজাহানের প্রিয়তমা কন্যা সাহাজাদা মৃত্যুশয্যায়। আনন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রাজ-প্রাসাদ থেকে। নিঃশব্দ বিচরণে চলাফেরা করতে লাগল আমীর ওমরাহ, বাঁদী, বাদশাহ। রাজ বৈদ্য জাহানারাকে পরীক্ষা করে নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন, প্রাণের আশঙ্কা প্রায় খুবই কম। চারিদিকে ঘোড়সওয়ার ছুটল। ভাল হাকিম চাই। লাহোর থেকে এল দক্ষ একজন হাকিম। কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না। এদিকে জাহানারা দগ্ধ ক্ষতের যন্ত্রণায় আছাড়ি পাছাড়ি করছে। তাঁর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল।

তখন সুরাটের শাসনকর্তা ছিলেন আসালত খাঁ। আসালত খাঁ সম্রাটের প্রিয়তমা কন্যার রোগের চিকিৎসার জন্য ডাঃ বৌটনকে অনুরোধ করলেন। কারণ তখনকার দিনে ডাঃ গ্যাব্রিয়েল বৌটন ছিলেন কোম্পানির একজন দক্ষ চিকিৎসক। কোম্পানির "হোমওয়েল" জাহাজের ডাক্তার ছিলেন তিনি।

গেব্রিয়েল বৌটন আসালত খাঁয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে জানালেন—তিনি যাবেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন বাদশাহ কন্যা সাহজাদা জাহানারাকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে আনবার। সুরাট থেকে আগরায় ছুটল এক দ্রুতগামী শ্বেত অশ্ব—তার পিঠে সওয়ার গ্যাব্রিয়েল বৌটন। বৌটন আগরার রাজধানীতে পৌছে প্রথমেই পরীক্ষা করলেন জাহানারাকে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা ডাক্তার বৌটনের। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুপথ থেকে জাহানারা এ পৃথিবীতে ফিরে এল। ডাক্তার বৌটনের কথাবার্তা ও স্বভাবটি ছিল খুব মিষ্ট। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এবং সম্রাটপুত্র সাহাজাদা সুজার সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হল। তখন ছিল ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিক। এরপর এই সাহ সুজাই পরে বাংলার শাসনকর্তা হয়েছিলেন এবং তখনকার কাগজপত্র থেকে জানতে পারা যায় যে বৌটন সাহ সুজার রাজমহলেরাজোচিত সম্মানে থাকতেন। এবং আস্তে আস্তে তাঁর সম্পূর্ণ মন জয় করে ফেলেছিলেন।

জাহানারাকে রোগমুক্ত করার পর সম্রাট সাজাহান সন্তুষ্ট হয়ে বৌটনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—বিদেশী, আমার কন্যার প্রাণরক্ষার বিনিময়ে তুমি কি চাও? সে সময় ইচ্ছে করলে বৌটন নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে নিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেন নি, তার পরিবর্তে তিনি সে সময় চুপ করেই ছিলেন। বৌটনের চুপ করে থাকা দেখে সম্রাট-সাহ সুজাকে দেখিয়ে বলেছিলেন—বেশ তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি সুজার কাছ থেকে চেয়ে নিও।

সেদিন ডাক্তার বৌটন সমগ্র ইংরেজ জাতির কথা চিন্তা করেছিলেন। গভীরভাবে ভেবেছিলেন বলেই আজ ইতিহাসের এই পরিবর্তন। তিনি তিন হাজার মুদ্রা নজরানা দিয়ে সম্রাটপুত্র সাহ সুজার কাছ থেকে বঙ্গদেশের সর্বত্র বিনা শুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্যের অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। এই অনুমতিপত্রের বলে ইংরাজগণ বাংলার সর্বত্রই অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পায়। হুগলী ও বালেশ্বরে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে সোরা কিনতে পারবে—এরূপ আদেশও এই অনুমতিপত্রে ছিল।

বিলাতে কর্তাদের টনক নড়ল। তাঁরা বুঝলেন—দিনেমাররা গাঙ্গ্যপ্রদেশে বাণিজ্য করে যথেষ্ট ফল পাচ্ছে—তখন তাঁদের মনে বঙ্গদেশে ফ্যাক্টরী বা বাণিজ্যাগার খোলবার প্রবল ইচ্ছা জাগল। আর সেই ভেবেই বিবিধ বাণিজ্য দ্রব্যপূর্ণ "লিয়নেস" নামে একখানি জাহাজ ভারতে প্রেরিত হল।

২২শে আগষ্ট ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে "লিয়নেস" জাহাজ মাদ্রাজে নোঙ্গর করল। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের প্রথম জাহাজ এটা। মাদ্রাজ ফ্যাক্টরীর কর্তারা পরামর্শ করলেন যে নবাগত জাহাজখানি সরাসরি হুগলীতে না পাঠিয়ে বালেশ্বরে নোঙ্গর করা হোক। কারণ চারিদিকের পরিস্থিতি না দেখে হঠাৎ হুগলীতে যাওয়া ঠিক হয়ে উঠবে না। পথে চারিদিকে লুকিয়ে দিনেমার জলদস্যুরা বিচরণ করছে। তাদের হাতে গেলে শুধু প্রাণ নয় বিরাট ব্যবসায়ী ক্ষতি। সেই অনুমানে তাঁরা কজন ফ্যাক্টরকে পাঠালেন হুগলীতে গিয়ে সুযোগ সুবিধে দেখে আসতে। তারপর কাপ্তেন ব্রুক হাভেনের অধীনতায় কয়েকজন ফ্যাক্টর 'লিয়নেস' জাহাজ নিয়ে বঙ্গদেশে অগ্রসর হলেন। সোরা, চিনি, রেশম প্রভৃতি এই তিনটি জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর উপদেশানুযায়ী বিজম্যান ও ষ্টিফেন্স নামক দুইজন ফ্যাক্টর ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের চেষ্টা করেন।

কিন্তু সবকিছুর মূলেই এই গ্যাব্রিয়েল বৌটন। তিনি যদি উৎসাহী না হয়ে নিজের পুরস্কারের পরিবর্তে এই অনুমতিপত্র না নিতেন তাহলে এত তাড়াতাড়ি হয়ত ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যের সূত্রপাত হত না। ভারতে ইংরেজ বাণিজ্যাগার স্থাপিত হত না। আরও বহুকাল ইংরেজকে এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে হত। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব করার তারিখ পিছিয়ে রচনা হত। কিংবা আদৌ হত কিনা তারও ঠিক নেই।

জব চার্ণককে যেমনি কলিকাতা প্রতিষ্ঠাতা বলে আমরা পরিচিত করে রেখেছি কিন্তু সেদিন জব চার্ণক শুধু কলিকাতাকেই আবিষ্কার করেন নি ইংরেজ বাণিজ্যের স্থায়ী আসন্ন তৈরী করে দিয়ে রাজত্বের সূচনা করে গিয়েছিলেন; তেমনি গ্যাব্রিয়েল বৌটন। ডাঃ বৌটন শুধু স্বার্থত্যাগ করেই জগতে নাম রেখে যান নি তিনি ইংরেজ বাণিজ্যের প্রথম সূত্রপাত করে ইংরেজ জাতিকে ভারতে রাজত্ব করবার প্রথম ইঙ্গিত করে গেছেন। সেইজন্যে ভারতে ইংরেজ ইতিহাসের প্রথম পাতায় গ্যাব্রিয়েল বৌটনের নামটা থাকা উচিত। কিন্তু মিসেস গ্যাব্রিয়েল বৌটনের খেদোক্তি থেকেই বুঝতে পারা যায়, মিঃ বৌটন শেষ জীবনে কোন দিক থেকেই লাভবান হন নি—না স্ত্রী, না ইংরেজ সরকার, না ইংরেজ জনসাধারণ। ঘরে ও বাইরের এই অশান্তির মধ্যে দিয়ে সে মানুষটি ইতিহাসে যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, অন্তত ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা তাঁর সে অমূল্য দানের কথা কখনও বিস্মৃত হবে না।

এই নিবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :—

"History of the Military Transactions of the British Nation in Indostan" by Orme. "History of Bengal" by Stewart.

চোদ্দ বছরের স্বাধীনতা প্রাপ্তির গোড়াপত্তন সেই চারশো বছর আগে। চারশো বছর ধরে চলে আসছে পরাধীন জাতির মনে স্বাধীন হওয়ার প্রচেষ্টা। সেদিনের সেই কাহিনী রক্তাক্ষরে লেখা আছে দেশের জাতির ইতিহাসের প্রতি ছত্রে ছত্রে। প্রতাপাদিত্য তার নাম।

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে তথা দিল্লীশ্বর শাহনসা আকবরের দোর্দণ্ড প্রতাপকে চূর্ণ করে সামান্য এক ভূইঞা প্রতাপাদিত্য সমগ্র বঙ্গদেশকে স্বাধীন রাজার রাজ্যভূমি করার আশায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আজ এই চারশো বছর পরে সে কথা ভাবতে গিয়ে বার বার হতচকিত হতে হয়। সমগ্র ভারত জুড়ে মোগল সাম্রাজ্য। মোগল সাম্রাজ্যের হাল-ধরে বসে আছেন বাদশাহ আকবর।

বিদ্রোহ দমনে তাঁর ক্ষমতা অসীম। বঙ্গেশ্বর দায়ুদ মোগল পাঠানে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে মজা দেখলেন। দিল্লীশ্বর আকবর পাঠানগণের উচ্ছেদের জন্য খাঁজাহান-হোসেন-কুলী, মজঃফর খাঁকে প্রেরণ করলেন। মজঃফর খাঁর সঙ্গে শেষযুদ্ধে দায়ুদ নিহত হলেন। তাঁর ছিন্নমুণ্ড আকবর শাহ দেখে নিশ্চিত হলেন।

নতুন করে বঙ্গদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য দিল্লীশ্বর আকবর মহারাজা টোডরমলকে বঙ্গদেশে পাঠালেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল বঙ্গদেশে এলেন।

রাজা টোডরমল শান্তির জন্য বাদশাহের সাধারণ প্রজাবর্গের সুখ স্বচ্ছান্দ্য বৃদ্ধি ও জমিদারদের সরকারের খাজনা আদায়ের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করেন। মহারাজ টোডরমল ঘোষণা করে দেন, "যাঁরা ভূতপূর্ব পাঠান নৃপতিদের আমলে, রাজকার্য পরিচালনা করে যশস্বী হয়েছেন, তাঁরা বিনা সঙ্কোচে বিনা ভয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন। দায়ুদের মন্ত্রীদ্বয় বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হতে বাড়ি ছেড়ে সন্ন্যাসী বেশে বরেন্দ্র-ভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। অনুচরের মুখে টোডরমলের অভয়বাণী শুনে দুই ভাই রাজমহলে টোডরমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

রাজা টোডরমল গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে যথেষ্ট অবগত হয়ে প্রচুর বিত্তদানে সম্মানিত করেন। দিল্লী দরবার থেকে সনদ আনিয়ে মহারাজা টোডরমল উভয় ভ্রাতাকে যশোরের পশ্চিমভাগে গঙ্গানদী ও পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিমভাগ এই বৃহৎ সীমা-সমম্বিত রাজ্য প্রদান করেন। বিক্রমাদিত্য এক বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। বিক্রমাদিত্য যশোহরের কায়স্থ সমাজের অধিপতি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জঙ্গল-কাটান, যশোহর-অট্টালিকা, বিপনী, হাট, চত্বর প্রভৃতিতে দিনে দিনে শোভা-সৌন্দর্যময়ী হল। রাজ-দরবারে প্রচুর সম্মান, সমাজে একাধিপত্যভাণ্ডারে লক্ষ্মী অচলা, সুখের আর শেষ নেই।

এই মহামানব রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র স্বাধীনতাকামী প্রতাপাদিত্য। গৌড়নগরীতে যখন ভয়ানক রাষ্ট্রবিপ্লবের হিড়িক, সেই সময় প্রতাপাদিত্যের জন্ম। বাল্যকালে প্রতাপ, গৌড়নগরে পারস্য-ভাষা শিক্ষা করেন। যশোরে রাজধানী নির্মিত হলে তিনি পরিজনবর্গের সঙ্গে যশোরে আসেন। উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে, অস্ত্রবিদ্যা, মল্লবিদ্যা অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করে— প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। বাল্যকালে পণ্ডিতগণ প্রতাপের ঠিকুজি-কোষ্ঠী দেখে বলেছিলেন "মহারাজ! এই বালক পিতৃদোহী হইবে।"

ইতিহাসে আর দুটি নামও চিরস্মরণীয়। প্রতাপের দু'জন বাল্যসঙ্গী তাঁর চিত্তবৃত্তির পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করেছিলেন। এবং সর্বদা কাছে কাছে থাকিতেন। একজন শঙ্কর চক্রবর্তী ও অপরজন সূর্যকান্ত গুহ। প্রতাপের সঙ্গীদ্বয় ও তাঁরমত সাহসীও বলদর্পিত ছিলেন।

তখন আগ্রার রাজদরবারে বাঙ্গলার সকল করদাতা ভূস্বামীকে একজন করে উকিল রাখতে হত। যশোর রাজসংসারেরও একজন প্রতিনিধি রাখতে হত। বিক্রমাদিত্য তাঁর উদ্ধত পুত্রকে এই আগ্রাতে পাঠাতে মনস্থ করলেন কারণ তাঁর মনে পণ্ডিতগণের ভবিষ্যদ্বাণীই গেঁথে গিয়েছিল। বসন্তরায় বিক্রমাদি্যতের মন-অভিপ্রায় বুঝে তাঁকে নিষেধ করলেন এরূপ কাজ না করার জন্য। কিন্তু বিক্রমাদিত্য ভাইকে বোঝালেন—"এতে প্রতাপের ভাল হবে। সম্রাট আকবর-শাহ গুণগ্রাহী। যদি প্রতাপ কোনরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারে তাহলে বাদশাহের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে।"

নির্ভীক হৃদয় প্রতাপ পিতা ও পিতৃব্যের আদেশ মাথা পেতে নিয়ে শঙ্কর ও সূর্যকান্ত প্রভৃতি অন্যান্য অনুচর সহযোগে আগ্রা যাত্রা করলেন। সেদিন

যদি বিক্রমাদিত্য পুত্রকে নির্বাসিত না করে ঘরে বন্দী করে রাখতেন তাহলে বাঙ্গলায় এই বিদ্রোহের সূচনা হয়ত এত তাড়াতাড়ি হত না। ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি আকবরের অতি কাছে গিয়ে প্রতাপের মাথায় জেগে উঠলো—সে ইচ্ছা করলে এই লোকটিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে মোগল সাম্রাজ্যকে ধূলিস্যাৎ করে স্বাধীনতা আনতে পারে।

আগ্রায় অবস্থান কালে অনেক পদস্থ আমীর ওমরাহদের সঙ্গে প্রতাপের আলাপ পরিচয় হয়। ভাগ্যক্রমে একদিন বাদশাহ এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ ঘটলো। আকবর শাহ সভাসদগণকে মধ্যে মধ্যে এক একটি সমস্যা পূরণ করতে দিতেন। একদিন প্রতাপ রাজসভায় উপস্থিত—এমন সময়ে বাদশাহ তাঁর পার্শ্ববর্তী আমীর ওমরাহদের বললেন "সেত ভুজঙ্গিনী যাত চল হে" এই সমস্যা পূরণকর। তাঁর পার্শ্ববর্তী কবি ও পণ্ডিত সভাসদগণ বাদশাহ প্রদত্ত সমস্যাটি প্রত্যেকেই বিভিন্ন·ভাবে পূরণ করলেন কিন্তু বাদশাহের পছন্দ হল না।

প্রতাপও মনে মনে এই সমস্যাটা আলোচনা করছিলেন। তিনি বাদশাহের অপরিচিত। অতি নম্রভাবে দিল্লীশ্বরের সন্নিহিত হয়ে সসম্মানে কুর্নীশ করে প্রতাপ বললেন—"জাঁহাপনা! অনুমতি করলে আমি এই পদটি পূরণ করতে পারি। বাদশাহ বিস্মিত হয়ে গৌরকান্তি সমুন্নতকায় বাঙ্গালী যুবকের দিকে তাকিয়ে সম্মতি দিলেন। প্রতাপের পদ শুনে বাদশাহ মহা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বহুমূল্য দ্রব্য দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। এইভাবে প্রতাপের সঙ্গে বাদশাহের প্রথম আলাপ।

তারপর বহুদিন গত হয়ে গেল প্রতাপ অস্থির হয়ে উঠলেন। তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত হওয়ার আশু কোন সম্ভাবনা না দেখে তিনি আকবরের শাসনপদ্ধতি দেখবার জন্যে দূর-দূরান্তর দেশ ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। এমন কি পাঞ্জাব, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে ভ্রমণ করে এলেন। আকবর শাহের শাসন নীতি ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

একদিন প্রতাপ এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন। যশোর থেকে যে রাজস্ব সম্রাট সরকারে আসতো তা তিনি বন্ধ করে দিলেন। যশোর থেকে রাজস্ব না আসার কথা বাদশাহের কানে উঠলে তিনি প্রতাপকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা যশোরের খাজনা প্রেরণ বন্ধ করলেন কেন? প্রতাপ বিনয়ের সঙ্গে বললেন জাঁহাপনা আমার পিতৃদেব রাজ কার্য থেকে

অবসর নিয়েছেন। এখন খুল্লতাত বসন্তরায়ের ওপর রাজ্যভার ন্যস্ত। জানিনা কি গূঢ় উদ্দেশ্যে চালিত হয়ে আমার খুল্লতাত আগ্রায় কর প্রেরণে এইরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করছেন। তাছাড়া যশোর রাজ্যে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হয়েছে—খাজনাপত্র আদায় হচ্ছে না।

আকবর শাহ, কিছুক্ষণ চিন্তার পর বললেন—"প্রতাপ! তুমি যদি সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কোন উপায়ে যোগাড় করে দিতে পার, তাহলে আমি তোমাকে যশোরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবো।

প্রতাপের মনের গূঢ়বাসনা সিদ্ধ হল। তিনি বাদশাহকে কুর্ণীশ করে কয়েকদিন সময় চাইলেন। বাদশাহ সময় দিলেন। আগ্রার অনেক আমির ওমরাহ তাঁর বন্ধুস্থানীয় হয়েছিলেন। তাঁরা প্রতাপকে অর্থ সাহায্য করলেন।

সম্রাট প্রতাপের প্রদত্ত রাজস্ব থেকে তিন লক্ষ টাকা তাঁকে প্রত্যর্পণ করলেন। তাঁর আদেশে তখনই বাদশাহী আজ্ঞাপত্র বা রাজ্য প্রদানের "ফারমান" প্রস্তুত হল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ফারমানের প্রতিলিপি বঙ্গদেশে প্রেরিত হল।

কেবল বাদশাহী ফারমান নয়, প্রতাপ বাদশাহের অনুমতি নিয়ে সেনা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি বাদশাহকে বোঝালেন, হঠাৎ রাজ্যোপাধি নিয়ে দেশে উপস্থিত হলে এবং রাজ্য দখল করবার চেষ্টা করলে পিতৃব্য বসন্ত রায় কোনরূপ বাধা প্রদান করতে পারেন। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে তিনি দ্বাবিংশতি সহস্র সেনা সমভিব্যাহারে আগ্রা পরিত্যাগ পূর্বক কাশীধামে উপস্থিত হলেন।

বারানসী ত্যাগ করে নানা দেশে ভ্রমণ করে প্রতাপ অবশেষ যশোহরের সন্নিকটস্থ হলেন। তাঁর অধীনস্থ বিপুল-বাহিনী, পূর্ব থেকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত করে নগর অবরোধ করলেন। মহারাজা বিক্রমাদিত্য পুত্রের এই অদ্ভুত ব্যাপারে বিরক্ত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রতাপের শিবিরে উপস্থিত হলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে এইভাবে শিবিরে দেখে প্রতাপ বড়ই লজ্জিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হলেন।

বিক্রমাদিত্য পুত্রকে অনুতপ্ত দেখে তাঁর সব অপরাধ মার্জনা করলেন। এবং যশোরের রাজ্যভার পুত্রের হাতে অর্পণ করে তাঁরা ঈশ্বরোপাসনায় মন দিলেন। যশোরকে একটি সুরক্ষিত ও শক্তিমান রাজ্যে পরিণত করবার জন্যে প্রতাপ উপায় অবলম্বন করলেন। তাঁর আদেশানুসারে তাঁর অধিকৃত স্থানসমূহের চারিদিকে অনেকগুলি দুর্গ নির্মিত হল। রজ নামক একজন

পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি তত্ত্বাবধানে এই সমস্ত দুর্গ নির্মিত হয়। দুর্গগুলি মৃত্তিকা নির্মিত হলেও শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার বিশেষ উপযুক্ত ছিল। যতদূর জানতে পারা গেছে তা থেকে আমরা প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সাতটি দুর্গের নাম পাই। মাতলা রায়গড় (বর্তমান গার্ডেন রিচ) টালা, বেহালা, সালকিয়া, চিতপুর, আটপুর, (মূলাযোড়) প্রভৃতি সাতটি স্থানে এই সপ্তদুর্গ নির্মীত হয়। অশ্বারহী, পদাতিক, তীরন্দাজ, বেলদার (শ্রমজীবী) ও গোলন্দাজ প্রভৃতি কোনপ্রকার সৈন্যের অভাব ছিল না। দুই এক বৎসরের মধ্যে সমগ্র ভারতে যশোরের যশঃ প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়।

প্রতাপাদিত্যের প্রথম শক্তি পরীক্ষা পরমারাধ্য দুই দেবতা উৎকল-বাসীদের বিগ্রহ চুরি এবং সেইজন্যে উৎকল রাজগণের সঙ্গে যুদ্ধ। সুবর্ণ রেখার তটভূমে বাঙালীর প্রথম শক্তি পরীক্ষা ব্যাপারে প্রতাপই জয়ী হলেন। উৎকল রাজা পরাজিত হলে প্রতাপের যশঃগৌরব বঙ্গের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এর পরই প্রতাপ, যশোরেশ্বরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সময় থেকে সকলেরই মনে বিশ্বাস জন্মাল যে, প্রতাপাদিত্য নিশ্চয়ই ভবানীর বরপুত্র। তা না হলে যশোরেশ্বরী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ করলেন কেন?

প্রচুর সেনাবলে বলীয়ান প্রতাপাদিত্য এই সময়ে ধূমঘাটে একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করলেন। পাঁচ বৎসর কালের পর এই দুর্গের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। দুর্গটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে পঞ্চক্রোশ মৃন্ময় প্রাকারে পরি-বেষ্টিত হয়ে এই দুর্গ খুব সুদৃঢ় ছিল। তার চারদিকে অনলবর্ষী কামানশ্রেণী। এরূপ জনশ্রুতি যে, এই ধূমঘাটের মধ্যে আরও চারিটি গুপ্ত দুর্গ নির্মিত হয়। প্রত্যেক দুর্গ সমরূপে দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত।

তারপর বর্ধিত-প্রতাপ উপর্য্যুপুরি কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে, মত্ত যুদ্ধাশ্বের মত অস্থির হয়ে উঠলেন মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করে শক্তি পরীক্ষার উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করতে লাগলেন। তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি ও অমাত্যগণের সঙ্গে একদিনের মন্ত্রণাতেই স্থির হল যে, তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ প্রিয় সুহৃদ শঙ্কর দেশে দেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করে দেশবাসীগণকে তাদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝিয়ে দেবে, তাদের প্রাণে স্বাধীনতা প্রয়াস উদ্দীপ্ত করবে। তাদের একতাসূত্রে আবদ্ধ করে এমন এক বিরাট শক্তির সৃষ্টি

করবেন যাতে সমগ্র বঙ্গদেশ মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে পারে। এই দুরূহ কার্যসাধনের জন্য সাহসে ভর করে শঙ্কর নানাদেশে ভ্রমণ করতে লাগিলেন। এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি সুদূর মিথিলায় উপস্থিত হলেন। সমস্ত দেশকে শক্তিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে শঙ্কর সকলের চক্ষে পূজ্য ও বরেণ্য হয়ে পড়লেন। বাঙালী শঙ্কর চক্রবর্তীকে বীর্যবাণ মৈথিলিগণ গুরুর ন্যায় মান্য করতে লাগলেন।

এই প্রসঙ্গে আজকের স্বাধীন দেশের কথা স্মরণ করতে হয়। চারশো বছর আগের সেই বাঙালীদের মধ্যে স্বাধীনতার সেই প্রচেষ্টা যে কত উদগ্র ছিল প্রতাপাদিত্য তথা শঙ্কর চক্রবর্তীর কার্য বিবরণী তার প্রমাণ।

শঙ্কর চক্রবর্তী দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা প্রয়াস জাগাতে জাগাতে রাজমহলে গিয়ে উপনীত হন। রাজমহলের শাসনকর্তা মোগল কর্মচারী শের খাঁর দ্বারা শঙ্কর কারারুদ্ধ হন। অপরাধ—রাজকর্মচারীগণের কর্তব্য কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। কিন্তু শের খাঁ বেশীদিন শঙ্কর চক্রবর্তীকে কারারুদ্ধ করে রাখতে পারলেন না। একদিন শঙ্কর চক্রবর্তী পলায়ন করলেন। এই শের খাঁকেই প্রতাপ প্রথম পরাজিত করে বিরাট মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন। এই সংবাদ যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হল, তখন বঙ্গের দ্বাদশ-ভৌমিকদের অনেকেই মহা-সাহসী হয়ে মোগলের উপর অত্যাচার আরম্ভ করলেন।

প্রতাপাদিত্য-চরিতে লেখা আছে—এই সময়ে সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে মোগল সম্রাটের অনিষ্ট চেষ্টা করতে ত্রুটি করেন নি। কেউ বা দিল্লীগামী মোগল রাজকোষ লুণ্ঠন, কেউ বা মোগল সেনানিবাসে অগ্নি প্রদান, কেউ বা অল্পসংখ্যক মোগল সৈন্যকে দল বেঁধে আক্রমণ, কেউ বা মোগলদের যাতায়াতের পথে রাস্তা-ঘাট-পোল-সমূহ ভেঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে অনিষ্ট সাধন করতে লাগলেন। সময় বুঝে, বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়ও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই সময়ে সমগ্র বঙ্গ এক প্রাণে স্বাধীনতার জন্য মোগল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল।

প্রতাপের শৌর্যবীর্যের কাহিনী পরিশেষে সম্রাট দরবারে আকবর শাহের কানে পৌছলো। আকবর শাহ প্রতাপের এই স্পর্ধার কথা শুনে ইব্রাহিম খাঁ নামক একজন মোগল সেনাপতিকে সৈন্য সমেত বঙ্গদেশে প্রতাপ দমনে পাঠালেন।

ইব্রাহিম খাঁ সর্বপ্রথমে রায়গড় অবরোধ করলেন। এই রায়গড় দুর্গ

কলকাতার দক্ষিণে কোনও স্থানে ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই রায়গড় বেহালা বরিষার কাছে। তবে রাজা বসন্তরায়ের জমীদারভুক্ত ছিল এই বেহালা ও তৎসমীপবর্তী স্থানগুলি।

এদিকে ইব্রাহিম খাঁ রায়গড়ে বৃথা সৈন্যক্ষয় অবিবেচনার কাজ ভেবে সেখানে অল্প সংখ্যক সৈন্য রেখে মাতলা দুর্গ অবরোধ করবার জন্যে অগ্রসর হলেন। এখানে খাঁ সাহেব খুব সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। প্রতাপের দলবল রায়গড়ের মত দারুণভাবে তাদের আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন। 'সংগ্রামপুর' নামে এক স্থানে এই ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রতাপের রণকৌশলে ইব্রাহিম খাঁ সম্পূর্ণ পরাজিত হন। শক্তিশালী মোগল সেনা বিধ্বস্ত করে প্রতাপের যুদ্ধ নেশা প্রবল হয়ে উঠে। প্রতাপ পাটনা ও রাজমহল আক্রমণ করে করায়ত্ত করেন। ভারত সম্রাট আকবর শাহ এই সংবাদে ভীষণ ক্রোধান্ধ হয়ে সুদক্ষ মোগল সেনাপতি আজিম খাঁকে প্রতাপ দমনে পাঠান। আজিম খাঁ শক্তিশালী মোগল সেনা নিয়ে কয়েকমাস ক্রমাগত কুচকাওয়াজ করে কলকাতার কাছে শিবির স্থাপন করেন। প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত লেখকের মতে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রায় বিংশতি সহস্র মোগল সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। যুদ্ধের পর প্রতাপের রাজকোষে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধোপযোগী সামগ্রী ও নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজকোষ পূর্ণ হয়

এই ভীষণ পরাজয় সংবাদ যখন দিল্লীশ্বর আকবরের কাছে পৌছল তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তাঁর সভাসদ বিশেষ গণনীয় দ্বাবিংশতি জন আমীরকে অসংখ্য সৈন্য সমেত প্রতাপের দমনের জন্য বঙ্গদেশে প্রেরণ করলেন।

এর পর বঙ্গদেশে ভীষণ বর্ষা নামলো। কয়েকদিন ধরে অনবরত প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত দেশ জলে পূর্ণ হয়ে গেল। এই ভীষণ সময়ে উপযুক্ত অবসর বুঝে প্রতাপ চারিদিকে শত্রুশিবিরে আক্রমণ করলেন। বসিরহাটের অপর পারে ইছামতী তটে এই লোকক্ষয় কর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। এই পরাজয় সংবাদ যখন দিল্লীতে পৌছল তখন আকবর শাহ মৃত্যুশয্যায় "দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" আকবর শাহ চিরতরে চোখ বুজলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সাহাজাদা সেলিম "জাহাঙ্গীর" নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন।

জাহাঙ্গীর বঙ্গদেশের বিদ্রোহ দমনের জন্য মান সিংহের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে বঙ্গদেশে পাঠালেন। এই মানসিংহই পরে যশরোধিপতি প্রতাপাদিত্যকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে

:গেলে আর এক কাহিনী উম্মোচন করতে হয় তবে মানসিংহ যে কৌশলে প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন তা বঙ্গদেশের বিশ্বাসঘাতকতা। তখন অনেকেই প্রতাপকে পরাজিত করবার জন্য মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন।

কেন করে ছিলেন সে কথা চিন্তা করলে মুর্শিদাবাদ নবাব সিরাজদোল্লার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী স্মরণ করতে হয়। স্বাধীনতা প্রয়াসী প্রতাপকে বন্দী করে মানসিংহ শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে নিয়ে যেতে পারেন নি—কাশীধামের পথে প্রতাপ ইহলীলা সম্বরণ করেন। অনেকের মতে ১৬০৬ খৃঃ বা ১০১৫ হিজরী ছিল তখন।

এই প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কয়েকটি পংক্তি লিপিবদ্ধ করতে হয়।

'যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হল্‌কা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥

কথিত আছে প্রদাপাদিত্য পরাজিত হওয়ার আগে যশোরেশ্বরী দেবী প্রতাপের ওপর বিমুখ হয়ে যশোর থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিলেন।

[জনসেবক, ১৫ই আগষ্ট ১৯৬১

তখনকার দিনের ইংরেজরা এদেশে যেমন এসেছিলেন ধনরত্নের লোভে তেমনি এসেছিলেন এদেশের মেয়েদের রূপ-সৌন্দর্যের খবর পেয়ে। এবং সেইজন্যে দিন দিন যত তাঁরা এখানে কায়েমী করে বসেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকেছেন এদেশের মেয়েদের ওপর বিশেষ করে যখন তাঁরা নবাবদের হারেমে দেখলেন অপরূপ সব সুন্দরী বেগম ও বাঁদী। লোভের চোখ, তখন থেকেই তাঁদের লোভাতুর হয়ে উঠল। লোভাতুর মনে তাঁদের গেঁথে থাকল শুধু রাজ্য নয় তার সঙ্গে নবাবদের হারেমের সুন্দরী নারীগুলির হৃদয়াধিকারের আশা। তারপরের ঘটনা অবশ্য ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে একের পর এক নবাব সিংহাসনচ্যুত হয়ে গঙ্গা-যমুনা-ভাগীরথীর জলে মিশে গেছে আর ইংরোজরা তাদের হারেম থেকে বের করে এনেছেন বেগম ও বাঁদীদের। তাঁদের নিয়ে প্রমোদ-উদ্যানের শোভা বর্ধন করে বিলাসের পঙ্কে ডুবে গেছেন। তখনকার দিনে এই কলকাতার বুকেই ছিল কত বাগান বাড়ী।

ইতিহাসে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের চরিত্রটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ-যোগ্য এই জন্যে যে মীরজাফরের প্রণয়িনী মনি বেগম হেষ্টিংসের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। হেষ্টিংসও এই নারীর রূপতৃষ্ণা ভোগ করে বিনিময়ে কতকগুলি-সুবিধে দান করেছিলেন। আর কোম্পানীর ও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়ে ছিলেন (Barke's speech in Impeachment of Warren Hasting দ্রষ্টব্য)। হেষ্টিংসের জীবনে শুধু মণি বেগমই ছিল না, এমন অনেক নারী তাঁর জীবনে এসেছিল যে কথা ইতিহাসে লেখা নেই। সেইজন্যে ঐতিহাসিকরা হেষ্টিংসের চরিত্রের কয়টি প্রমাণ পেয়ে ধারণা করে নিয়েছিলেন যে এই ইংরেজ পুরুষটি কোন স্বচ্চরিত্রের প্রয়োজন মনে করেন নি। কলকাতায় থাকাকালীন প্রতিরাত্রে তাঁর যে নতুন নতুন অভিসার রচনা হত তার একটি পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করলে একটি সুন্দর রোমান্টিক উপন্যাস রচনা হয় নিঃসন্দেহে। সে যাই হউক হেষ্টিংসের চরিত্রই শুধু নয় তখনকার দিনে এ দেশে যে সব ইংরেজরা

এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র নিয়ে কিছু না কিছু ঘটনা কলকাতার পথের প্রাচীন ধুলোর হৃদয়ে জমা হয়ে আছে।

তার মধ্যে একটি চরিত্র স্যার ফ্রান্সিসের। ফিলিপ ফ্রান্সিস ছিলেন হেষ্টিংসের পরম শত্রু—এ কথা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কাউন্সিলের সদস্য হয়ে যে কজন বিলাত থেকে এ দেশে এসেছেন—তাঁর মধ্যে ফিলিপ ফ্রান্সিস ছিলেন অন্যতম। ফ্রান্সিস ছাড়া আরও দুজন একসঙ্গে একই জাহাজে এসেছিলেন—জন ক্লেভারিং ও কর্নেল জর্জ মন্‌সন। ফিলিপ ফ্রান্সিস সব সময়েই মনে করতেন তিনি সবার চেয়ে বড় এবং সম্মানী। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যখন তিনি সঙ্গী ক্লেভারিং ও মন্‌সনের সঙ্গে জাহাজ থেকে "চাঁদপাল ঘাটে" নামলেন তখন তাঁদের সম্মানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে তোপধ্বনি করা হল। ফ্রান্সিস চাঁদপালঘাটের কাঠের পাটাতনে দাঁড়িয়ে এক দুই করে তোপধ্বনিটি গোণবার পর তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেলেন তার কারণ, তিনি জানতেন হেষ্টিংসের সম্মানার্থে কতগুলি তোপধ্বনি করা হয়েছিল এবং তার চেয়ে যে তিনি কম সম্মানী,—কম তোপধ্বনি শুনে তিনি মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

আর এরপর থেকেই সুরু হল হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্ব। এবং পরবর্তীকালে বিখ্যাত ডুয়েল যুদ্ধ এই অসন্তোষেরই শেষ নিষ্পত্তি।

বর্তমান আলিপুরের চিড়িয়াখানার পশ্চাতের যেখানটা এখন 'ডুয়েল এভিনিউ' নামে খ্যাত তারই ধারে দেবদারু বৃক্ষশোভিত স্থানে দুই ইংরেজের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ আর কিছু নয় দুদিকে দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরকে গুলি করা। তখনকার দিনে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিশেষ রীতিটি বড় প্রচলিত ছিল। কেউ কারুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপমান করলে উভয় উভয়কে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করত। এবং তাঁদের সঙ্গে থাকত দুজন সেকেণ্ড, তাঁরা এই যুদ্ধের মধ্যস্থ হয়ে যুদ্ধের নিয়ম পালন করত। হেষ্টিংস ও ফ্রান্সিসের দ্বন্দ্বযুদ্ধের হেষ্টিংসের সেকেণ্ড ছিলেন কর্নেল পিয়ার্স ও ফ্রান্সিসের সেকণ্ড ছিলেন কর্ণেল ওয়াটসন। (যিনি পরবর্তীকালে খিদিরপুরের গবর্ণমেণ্টর ডক্‌ইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর নামে খিদিরপুরে একটি 'ওয়াটগঞ্জ বাজারও প্রচলিত আছে।)

এই যুদ্ধে অবশ্য হেষ্টিংসই ফ্রান্সিসকে আহত করেছিলেন এবং হেষ্টিংস তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বিলেতে তার স্ত্রীকে একটি

সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন। ইতিহাস পাঠকেরা হয়তো সে চিঠির কথা জানেন।

কিন্তু এই যুদ্ধ কেন হয়েছিল তা অনেকেই জানেন না। ফ্রান্সিস যে হেষ্টিংসের ওপর একটুও সন্তুষ্ট ছিলেন না তার প্রমাণ জাহাজ থেকে অবতরণের পর থেকেই সুরু।

হেষ্টিংস যে কোন অংশে ফ্রান্সিসের চেয়ে বড় নয়, সে কথা ফ্রান্সিস বার বার মনে করতেন। সেইজন্য তার সদাসর্বদা আক্রোশ ছিল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে। নন্দকুমারকে এই ফ্রান্সিসই হেষ্টিংসসের বিরুদ্ধে বিলাতে চিঠি লেখবার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। যাই হোক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কারণ কাউন্সিলের এক অধিবেশনে ফ্রান্সিসের চরিত্র সম্বন্ধে হেষ্টিংস সাহেব কোন কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক এই মন্তব্যে তিনি ফ্রান্সিসকে প্রকারান্তরে মিথ্যাবাদী বলেও উল্লেখ করেছিলেন। এ অপমান সহ্য করতে না পেরে ফ্রান্সিস হেষ্টিংসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন।

ফ্রান্সিসের চরিত্র নিয়ে হেষ্টিংস যে কটুক্তি করেছিলেন, অথচ আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করতে হয় যে হেষ্টিংসের কোন চরিত্রই ছিল না। এমন কি দুশ্চরিত্র বললেও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়। অবশ্য তখনকার দিনে কোন ইংরেজই যে নিষ্কলুষ চরিত্র নিয়ে এদেশে ছিলেন এ কথা আজ জোরের সঙ্গে বলা যায়। হেষ্টিংসবিরোধী ফ্রান্সিসের চরিত্র যে যথেষ্ট কলঙ্কময় ছিল তার একটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি অবশ্য বেশ মজার কিন্তু এই ঘটনা থেকে তখনকার দিনের উচ্চপদস্থ কতকগুলি ইংরেজ কর্মচারীর চরিত্রের খবর পাওয়া যায়।

ইম্পের এজলাসে একটি মোকদ্দমা। ঘটনাস্থল বর্তমান আলিপুর। কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফ্রান্সিসের আলিপুরে একটি পল্লীনিবাস ছিল। বর্তমান বেলভেডিয়ার রাজপ্রসাদ অথবা হেষ্টিংস-হাউসের কাছাকাছি কোথাও এই পল্লীনিবাস ছিল। বেলভেডিয়ার সান্নিধ্যে মিঃ লি-গ্রাণ্ড বলে একজন ইংরেজ থাকতেন। তাঁর পরমাসুন্দরী স্ত্রী সেকালের কলকাতা সমাজের একজন বিশিষ্ট মহিলা ছিলেন। এবং অনেক ইংরেজই এই মহিলাকে দেখে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতেন।

কিন্তু স্বনামখ্যাত ফিলিপ ফ্রান্সিস যখন এই সুন্দরী রমণীকে দেখলেন তখন আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। এতদূর মুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন যে একদিন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মোহাচ্ছন্নের মত

নৈশাভিসারে বের হলেন। একটি দড়ির সিঁড়ির সাহায্যে গভীর রাত্রে তিনি লি-গ্রাণ্ডের বাড়ির ওপর তলায় উঠলেন। লি-গ্রাণ্ড সেদিন রাত্রে বাড়ি ছিলেন না তিনি তা জানতেন। মিসেস লি. গ্রাণ্ড গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। হঠাৎ জেগে উঠে তাঁর শয়ন ঘরে অপরিচিত লোক দেখে চীৎকার করে উঠলেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে মেয়েলি আর্তস্বরের চীৎকার রাতের স্তব্ধতা ছিঁড়ল। সেই চীৎকারে বাড়ির লোক উঠে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস দড়ির সাহায্যে নীচে নেমে পলায়ন করলেন।

কিন্তু তিনি পালালে কি হবে? তাঁর প্রিয় বন্ধু মিঃ শীকে (পরে স্যর জর্জ শী হয়েছিলেন) নীচে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিলেন, তিনি লি. গ্রাণ্ডের জমাদার সিপাইর হাতে ধরা পড়লেন।

গ্রাণ্ড পরের দিন বাড়ি এলে সমস্ত ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এবং ফান্সিসকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। সেদিন যদি ফান্সিস দ্বন্দ্বযুদ্ধে যোগদান করতেন তাহলে হয়ত গ্রাণ্ডের দ্বারা গুরুতর আহত অথবা নিহত হতেন। যে কোন একটা গুরুতর ঘটনা যে ঘটত এ বিষয়ে সুনিশ্চিত। কারণ কোন লোকই যে স্ত্রীর মান-ইজ্জত নষ্ট হতে দিতে চায় না এবং যিনি নষ্ট করতে আসবেন তিনিও যে উপযুক্ত শাস্তির বিনিময়ে পরিত্রাণ পাবেন না—ফ্রান্সিস কেন সকলেই জানেন। তাই বুদ্ধিমান ফ্রান্সিস সেদিন গ্রাণ্ডকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন বলেই পরবর্ত্তীকালে আমরা ফ্রান্সিসের অন্যান্য কীর্তির খবর পাই।

কিন্তু গ্রাণ্ড তবু ফ্রান্সিসকে রেহাই দেন নি। সেদিন তিনি স্ত্রীর অসম্মান নিজের হৃদয়ে ধারণ করে সুপ্রীম কোর্টে ইম্পের এজলাসে অভিযোগ পেশ করেছিলেন। অভিযোগ করেছিলেন এই বলে যে, স্ত্রীর মানহানি, ইজ্জত-নাশের চেষ্টা করার জন্য ফ্রান্সিসকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

বিচারক ছিলেন—স্যার ইলাইজা ইম্পে, চেম্বার্স ও হাইড। এই তিন জন বিচারকই একদিন জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত নন্দকুমারেরও বিচার করেছিলেন। গ্রাণ্ডের অভিযোগ শুনে চেম্বার্স বললেন—"যখন প্রকৃত অপরাধের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, তখন কোনরূপ ক্ষতিপূরণের দাবি চলিতে পারে না।" কিন্তু ইম্পে বললেন "কোনরূপ অত্যাচারের প্রমাণ না থাকিলেও, গ্রাণ্ডপত্নীর শয়নঘরে গভীর রাত্রে প্রবেশ করিয়া ফ্রান্সিস তাহার সম্ভ্রমের হানি করিয়াছেন।" এই দুজন বিচারকের দ্বিমতের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, দুজন বিচারকই ছিলেন দুজন বিশিষ্ট লোকের

প্রিয়। ইম্পে ছিলেন হেষ্টিংসের বন্ধু ও চেম্বার্স ছিলেন ফ্রান্সিসের বন্ধু। ইম্পে এই সুযোগে হেষ্টিংসের শত্রুকে যে নির্দোষ সাব্যস্ত করবেন না, এ বলা বাহুল্য। তবে চেম্বার্স ফ্রান্সিসের জন্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সঙ্গী বিচারকদের যখন একমত তখন তিনি ইম্পের কথাতেই সায় দিয়ে বললেন—"বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক।" জজ হাইড বললেন—"মান ও ইজ্জতের তুলনায় এ ক্ষতিপূরণ বড় কম—এক লাখ টাকা দেওয়া হোক।" শেষে ইম্পে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ সরূপ রফা করে সে যাত্রা ফ্রান্সিসকে মুক্তি দিলেন।

আর ফ্রান্সিস একটি ইংরেজ রমণীর শয়নঘরে রাত্রিবেলা প্রবেশ করার অপরাধে পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আদালতের কাঠগড়া থেকে নির্লজ্জ বীরের মত বেরিয়ে এলেন। আদলত পর্যন্ত এই ঘটনা এগিয়েছিল বলেই আজ আমরা একটি সম্ভ্রান্ত ইংরেজ কর্মচারীর দুশ্চরিত্রের একটি খবর পেলাম। কিন্তু সব ঘটনাই তো আর আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে নি? এমনি কত ঘটনা যে সেদিন কলকাতার বুকের ওপর জমা হয়ে আছে কে জানে? কে জানে, হেষ্টিংস, ফ্রান্সিসের মত অন্যান্য উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীরা ইতিহাসের বুক কাল করে তখনকার দিনে এদেশে আরও কত পাপের বন্যা বইয়ে গেছে। আজ আর কিছুই জানবার উপায় নেই। আজ তাদের চরিত্রের এই সব ঘটনা নিয়ে ইতিহাস রচনা হত। তাহলে, আজকের এই সুসভ্যনগরবাসীরা দেখত সেদিনের ইংরেজরা এদেশে এসে মনুষ্যত্বের কি কি পরিচয় দিয়ে গেছেন।

কিন্তু চিরকালই ইংরেজরা চালাকী করে এসেছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা এই দিকটাই সুকৌশলে ছেদন করে তাদের জাতিকে বিশ্বের চোখে শ্রেষ্ঠ করে গেছেন।

একালের গৃহের একটি প্রধান সমস্যা গৃহভৃত্য। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের কর্ত্রীদের জীবনের সুখ অন্তর্হিত এই গৃহভৃত্যের জন্য। তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে তাঁরা আপনাকে অন্য কথা বলার আগেই জিজ্ঞেস করবেন, আপনি কোন বিশ্বাসী গৃহভৃত্যের সন্ধান জানেন কিনা? যদি জানেন তাহলে অবিলম্বে তাকে আনার ব্যবস্থা করে দিন। যে-কোন মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত। কারণ এরকম হারে সংসার প্রতিপালন করতে গেলে সংসার ছেড়ে কোন একদিন পালিয়ে যেতে হবে।

গৃহের জন্য গৃহকর্ত্রী কিন্তু গৃহকে শান্তির আকর করতে গেলে গৃহভৃত্যই যে সবার আগে প্রয়োজন, একথা সমস্ত গৃহিণীরাই মনে প্রাণে জানেন। সেই গৃহভৃত্যের অভাব। সুতরাং শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। আর শান্তি না থাকলে আপনিও সারাদিন খেটেখুটে গৃহের দিকে ফেরার জন্যে প্রাণ আপনার আকুলি-বিকুলি হয় না কারণ আপনি জানেন সেখানে আপনার প্রিয়জন নিজের হাতে বৃহৎ সংসারের জোয়াল টানতে টানতে মনে পাহাড়সমান অগ্ন্যুৎগার নিয়ে অপেক্ষ্যমানা। কাউকে কিছু বলেননি শুধু নীরবে আপনার অপেক্ষায় আছেন, আপনি বাড়ীতে পৌছলেই তাঁর যত অভিমান সব বাষ্পাকারে উষ্ণ হয়ে আপনাকে একেবারে ধৌত করে দেবে, মানে যত মনের ঝাল কথার ঝাঁজে মিশ্রিত করে আপনাকে দাম্পত্য জীবনের ষোল-আনা বুঝিয়ে দেবে।

শুধু একটি গৃহভৃত্য। সামান্য একটি ভৃত্যের জন্য এহেন সুখ আপনার অন্তর্হিত। যদি আপনি কোনদিন সংসার করবার আগে জানতেন যে, এই সামান্য একটি সাহায্যকারীর জন্য আপনার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে কি কখনও আপনি এত মেহনত করে সংসার করতেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও এ-বস্তুটি মেলে না। যোগাড় করতে গেলে পরিচিত লোকের সাহায্য নিতে হয়।

যদিও বা কোনরকমে একটি জুটল তিনি মেজাজ দেখিয়ে জানালেন, তিনি সাহেববাড়ীতে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সুতরাং তাঁর কাজের ধারা একটু উঁচুগামী। তিনি ছোট কাজ করতে লজ্জাবোধ করেন,

বড় কাজে বিশেষ উৎসাহ; কিন্তু সময়সাপেক্ষ। তাই সারাদিন ধরে বড় কাজই করবেন। খাবেন বাড়ীর সেরা খাদ্যবস্তু; পরবেন কর্তার যত মূল্যবান পোষাক। কিছু বলার উপায় নেই, তাহলে তিনি 'রেজিগনেশন' দিয়ে পত্রপাঠ বিদায় নেবেন।

এমনি যখন চাহিদা গৃহভৃত্যের—তখন গৃহভৃত্য সুলভ না হওয়ায় বিস্মিতই হতে হয়। অবশ্য সুলভ হলে আর বাদশাহের বংশধরদের এত মেজাজের তোয়াক্কা কেউ করত না। কোন কোন বাড়ীতে দেখা যায়, বাড়ীর কর্ত্রী কর্তাকে যত সম্মান না করেন তত খাতির করেন তাঁর ভৃত্যটিকে। অবশ্য একথা বলার অর্থ অন্য অর্থে প্রযোজ্য না হলেই মঙ্গল। আপনি যদি গৃহভৃত্যের সাহায্য ব্যতিরেকে কাজ চালাতে পারেন তাহলে আপনার কাছে এসব কথা নস্যতুল্য। কিন্তু এমন কেউ আছে বলে আমার জানা নেই, যাঁরা ভৃত্যের সাহায্য ছাড়া জীবননির্বাহ করেন। অবশ্য এ অর্থে আর্থিক প্রসঙ্গ এসে যায়। কারণ অনেকে আর্থিক সঙ্কটের জন্য প্রয়োজন থাকা সত্বেও ভৃত্য রাখতে পারেন না। বাড়ীর লোকেরা নিজেদের হাড়মাস কালি করে গাধার খাটুনি খেটে সংসার প্রতিপালন করেন। তাঁদের জন্য ভৃত্য সমস্যার প্রস্তাবনা নয়। ভৃত্য যাঁরা রাখেন, ভৃত্যের সমস্যা যাদের আছে তাঁদের জন্যই কিছু বক্তব্য।

আজ ভৃত্যরা বাবু পর্যায়ে উন্নতি হয়ে সমাজকে ভৃত্যহীন করে তুলেছে কিন্তু একদিন ছিল এই কলকাতায় যেদিন অসংখ্য দাসদাসী পরিবৃত বিরাট কেন ছোট একটি ক্ষুদ্রসংসারই প্রতিপালিত হত প্রতিদিন মহোৎসবের মত। বহু জমিদার পরিবারের রান্নার ফিরিস্তির সঙ্গে লোক গণনার হিসাব দিলে দাসদাসীর সংখ্যাই বেশী দেখা যাবে যত রান্না তার তিনভাগ এই দাস-দাসীর উদর পূরণের জন্যই তৈরী হত। সে যাক্‌গে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কথাই ধরা যাক। কোম্পানী এদেশের রাজ্য হাতে পাওয়ার পর তখনকার ইয়োরোপীয়ানদের দৈনন্দিন একটা হিসাব দিলে তাঁরা দিনের মধ্যে কতরকম ভৃত্যের সাহায্য নিয়ে জীবনের প্রতিটি দিন ও রাত্রি অতিবাহিত করতেন তার হদিশ মেলে। সে সময় ভৃত্যরা আজকের নাসিকা উত্তোলন করে দাবী জানানোর কায়দা রপ্ত করত না। তবে এ প্রসঙ্গে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণের বাসনা নেই। যারা ভৃত্য তারা ভৃত্যই। যারা অভাবে পড়ে ভৃত্যের চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন অসম্মানসূচক উক্তি করার স্পৃহা নেই।

সেদিন এই সহরের ভৃত্যদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে যেটুকু এসে গেল তার কতকাংশ শুধু বর্তমান অবস্থাটুকু ধরবার জন্যেই ভূমিকা করলাম। এখন সেকালের কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা বহু ভৃত্য পরিবৃত হয়ে কী রকম দৈনন্দিন জীবননির্বাহ করতেন ম্যাকিনটস সাহেবের এতদ্দেশীয় ইউরোপীয়দের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করে কিছু নমুনা দিই।

"প্রাতে প্রায় সাতটার সময় সাহেবের দরওয়ান ফটক খুলে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সরকারগণ, চাপরাসিগণ, হরকরাগণ, চোবদারগণ, হুঁকাবরদারগণ খানসামাগণ, কেরাণীগণ ও প্রার্থিগণ দ্বারা বারান্দা পরিপূর্ণ হইয়া যায়। হেডবেহারা ও জমাদার ৮টার সময় হলেও তাঁহার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ একটি কামিনী তাঁহার পার্শ্ব ত্যাগ করে এবং গুপ্ত সিঁড়ী দিয়া নয়, তাহার নিজ প্রকোষ্ঠে অথবা প্রাঙ্গনের বাইরে নীত হয়। প্রভু আপনার পদদ্বয় শয্যা হইতে বাহির করিবামাত্র, যে সমস্ত লোক তাঁহার জাগরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা সকলেই সেই গৃহে প্রবেশ করে এবং দেহ ও মস্তক যথাসম্ভব নত করিয়া ও হস্তাঙ্গুলির অন্তপৃষ্ঠ দ্বারা স্ব স্ব ললাটদেশ ও পশ্চাৎপৃষ্ঠ দ্বারা গৃহতল স্পর্শ করিয়া প্রত্যেকে তিনবার সেলাম করে। প্রভু অনুগ্রহপূর্বক হয়ত মস্তক ঈষৎ কম্পিত করেন। অথবা তাঁহার কৃপা ও আশ্রয়প্রার্থীদিগের প্রতি একবার কটাক্ষপাত করেন। অনন্তর তাঁহার লম্বা ঢিলা পাজামা উন্মোচন করা হইলে একটি পরিষ্কার ধপদ্বপে শার্ট, প্যাণ্টালুন, ষ্টকিঙ ও জুতা যথাক্রমে তাহার উর্ধ্বাদি, জঙ্ঘায়, পদদ্বয়ে ও পদতলে পরাইয়া দেওয়া হয়। এই বেশ পরিবর্তন ব্যাপারে তিনি কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করেন না, পুত্তলবৎ নিশ্চেষ্ট থাকেন। এই কার্যে ন্যূনধিক অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হয়। তৎপরে ক্ষৌরকার প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করে, নখ কাটিয়া দেয় ও কর্ণমূল পরিষ্কার করে (অর্থাৎ 'কাণ দেখে') অতঃপর জনৈক ভৃত্য চিলমজি ও 'মগ' আনয়ন করে, এবং তাহার মস্তকে জল ঢালিয়া দেয়, হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেয় ও হস্তে তোয়ালে অর্পণ করে। প্রভু তখন মহাড়ম্বরে প্রাতর্ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন; খানসামা চা প্রস্তুত করিয়া ঢালিয়া দেয় এক প্লেট রুটি বা 'টোষ্ট' প্রদান করে। এই সময় কেশ-সংস্কারক পশ্চাদ্দেশে আপনার কাজ আরম্ভ করিয়া দেয়, ওদিকে হুঁকাবরদার হুঁকার (গুড়গুড়ির বা ফরসির) নলের মুখটি প্রভুর হস্তে প্রদান করে। একদিকে কেশসংস্কারক আপনার কর্ম

করিতে থাকে, অপরদিকে সাহেব পর্যায়ক্রমে ভোজন, পান ও ধূমপান করিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহার মুৎসুদ্দী বিনীতভাবে সেলাম করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অন্যান্য অনুচর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক নিকটে গমন করে। প্রার্থীদিগের মধ্যে দুই একজন নামজাদা লোক থাকিলে, তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য চেয়ার দেওয়া হয়। এই সমস্ত ব্যাপার প্রায় ১০টা পর্যন্ত চলিতে থাকে। অতঃপর প্রভু অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া পাল্কীর ভিতর প্রবেশ করেন, এবং তাঁহার অগ্রে অগ্রে ৮ হইতে ১২ জন চোবদার, হরকরা ও চারপাশী স্ব স্ব পদের পরিচায়ক চিহ্ন এবং ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পাগড়ি ও কোমরবন্ধ বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া একপ্রকার লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতে থাকে; তাহারা প্রভুর কিছুমাত্র অসুবিধা না জন্মাইয়া মধ্যে মধ্যে কাঁধ বদল করে।"

এই প্রকারে চলতে থাকে রাত্রি ১টা পর্যন্ত সাহেবের জীবনতালিকা তারপর নিদ্রার জন্য শয্যায় গমন। কোম্পানীর সব কর্মচারীরাই এমনি অধিক ক্লেশ স্বীকার না করে অগাধ ধন সঞ্চয় করেছিলেন। ভাবলে একটু অবাকই হতে হয়।

তবে এ-প্রসঙ্গে ভৃত্যের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করা হবে বলে সেকালে এদেশের ইংরেজদের জীবন-বৃত্তান্ত জানবার লোভ সংবরণ করলাম। সেকালে ভৃত্যরাও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করত তার সম্বন্ধে নীচের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য।

'১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের, ২১শে তারিখে জমীদারদের মন্ত্রণা-সভার অধিবেশনে কলিকাতাবাসী ইংরেজদের ভৃত্যবর্গ সম্বন্ধে নানাকথা আলোচিত হয়। এই সভায় জমীদার হলওয়েল ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড ও রিচার্ড বিচারে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতাবাসী ইংরাজদের ভৃত্যবর্গ উদ্ধত হইয়াছে—অতিরিক্ত হারে বেতনের দাবী করিতেছে, এইসব বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হয়। এই আলোচনার পরিণামে চাকরদের বেতনের হার নির্ধারিত হইয়া যায়। ইহাতে আরও স্থির হয়—ভৃত্যদিগের বেতন সম্বন্ধে, যে দর স্থির করিয়া দেওয়া হইল তাহারা যদি তাহাতে চাকরী করিতে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপরাধীরূপে জমিদার সাহেবের নিকট হাজির করা হইবে। তাহাদের এরূপ অবাধ্যতার জন্য জমীদারের বিচারে জরিমানা, বাসোচ্ছেদ কারাদণ্ড বা দৈহিক শাস্তিবিধান পর্যন্ত হইতে পারে। যদি কোন ভৃত্য একমাস পূর্বে নোটিস না দিয়া তাহার প্রভুর চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়,

তাহা হইলে জমিদার-সাহেবের বিচারে, তাহার পূর্বোক্তরূপ শাস্তি হইতে পারে। যদি কোন স্থলে, প্রভু ভৃত্যের সহিত অসদ্ব্যবহার করেন বা তাহার উপর অন্যায় অত্যাচার করেন, তাহা হইলে সেই ভৃত্য জমীদারগণের আদালতে প্রভুর নামে প্রকাশ্যভাবে নালিশ করিতে পারিবে। সেকালের চাকর-বাকরের শ্রেণী বিভাগ ও তাহাদের মাসিক বেতনের ফর্দ লক্ষ্য করুন।

পদবী	মাসিক বেতনের হার (আর্কটী টাকা)
(১) খানসামা খৃষ্টান মুসলমান	পাঁচ টাকা
(২) চোপদার (হিন্দু)	„
(৩) প্রধান বাবুর্চি	„
(৪) কোচম্যান	„
(৫) পর্টুগীজ হেড আয়া	চারি টাকা
(৬) জমাদার	তিন টাকা
(৭) খিদ্‌মতগার	„
(৮) পাচকের প্রধান সহকারী	„
(৯) সর্দার বেহারা	„
(১০) দ্বিতীয় আয়া	„
(১১) পেয়াদা	আড়াই টাকা
(১২) বেহারা	„
(১৩) ধোপা (সমগ্র পরিবারের)	তিন টাকা
(১৪) ঐ একজন ব্যক্তির	দেড় টাকা
(১৫) সহিস	দুই টাকা
(১৬) মশালচী	„
(১৭) নাপিত	দেড় টাকা
(১৮) পরচুলা সাজাইবার নাপিত	„
(১৯) খরচ পরদার	দুই টাকা
(২০) মালী	„
(২১) ঘেসেড়া	পাঁচ সিকা
(২২) দাসী (সমগ্র পরিবারের)	দুই টাকা
(২৩) ঐ (একজনের)	এক টাকা
(২৪) হুক্কাবরদার	„

সেকালে জিনিষপত্র সস্তা ছিল, কাজেই চাকরবাকরদিগের মাসিক তলবানাও সেই অনুপাতে কম ছিল। তবুও এই সমস্ত ভৃত্যবর্গ মধ্যে মধ্যে চাকরি ছাড়িয়া পলাইত বলিয়া, সাহেব মহলে সদাসর্বদা গণ্ডগোল ঘটিত।"

বর্তমানকালে চোপদার, মশালচী, পরচুলা-সাজাবার নাপিত (wigbarbar) খরচ—পরদার, হুক্কাবরদার, প্রভৃতি কোন চাকরই আর নেই। চোপদারেরা রূপোয় আসাসোটা নিয়ে মনিবের অগ্রপশ্চাৎ যেত। মশালচীর কাজ ছিল আলোক বা লণ্ঠন হাতে পথ দেখান।

'হুঁকা-বরদারেরা' প্রভুর তামাকু সাজত। মনিবের আদেশ পাওয়ামাত্র তারা গুড়গুড়ি নিয়ে তাঁদের পিছনে দাঁড়াত। এ ছাড়া 'আবদার' বলে আর এক শ্রেণীর ভৃত্য ছিল। গরমকালে সোরা প্রভৃতির সহায়তায়, পানীয় জলকে শীতল রাখাই এর কাজ ছিল প্রাচীন কলকাতার সাহেবরা ফুরসীতে তামাকুর ধুম পান করতেন। প্রত্যেক সাহেবের এক একজন খাস 'হুঁকা-বরদার' ছিল। কোন কোন ভোজ ক্ষেত্রে নিমন্ত্রিত লোকদের সঙ্গে অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায় হুঁকাবরদারকেও প্রভুর সঙ্গে যেতে হত। ভোজনের ব্যাপার শেষ হয়ে গেলে, গুলের আগুনে খুব বড় কলিকায় উত্তমরূপে তামাকু সেজে হুঁকা-বরদারেরা তাদের প্রভুর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়াত। সাহেবরা ইচ্ছামত ধুম পান করতেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দেও হুঁকা-বরদারদের প্রাধান্য ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের কলকাতার বাড়ীতে উক্ত বৎসরে এক ঐক্যতান-বাদন ও ভোজোৎসব উপলক্ষে অতিথিদের অনুরোধ করা হয়—আপনাদিগকে সম্মানের সহিত জানান যাইতেছে, নিমন্ত্রণ-সভায় আসিবার সময় দয়া করিয়া অন্য কোন চাকর সঙ্গে আনিবেন না। তবে হুঁকা-বরদার সঙ্গে আনিলে কোন আপত্তি নাই।" কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এক নিমন্ত্রণ পত্রের প্রতিলিপি থেকে জানতে পারা যায়, এ সময়ে সাহেবী সমাজে হুঁকার প্রচলন একবারে বন্ধ না হলও—উপরের তলায় বা ভোজক্ষেত্রে 'হুকাবরদারের' প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের পর সাহেবী সমাজে হুঁকার তামাকু সেবনের ব্যবস্থার কথা আর শোনা যায় না।

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চাকরদের বেতন তিনগুণ বেড়ে যায়। বিচার ও হলওয়েল প্রভৃতি চাকরবাকরদের যে তলবানা স্থির করে দিয়েছিলেন, তাতে পরবর্তীকালে আর চাকর পাওয়া যেত না। পুরাতন কাগজপত্র থেকে জানা যায়—পরবর্তীকালে খানসামার বেতন মাসিক পঁচিশ টাকা, পাচক ও কোচম্যানের মাসিক কুড়ি টাকা ও খিদমৎগার ও বেহারাদের

মাসিক দশ টাকা বৃদ্ধি হয়েছিল। এ বেতন না দিলে তখনকার সাহেবরা চাকর-বাকর পেতেন না। কিন্তু চাকর রাখবার খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে, চাকরের সংখ্যা কমাবার জন্যে যে কোনরূপ চেষ্টা হত, তারও প্রমাণ নেই। পূর্ববর্তী তালিকায় যে কয়েক শ্রেণীর চাকরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—তারাই এইভাবে বৃদ্ধির হারে নিযুক্ত হত।

ম্যাক্রেবী সাহেব তখন কলকাতার জেলের বড়কর্তা ছিলেন। এই ম্যাক্রেবী হেষ্টিংসের কৌন্সিলের সদস্য, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের সেক্রেটারী ও নিকট সম্বন্ধীয় আত্মীয়। এই ম্যাক্রেবীর কর্তৃত্বাধীনেই মহারাজ নন্দকুমার জেলের মধ্যে ছিলেন। ম্যাক্রেবী সাহেব এই সময় কলিকাতার সাহেব-সুবোদের বড়মানুষী দেখে লিখে গেছেন—চাকরের বেতন চারিগুণ বাড়িয়াছে—তাহা বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন—ইহার সঙ্গে চাকরের সংখ্যা কমান হইয়াছে। আমি জানি, কোন ইংরাজ-পরিবারে কেবলমাত্র চারিজন লোকের জন্য একশত দশজন চাকর নিযুক্ত আছে। হায়! এ সত্বেও লোকে আমাদের মিতব্যয়ী বলিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে পাঁচু খানসামা লেনের উল্লেখ করলে যথেষ্ট হবে। পাঁচু খানসামার স্মৃতি সেকালের ভৃত্যদের গৌরব।

মোটের ওপর কথা হচ্ছে, সেকালের ইংরাজেরা এইভাবে চাকরবাকর না রেখে চলতে পারত না। এই সমস্ত বেতনভোগী ভৃত্য ছাড়া, অনেক সাহেব-সুবো আবার ক্রীতদাস রাখতেন। সেকালের সাধারণ সংবাদপত্রে, এই ধরণের ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক মজাদার বিজ্ঞাপন আছে। ক্রীতদাসদের মধ্যে অনেকেই কাফ্‌রি। যে সকল ক্রীতদাস খানসামা ও রাঁধুনীর কাজ জানত—তারা চার'শ টাকা মূল্যে ক্রীত হয়েছে, এরূপ উদাহরণও পাওয়া যায়। অনেক ক্রীতদাস, ক্ষৌরকার্যে পারদর্শিতার জন্য, গান-বাজনায় দক্ষতার জন্য—উচ্চমূল্যে ক্রীত হত। সকল ক্রীতদাস ও দাসী যে নিগ্রো ছিল, তা নয়। এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও অনেক ক্রীতদাস পাওয়া যেত। যে-সব দরিদ্র-সন্তান, ছোটবেলায় পিতৃমাতৃহীন হয়ে আশ্রয়বিহীন হত, তাদের ধরে এনে দাস ব্যবসায়ীরা ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করত। মহামারী, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির সময়ে এরূপ অনেক পিতৃমাতৃহীন বালক-বালিকা পাওয়া যেত। তখন ভারতের সকল কেন্দ্রেই ক্রীতদাসের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাসদের প্রভুরা এইসব হতভাগ্যদের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করতেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাস ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ সম্বন্ধে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এক আইন প্রচলিত করেন। তারপর থেকে এই ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।

বর্তমানে কলকাতার চারিদিকে যে সব হোটেল আছে তাদের মধ্যে দু চারটির নাম কলকাতার সব লোকেরই জানা, যেমন গ্রেট ইস্টার্ন, গ্র্যাণ্ড, সাভয় হোটেল ইত্যাদি। অবশ্য এসব হোটেলে অনেকে কোনদিন ঢোকেনি, শুধু পথ দিয়ে চলবার সময় হাঁ করে আকাশ-সমান বাড়ী দেখেই ঢোক্ গিলে চলে গেছে। দেয়ালে-লটকান নামটি পড়ে হোটেল দেখা শেষ করে বন্ধুবান্ধবের কাছে এক নম্বরের সাফাই নিয়ে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে। এবং নানান কল্পনার ইন্দ্রজাল তৈরী করে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে—একবার জেনে নিতে হবে, ঐ হোটেলে একদিন থাকতে কত টাকা লাগে? একদিন থাকলেই সারাজীবনের কৌতূহল্ মিটে যাবে।

এমনি ধারণা বর্তমানের আভিজাত্যপূর্ণ নামজাদা হোটেলগুলির। কলকাতা শহরের সমস্ত অধিবাসীর মনের স্বপ্ন! চৌরঙ্গীতে গ্র্যাণ্ডের ফুটপাতে গিয়ে একবার দাঁড়িয়ে দেখুন। আপনার কি মনে হবে না—একবার এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নয়নদর্শন করে আসি। বাইরেই যার রোশনাই, না জানি তার ভেতরে কি আছে? কলকাতার সবচেয়ে পুরনো হোটেল গ্রেট ইস্টার্ন, স্পেন্সেস্। এবং তার আগে আর কোন হোটেল ছিল কিনা—থাকলেও খুব একটা বড়দরের হাঁকডাক-করা হোটেল ছিল না—থাকলে নিশ্চয় তার ইতিহাস ঐতিহাসিক মর্যাদায় কলকাতার বুকে লিপিবদ্ধ থাকত।

হোটেলের দরকার বিদেশ থেকে আসা মানুষের। তাদের ডায়রীতে লেখা থাকে কোন হোটেলে উঠলে কম্ফটাবেল বাসস্থান ও আহার পাওয়া যাবে। সুতরাং এদেশবাসীর কাছে হোটেল তত কৌতূহলের উপাদান নয়। এখন স্ট্রীট্ ডাইরেক্টরী কিনলে তাতেই লেখা থাকে হোটেলের নাম ও ফোন নম্বর। দমদম এয়ার পোর্টে নেমে কটাকট রিং করলেও সাদর সম্ভাষণের ফিরিস্তি ছুটে আসবে। সুতরাং বিদেশীর পক্ষে হোটেলের জন্য আর কোন সমস্যা নেই। শিয়ালদহ অথবা হাওড়া ষ্টেসনে নামলেই হোটেলের লোকদের দর্শন মিলবে। তারা আপনাকে নিজেদের হোটেলের প্রশংসাপত্র মেলে দিয়ে আপনাকে তাদের হোটেলে নিয়ে যাবেই। কারণ পৃথিবীর বিখ্যাত লোকেরা

য সেই হোটেলে উঠেছিল, সুতরাং আপনাকে উঠতেই হবে, না হলে জীবন থা। এ সব প্রথা অন্যান্য শহরের মত এখানেও এই বর্তমানের কালে ঠিক নিয়মমাফিক।

প্রশ্ন হল রেঁস্তরা ও কফি হাউস নিয়ে। এ দুটির কথা বলতে গেলেই সেদিনের কলকাতার ট্যাভার্নের প্রসঙ্গ এসে যায়। কিন্তু তার আগে কলকাতার রেস্তরাঁ ও কফিহাউসের সম্বন্ধে দু চারটি কথা লিপিবদ্ধ করে নেওয়া দরকার।

চা খাবার জন্যে রেস্তরাঁ নয় এবং কফি খাবার জন্যে কফি হাউস নয়। এ কথা এ শহরের প্রত্যেকটি যুবক যুবতীকে জিজ্ঞেস করলেই তারা হলফ করে বলতে পারে। যত রাজনীতি, সাহিত্য, নাচ-গান-থিয়েটার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা এই সব রেস্তরাঁ ও কফি হাউসে ইদানীংকালে সমাধা হয়ে থাকে। আপনার কোন এক বিশিষ্ট বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করলেন। বাড়ীতে বসানোর অসুবিধে, তাকে আপনি কোন অভিজাত রেষ্টুরেণ্টে নিয়ে গেলেন। তাছাড়া, পাড়ার চায়ের দোকানে প্রত্যহ সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার জমায়েত না হলে আপনার সারাদিন বরবাদ। অনেককে দেখেছি, বাড়িতে চা খেলে তৃপ্তি পান না। একবার ঐ পাড়ার চায়ের দোকানে গিয়ে দৈনিক খবরের কাগজের পাতাটা না দেখলে বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অধুনা খেলার খবর ও সিনেমার নটীদের গল্প না করলে দিন ভাল যায় না।

এই ধরণের আড্ডাকে আগে বাপদাদারা চরিত্রদোষের সঙ্গে তুলনা কবতেন কিন্তু অধুনা এই আড্ডার মধ্যে দিয়েই বেকার যুবকের চাকরী প্রাপ্তি কিংবা জীবনের পথ তৈরীর সাফল্য দেখা যায়। নানা লোকের জমায়েতে নতুন বন্ধুর সমাগমে নতুন পথ নির্দিষ্ট হয়। বাপদাদাদের সেই অভিশাপ আর চরিত্রদো। ঘটায় না বরং চরিত্র উন্নত করে। যুবক যুবতীর মিলন ক্ষেত্রও এই রেস্তরাঁ। লেডিজ কমপার্টমেণ্ট সর্বত্র আলাদা ব্যবস্থা চালু করেছে। সেখানে বিশেষ বয়সের যুবক-যুবতীরা গ্রন্থিবদ্ধ হয়ে জীবনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কলকাতার এই রেস্তরাঁ আজকের আধুনিক জগতের একটি বিশেষ সেতু হয়ে মানুষের কল্যাণের পথ নির্দিষ্ট করেছে। কফি হাউসের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। তবে কফি হাউস এ শহরে খুব বেশী নেই এবং খুব একটা চালু নয়। তবু কফি হাউসে কেউ আমন্ত্রণ জানালে মনটা শিরশিরিয়ে ওঠে। কেমন যেন মনে হয়, নূতন বান্ধবীর সাথে প্রথম প্রেমের আলাপনের পর পুনরায় সাক্ষাৎ লাভ। কিংবা বিবাহিত জীবনের প্রথম

মিলন মুহূর্তটি। তার চেয়েও যদি বলা হয়, কোন অপরূপ সুন্দরী তরুণীর সাথে আলাপ হবার পর তার গোলাপী অধরের মৃদু হাসি। যে কোন একটার সঙ্গেই তুলনা করলে কফি হাউসে ঢোকার পূর্বের মানসিক অবস্থার পর্যালোচনা হয়।

আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধু কফি হাউসে নিমন্ত্রণ করেছিল তার মানসী প্রিয়ার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। সেদিনকার মনের অবস্থা চিন্তা করেছিলাম বলে উপররিউক্ত তুলনাটি একটু অতিশয়োক্তি করতে বাধ্য হলাম। তবু বলব—এক কাপ ধূমায়িত কফি সামনে নিয়ে আলাপ জমানো পৃথিবীর সমস্ত বিলাসিতার উর্ধ্বে।

আমার প্রসঙ্গটি ছিল, সেদিনের ট্যাভার্ন। সেদিনের বলতে—এই কলকাতা শহর যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। সিরাজদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে জয় করেছিলেন ১৭৫৬ সালে। পলাশীযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে। এই ১৭৫৭ সালের পর থেকে কলকাতা শহর আবার নতুন রূপ পেয়ে নতুনভাবে সাজতে শুরু করে। সে সময়টা হলয়েল সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। তারপর ক্লাইভ, হেষ্টিংস প্রভৃতির শাসন শুরু হল।

কলকাতা শহরে ইংরেজের রাজত্বের কাল সেদিন পুরোদ্যমে। তাই ইংরেজরা খুঁজতে লাগল আমোদ প্রমোদের পথ। য়ুরোপ থেকে জাহাজে সাহেব-মেমরা এসে লুটতে লাগল হিন্দুস্থানের সৌভাগ্য। ওরাই সেদিন তৈরী করেছিল থিয়েটার, নাচঘর, বলরুম, ট্যাভার্ন।

সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন, লালদীঘির কাছে তখন ছিল একটি থিয়েটার-বাড়ি. যে বাড়িটি সিরাজদ্দৌলা নিজে তোপখানা করে ফোর্টের ওপর গোলাবর্ষণ করেছিলেন, সেই থিয়েটার-বাড়িটির সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আছে। সেই থিয়েটার-বাড়িতে উৎসবাদিতে সান্ধ্য-ভোজনের আয়োজন ও সাহেবী নাচ হত। এই থিয়েটার বাড়িটি ভেঙে গেলে পরে মনসন, হেষ্টিংস, ইলাইজা ইম্পে; রিচার্ড বারওয়েল প্রভৃতি কর্তারা চাঁদা দিয়ে পুনঃসংস্কৃত করেছিলেন।

তখনকার দিনে সাহেবরা এদেশে এসে তাদের সেই জাতীয় প্রথা মেয়ে-পুরুষে হাত ধরাধরি করে নৃত্য ভোলেনি, বরং পুরোদমে চলছিল তার অনেক নজির আছে।

সাহেবরা যে নৃত্য দেখতে পটু—এদেশীয় নৃত্যে নিক্কি বাইজীর নাম

তখনকার দিনে স্বনামধন্য হয়েছিল তা থেকেই প্রতীয়মান হয়। যাইহোক্ এই ট্যাভার্ন প্রসঙ্গে নাচের ধারাবাহিক ইতিহাস না লিপিবদ্ধ করাই ভাল। তবে ট্যাভার্ন সৃষ্টি যে এই নৃত্যের ভূমিকা থেকেই তা এই সওয়া দুশ বছরের পরও বেশ বুঝতে পারা যায়। বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগার্থে এই বিশ্রামাগারের প্রয়োজনে কলকাতায় এই ট্যাভার্ন সৃষ্টি হয়েছিল। নরনারীর এক জায়গায় মিলনে বাড়ির পরিবেশের চেয়ে এমনি সর্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র হলেও একটু স্বাধীনও হওয়া যায়। তবে এইসব ট্যাভার্নে নেটিভরা প্রবেশ করত কিনা—তা জানা যায়নি।

ষ্টার্নডেল সাহেবের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায়—তিনি কলকাতায় আটটি ট্যাভার্নের অস্তিত্ব পেয়েছিলেন (১) লণ্ডন, (২) হারমোনিক, (৩) ইউনিয়ন, (৪) সেণ্ট পল্স্ গির্জার কাছে রাইটের নিউ ট্যাভার্ন, (৫) কলকাতা এক্সচেঞ্জ, (৬) ক্রাউন এণ্ড য়্যাঙ্কর—বর্তমান এক্সচেঞ্জ বাটি, (৭) বেয়ার্ডের হোটেল (৮) ডেকার্স লেনে মুরের ট্যাভার্ন (ডেকার্স লেন সে সময়ে একটি শৌখিন অঞ্চল বলে গণ্য হত)। গ্যালে নামক ফরাসীয় ট্যাভার্নে প্রাতরাশ ও অন্যান্য প্রকার খানার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া ১৮০০ সালে এগারোটি 'পঞ্চ হাউস, (একপ্রকার শুঁড়িখানা) ছিল। নানাদেশীয় কয়েকজন সাহেব নাবিকদের ও অন্যান্য লোকদের জন্য শহরের চারিদিকে আস্তে আস্তে ভোজনালয় ও বাসবাটী তৈরী হতে থাকে। এই সব আড্ডায় বিলিয়ার্ড খেলবার টেবিল রাখা হত এবং পানীয়ের মধ্যে বীয়ার ও লেমনেডই প্রধান ছিল। তাস, জুয়া, স্কিট্‌ল খেলারও বিশেষ প্রচলন ছিল।

তখনকার দিনে বলনাচ সম্বন্ধে এক ব্যক্তির মন্তব্য উদ্ধৃতি না করে পারছি না—"আমার নিজের কথা বলিতে হইলে, আমার যেন মনে হয়, ইউরোপীয় সুন্দরীদিগের গণ্ডদেশ হইতে স্বাভাবিক গোলাপী রঙ বিদূরিত হইয়া তৎপরিবর্তে যে মলিন পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা তাম্রবর্ণ বদনের সমুজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ; আর এখানকার ইউরোপীয় সুন্দরদিগের মুখের বর্ণ দেখিলে কবর হইতে উত্থিত ল্যাজেরসের কথা মনে পড়ে। ইংরেজ-রমণীরা অতিরিক্ত নৃত্যপ্রিয়; প্রখর-গ্রীষ্ম-তাপিত বঙ্গদেশের পক্ষে এরূপ অঙ্গচালনা একান্ত অনুপযোগী। আমার মতে, অপেক্ষাকৃত শীতল দেশের পক্ষে ইহা যতই উপযোগী হউক না কেন, যে দেশের লোক ভদ্রতার অনুরোধে যাহা অপরিহার্যরূপে আবশ্যক তদতিরিক্ত বস্ত্রদ্বারা দেহ আবৃত করে না, সে দেশে এরূপ নৃত্যকে কতকটা অশ্লীল বলিয়াই বোধ হয়। কল্পনানেত্রে ভাবিলা

দেখ দেখি তোমার হৃদয়ের প্রেমপুত্তলি গ্রীষ্মতাপে মৃতপ্রায়া, প্রত্যেক অঙ্গ থরথর কাঁপিতেছে, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ শ্রমে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বৃহদাকার স্বেদ বিন্দুসমূহ তাঁহার বদনমণ্ডলে মুক্তাকারে সজ্জিত হইয়াছে, আর তাঁহার নৃত্য-সহযোগী প্রত্যেক হস্তে একখানি মসলিন্ রুমাল লইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল মুছিয়া দিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছে।"

বিখ্যাত হারমোনিক ট্যাভার্নের নাম অনেকেই শুনেছেন। নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন সেই সময় এই ট্যাভার্নটি বর্তমান ছিল। লালবাজারেই এই ট্যাভার্ন বা সাধারণ বিশ্রামাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। অনেকে বলে লালবাজারের পুলিশ কোর্টের বাড়ি এখন এর স্থান অধিকার করেছে, তবে সঠিক কোন প্রমাণ নেই।

এই ঐতিহাসিক ট্যাভার্নে সেকালের বলনাচ, এসেম্ব্লি, অভিনয় ইত্যাদি হত। অনেক বড় বড় ইংরাজ পুরুষ যাঁরা তাঁদের কীর্তি রেখে গেছেন তাঁরা এই ট্যাভার্নে এসে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করতেন। সন্ধ্যার পর এই ট্যাভার্নে জ্বলতো, অসংখ্যক বর্তিকা এবং প্রজ্বলিত হয়ে উঠত হারমোনিকের কক্ষগুলি। বড়ই সুন্দর ছিল সেদিনের এই ট্যাভার্নটি। আজকের গ্র্যাণ্ড হোটেলের সঙ্গে এর তুলনা হয় কিনা জানি না। তবে গ্র্যাণ্ডে লোকে পার্টি দেয়, কোন সভা হয় না। এখানে তখনকার দিনে বড় বড় সভা হত। তখন সাধারণের সভা হবার জন্যে কোন টাউন হল ছিল না। এই হারমোনিকেই তখন সাধারণের জমায়েত হবার প্রধান আড্ডা ছিল। পুরাতন গেজেটের ১৭৮৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখের এক বিজ্ঞাপনীতে দেখতে পাওয়া যায়—"গত সোমবার কলকাতাবাসী জনসাধারণ ও গণনীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, এই হারমোনিক ট্যাভার্ণে সমবেত হইয়া বিদায়প্রাপ্ত গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবকে একটি অভিনন্দন দিবার জন্য মহাসভা করেন। তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই অভিনন্দন-পত্র, সর্বজন স্বাক্ষরিত হয়। ২৬০টি স্বাক্ষর সম্বলিত এই অভিনন্দন-পত্র পরদিন মধ্যাহ্নে গবর্ণর সাহেবকে দেওয়া হয়।" শোনা যায়, হেষ্টিংসের দ্বিতীয় পত্নী লেডি ইম্‌পফ এই হারমোনিকে ও সিরাজের তোপখানা সেই থিয়েটার-বাড়ির বলরুমে নৃত্যে যোগদান করতেন।

হারমোনিক ট্যাভার্ন ছাড়া আর একটি ঐতিহাসিক ট্যাভার্নের কথা শোনা যায়, সেটি ছিল বৈঠকখানার কাছে। ১৭৮১ সালে হিকির গেজেটে দেখা যায়—ইংরেজদের আর একটি 'বেড-এণ্ড-চিজ' বাঙ্গলো আড্ডা-ঘর ছিল।

এই আড্ডা-ঘরটিও সেকালে ইংরেজদের কাছে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তারপর ১৭৮৪ সালে এই বাঙ্গলোটি নিলামে বিক্রি হয়ে যায়। সেকালের সংবাদপত্র থেকে এ তত্ত্ব পাওয়া গেছে।

আজ সেই ট্যাভার্নের কলকাতা অস্তমিত। এখন ক্যাফে, রেষ্টুরেণ্ট, কফি হাউস নাম নিয়ে বিভিন্ন আড্ডা-ঘরের প্রকাশ হয়েছে। তবে সেদিনের সেই ট্যাভার্নের আমোদ প্রমোদ বিখ্যাত ছিল না আজকের ক্যাফে বা বারের আমোদ-প্রমোদ প্রসিদ্ধ—তার তুলনা করলে আজকের ক্যাফে বা বারের আমোদ-প্রমোদই জয়লাভ করবে—অন্ততঃ এই কলকাতা শহরে।

যদি তার তুলনা চান তাহলে একটু বেশীরাত্রে চৌরঙ্গীর পথে চলে যান। নিস্তব্ধ রাত্রে একটু ভাল করে কান সজাগ করুন তাহালে শুনতে পাবেন কোন ক্যাফেটারিয়া অথবা বারের ভেতর থেকে ভেসে আসছে ব্যাণ্ড বাজনার সাথে নেশাড়ী কোন মেয়ের জড়িত কণ্ঠে গান: টা-টা-টা······হাউ ডু ইউ ডু······আই লভ ইউ······টা-টা-টা ডুম ডুম ডুম। সঙ্গে পাবেন ব্যাণ্ড বাজনার তালে হিল তোলা জুতোর খটাখট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসধ্বনি। হাসি। বীয়ারের বোতলের সাথে গেলাসে ঠোকাঠুকি।

অতীতের কথা মনে এলে শুধু দুঃখই বাড়ে, আর স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

তবু নতুনের আবির্ভাব আশীর্বাদস্বরূপ। তা বহন করে নিয়ে আসে চোখের বিস্ময়কর তৃপ্তি। সেই তৃপ্তিই অতীতের স্মৃতি ভুলিয়ে দেয়। মানুষ যেমন শৈশব থেকে যৌবন তারপর প্রৌঢ়ত্ব পেলে হয়ে যায়। তেমনি পৃথিবীর এই বিবর্তন আবর্তের সৃষ্টি করে অতীত থেকে বর্তমান আবার বর্তমান হইতে অতীতে চলে যায়।

আরো যদি খুলে বলা যায়, তাহলে নতুনের সাথে কোন রূপসী, সুন্দরী, তন্বী মেয়ের কল্পনা করুন। সেই কন্যার রূপে একদিন বিশ্ববাসী মুগ্ধ হল। তার রূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত, সূর্যের রশ্মির মতো দিগন্ত বিস্তৃত করলো। তারপর সেই কন্যা যখন প্রৌঢ়ত্বের ধাপে এসে দাঁড়ালো! হায় তখন সেই লোলচর্ম, পলিতকেশ সর্বস্ব প্রৌঢ়ার অতীতই সম্বল হল। দীর্ঘশ্বাস আর নতুনের প্রতি একটা অহেতুক বিষোৎগার!

অবশ্য এ উপমা সেই পুরোনো কলকাতা সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কলকাতা আজও চির নতুন। বরং আরো দিনের পর দিন তার দেহে যে অলঙ্কারের সম্ভার সজ্জিত হচ্ছে, তাতে অতীতের সেই সাদামাটা রূপ আরো উন্নত হচ্ছে। তাই আজকের কলকাতাকে আপনি সব সময় দেখছেন, তার লিখিত বর্ণনা আপনার কৌতূহল স্তিমিত করবে, তাই অতীতে ফিরে যাওয়াই ভাল।

যা আপনি জানেন না, বা অল্প জানেন, তাই বিস্তৃতভাবে আপনাকে জানিয়ে ধোঁকা দেওয়া যেতে পারে বলেই এই রচনার প্রস্তাবনা।

অতীতে চলে যাবার আগে তবু একটু একালের ইতিহাস না বলে পারছি না, যেমন এখন আমরা স্বাধীনরাজ্যে বাস করি। এ শহর গড়ে ওঠার পর কোনদিন কি আমরা স্বাধীন ছিলাম? এখন পরাধীনতার দুঃখ ভুলে আমরা এই শহরে যতত্র ঘুরে বেড়াই। এও আমাদের কাছে কল্পনা ছিল।

তার ওপর ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধ, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ,

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ খণ্ডন ও স্বাধীনতা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পর রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শাসন ও বৃটিশ সরকারের উৎপত্তি হয়েছিল ঐ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর। সেই ভারতবর্ষ দু'শ বৎসর পর ১৯৪৭ সালে বিদেশী শাসন মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পেল। আর সেই স্বাধীন ভারতে দুই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হল, হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান। যাকে খণ্ডন করে তারই ক্রোড়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতে লাগলাম। আর তারও জের এই বর্তমান পর্যন্ত। আর বলা নয়। এবার আপনি পর পর সাজিয়ে নিন্।

এখন আমার বক্তব্য : লালদীঘি ও সেদিনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। যে কোম্পানী সামান্য ব্যবসায়ী খাতিরে এদেশে এসেছিল। ব্যবসা করবার হুকুম আদায় করতে করতে একদিন রাজত্ব করবার সুযোগ পেয়ে গেল। এ কথা অবশ্য কোম্পানী কখনও ভাবে নি, যখন লণ্ডন থেকে পাড়ি দিয়েছিল, তখন কি ভেবেছিল যে এই যাত্রাই একদিন সৌভাগ্য বহন করে আনবে? বৃটিশ সরকারের সেদিনের ভাগ্য বড়ই সুপ্রসন্ন ছিল। শুধু তারা ভারতবর্ষই জয় করেনি, করেছিল দুনিয়ার বহু স্থানই। সেদিনের মানচিত্র খুললে শুধু লালচিহ্নই চোখে পড়বে।

এই লালচিহ্ন নিয়েই আমার কিছু বক্তব্য।

গোলাপ ফুল লাল। লাল বলে তার সৌন্দর্য সর্ব-জনবিদিত বা শিশু প্রথম লাল রঙের দ্রব্যসামগ্রী পছন্দ করে বলে এই লালের সমাদর। অবশ্য লালের একটা ভিন্ন সমাদর আছে সে স্বীকার করতে হবে। তবু প্রশ্ন উদয় হয়, ইংরেজরা কেন লালকে প্রতীক চিহ্ন করলো? তাদের গায়ের রঙ লাল বলে কি? নাকি হঠাৎ শিশুর মত আকর্ষণীয় হবে বলে লালকে তারা আঁকড়ে ধরলো।

অবশ্য এ প্রশ্ন পুরোনো দিনের। আজ আর লাল দেখিয়ে ইংরেজরা রক্তচক্ষু দেখাতে পারবে না, তবু সেদিনের সেই লালপণ্টনের কথা মনে এলে জীবের তালু শুকিয়ে যায়।

এই কলকাতার লালদীঘি সেই লালপণ্টনদেরই সৃষ্টি। লালদীঘি, লালবাজার ও লালরাস্তা, পাশাপাশি আছে। এখনও তাদের উপস্থিতি সগৌরবে ঘোষিত। লালদীঘি অনেক স্মৃতি হারিয়ে আজ মৌন হয়ে স্তব্ধতার প্রহর গণনা করছে। লালবাজার আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে আরো উন্নত। এখন লালবাজারের পুলিশ ফাঁড়িতে অনেক গুঞ্জন। আর

লালরাস্তার তো কথাই নেই। যাদের গাড়ী আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করুন, রেড রোডের পথ দিয়ে গাড়ী চালাতে কি আরাম? আরো আছে, দিল্লীতে লাল কেল্লা; রেড ফোর্ড—তবে তার কথা এখানে থাক্।

এখন প্রশ্ন হল, এই লালদীঘি কোম্পানীর আমলের না, আরো আগের। আর তার নামকরণ কেমন করে হল? অবশ্য এ সম্বন্ধে অনেক মতান্তর আছে। লোকে বলে, শ্যাম রায় এখানে এসে দোল খেলতো বলে এই দীঘির ঐ রকম নাম হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে লালবাজার ও লাল-রাস্তার নাম!

তবে এ কথা ঠিক, এবং বিশ্বাসযোগ্য যে, এই লালদীঘির ধারেই প্রথম দুর্গ করেছিল ইংরেজরা। আজকের জেনারেল পোষ্টাপিস ভুলে যান, তাহলেই সেখানে পুরাতন দুর্গ হুগলী নদী পর্যন্ত দেখতে পাবেন।

অবশ্য দুর্গ করার আগের কাহিনী আরও চমকপ্রদ।

ইংরেজরা প্রথম কলকাতায় এসে কোথাও স্থায়ী ভাবে বসবাসের হুকুম পায় নি। কলকাতা কৌন্সিলের প্রথম অধিবেশনের মন্তব্যে এরূপ উল্লেখ আছে যে, ইংরেজরা যে পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ঘর করবার অনুমতি না পায়, ততদিন অস্থায়ী চালা মাটির ঘরে মালপত্তর রাখবে ও তাঁবুতে বা জাহাজে বাস করবে। তাও সেই এই লালদীঘির কাছে হুগলী নদীর কিনারে। তখন কোথায় ছিল পুরাতন দুর্গ?

তারপর তারা সেরেস্তার কাগজপত্র রাখবার জন্যে এই লালদীঘির ধারে জমিদারদের কাছারি বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছিল। এই কাছারি বাড়ীটি ছিল জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের।

এই কাছারি বাড়িকে কেন্দ্র করে একটি চমৎকার গল্প আছে।

ঘটনাটা ঘটে ১৭০৭ সালের মধ্যে। তখন লালদীঘি ছিল একটি মাঝারি ধরণের পুষ্করিণী মাত্র। পুষ্করিণীটি মজুমদারদের কাছারিবাড়ীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিখ্যাত দেববিগ্রহ শ্যাম রায় কালীঘাটে চলে গেলেও এখানে আসতেন প্রতি বছর দোলের সময়। এখানে এই লালদীঘির পাড়ে দোল না খেললে নাকি তার খেলা ঠিক যুৎসই হত না। তাই প্রতি বছর এই লালদীঘির জল লাল করে শ্যাম রায় পুরনারীদের সঙ্গে দোল খেলতেন।

সে এক মহা এলাহি কাণ্ড হত। তখনকার দিনের এই দোলখেলা নিয়ে কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলে খুব সোরগোল পড়ে যেতো। দলে দলে লোক আসতো বনজঙ্গল পার হয়ে বহু দূর দূর গ্রাম থেকে। কেউ আসতো

দোল-রঙ্গ দেখতে, কেউ আবার লালদীঘির পারে শ্যাম রায়ের পূজারিণীদের সাথে দোল খেলতে শুরু করে দিত। রুধীর রাঙ্গা আবীরে আবীরে চতুর্দিক ভরে উঠতো লালদীঘির পাড়। একদিনের কলহাস্যে ও হাসিঠাট্টায় সারা বছরের আনন্দ সঞ্চিত হত। সবাই এ দিনটিতে উপলক্ষ্য করে চলে আসতো লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারিবাড়ীর মধ্যে।

ঘটনাটা যেবারে ঘটে, সেবারে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের কাছারিবাড়িতে দোল। শ্যাম রায় এসেছেন কালীঘাট থেকে দোল খেলতে। চারদিক জমিয়ে খুব দোল খেলা হচ্ছিল। আবীরের রঙে নর-নারীরা রঙীন হয়ে উঠেছিল। চারদিক মুখরিত কলকাকলীতে। আবীরের রঙ বাতাসে মিশে বাতাসকেই রঙীন করে তুলছিল। এই সব দেখে ইংরেজরা কেমন যেন একটু কৌতুক অনুভব করলো। ওরা ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে রঙ মাখবার জন্যে কাছারি বাড়ীতে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো। আর যায় কোথা? ইংরেজ দেখে সব স্তব্ধ। নিমেষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো চলন্ত উৎসব।

বেরিয়ে এলেন হঠাৎ দেউড়ি থেকে মজুমদারদের আম-মোক্তার এণ্টনি সাহেব। ইংরেজদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে তাঁর রক্ত মাথায় উঠে গেল। তিনি রক্তমূর্তিতে ছুটে এলেন ইংরেজদের মাঝখানে। থামিয়ে দিলেন তাদের। হুকুম দিলেন আর এক পাও তারা যেন না এগোয়। এগোলে নিশ্চিত একটা ঘোরতর বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা।

থমকে দাঁড়ালো ইংরেজ ফ্যাক্টর দল। খবর পেয়ে জব চার্ণক লাফাতে লাফাতে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই এণ্টনি সাহেবের ওপর দারুণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলেন, হাতে ছিল তাঁর ঘোড়ার চাবুক। তিনি তারই সাহায্যে এণ্টনি সাহেবকে দারুণভাবে প্রহার করতে লাগলেন।

লোকে লোকারণ্য কাছারি বাড়ী। দোল-রঙ্গ উৎসব থেমে গেল। এ পাশে উৎসব বাড়ীর লোক আর ওপাশে সেই ইংরেজ দল! তারই মাঝখানে সবার সামনে এণ্টনি সাহেব যেন চাবুকের আঘাতের চেয়ে অপমানিত হলেন ভীষণ। তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না—একজন বিদেশী আর একজন বিদেশীর সঙ্গে কি করে এমন ব্যবহার করতে পারে!

চার্ণক তাঁর দলবল নিয়ে বীরদর্পে কাছারি বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, আর আম-মোক্তার এণ্টনি সাহেব যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহ নিয়ে ছুটে কাছারি বাড়ীর কোন একটি ঘরের মধ্যে গিয়ে নিজেকে লজ্জার হাত থেকে লুকোলেন।

কয়েকটি দিন এমনি করে কেটে গেল। কিন্তু কিছুতে ভুলতে পারলেন না সেই অপমান। চোখের জল কিছুতে থামাতে পারলেন না আম-মোক্তার পর্তুগীজ এণ্টনি সাহেব।

সেই অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এণ্টনি সাহেব মজুমদারের অধিকৃত জমিদারীর মধ্যে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বাকী দিন কটি গিয়ে থাকলেন, আর তিনি এ অঞ্চলে ফেরেন নি। আর তিনি তার কলঙ্কিত মুখ নিয়ে এই সহর কলকাতায় আসেন নি। আসেননি আর কোনদিন জব চার্ণকের সামনে। স্বার্থ সন্ধানী জব চার্ণকের স্বার্থের বলি হতে আর কোনদিন তার সাথে মোলাকাত করেন নি।

এণ্টনি সাহেব শুধু একটি কথারই উত্তর পান নি—'একজন বিদেশী আর একজন বিদেশীকে কি করে এমন করে আঘাত করতে পারলো!'

এই এণ্টনি সাহেবই বিখ্যাত কবিওয়ালা এণ্টনি সাহেবের ঠাকুর্দা!

এই গল্পের পরিণতি শুধু মানসিক দ্বন্দ্বেই শেষ হয়নি। এর জের অনেকদূর গড়িয়েছিল। সাবর্ণ চৌধুরীরা তাঁদের আম-মোক্তারের অপমান হজম ভিন্ন তখন আর অন্যোপায় দেখলেন না। এদিকে হুগলীর ব্যাপারে মুসলমান কর্তৃপক্ষরাও ইংরেজদের শায়েস্তা করতে পারলেন না। তারা অবাধে বাণিজ্য চালিয়ে যেতে লাগলো, সেই ভেবে ভবিষ্যতের বিবাদ বিসম্বাদের ভয়ে চৌধুরীরা জমিদারী স্বত্ব বিক্রয় করতে প্রস্তুত হলেন।

কোম্পানীও প্রস্তুত। তারা খরিদ করবার অনুমতি লাভের জন্যে মুসলমান সুবেদারদের কুড়ি হাজার টাকা মূল্য বাবদ দিল। কিন্তু এ মূল্য জমিদারের কাগজপত্রে উল্লিখিত ছিল না। তাঁরা বিক্রয় মূল্য বাবদ পেয়েছিলেন মোট তেরশ' টাকা।

ইংরেজরা ৯ই নভেম্বর ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কলকাতাকে নিয়ে কখানি গ্রাম কিনেছিল। তার একটি দলিল বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার, তাহলে এণ্টনি সাহেবের সঙ্গে জব চার্ণকের সংঘর্ষ পূর্বকথিত ১৭০৭ সালে হয় নি। সময়ের এই যে গরমিল, তার জন্যে দায়ী ঐতিহাসিকরা।

সালের গরমিলে আরো দৃষ্টিগোচর হয়, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মিঃ র‍্যালফ্ শেল্‌ডন্ কলকতার প্রথম কলেক্টর হয়ে জমিবিলি আরম্ভ করেছিলেন। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মুসলমান শাসনকর্তাকে তাদের খরিদ জমিদারীর খাজনা বারশ' টাকা দিয়েছিল। প্রথমে কোন লাভ হয় নি, কিন্তু চার বৎসরের

মধ্যে ৪৮০৲ টাকা লাভ হয়েছিল ও ক্রমশঃ উত্তরোত্তর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ১৩০০৲ টাকা হয়। ন' বৎসরে দেখা যায় যে, যত টাকা খরিদ তত টাকা লাভ। শাহাজাদা আজিমউশ্বান বঙ্গদেশ থেকে যত অর্থাদি সংগ্রহ করেছিলেন, সেরূপ আর কোন মুসলমান শাসন-কর্তাই পারেননি। তিনিই ইংরেজদের কাছ থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে বিক্রয় করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তখন মুর্শিদকুলী খাঁ নবাবী গদিতে ও দিল্লীর সিংহাসনে ঔরঙ্গজেব। ঔরঙ্গজেব বিরক্ত হয়ে কোম্পানীকে অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁ দেন নি। তাঁর অমতেই এই কাজ হয়েছিল।

আরো একটি গ্রন্থ জানাচ্ছে যে ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে মতান্তর এইজন্যে যে, কোম্পানী জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের আগে কি দুর্গ নির্মাণ করেছিল?

যাই হক, ইংলণ্ডের প্রাচীনকালের 'ফিউড্যাল' দুর্গসমূহের মত এই দুর্গের নির্মাণ। স্যার জন গোলড্‌স্‌বরো ডিহি কলকাতার এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন। এই স্থান নির্বাচন করবার আরো একটি সুবিধে তখন উত্তরে খাদ্যসামগ্রীর জন্যে বড়বাজার তৈরী হয়ে গেছে।

আরো একটি গ্রন্থ উল্লেখ করছেন, ১৭১১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কলিকাতায় মণ্ডীবাজার ও সন্তোষ বাজারের নাম মাত্র পাওয়া যায় তৎপরে বড়বাজার ও লালবাজারের নাম পাওয়া যায়।' তাই যদি হবে, তবে দুর্গ নির্মাণের পূবে তখন কোথায় ছিল বড়বাজার ও লালবাজার? এই সূত্রে বলে নেওয়া দরকার, তাহলে লালবাজার পুলিশ ফাঁড়ির জন্যেই বিখ্যাত নয়, সেখানে একটি কেনাকাটার বাজারও ছিল!

যাই হক, কোম্পানীর জমিদারীতে প্রথম নাকি রাজারাম মল্লিক বিনা খাজনায় বড়বাজারের জমি জায়গায় ঘরবাড়ী ও বাজার করতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য অল্প খাজনায় জমিজমা বিলি আরম্ভ হয়।

১৭০৯ খৃষ্টাব্দে লালদীঘির উত্তরে কলকাতার প্রথম গির্জা সেণ্টএন্‌ নির্মিত হয়েছিল। লালবাজারের পাশে উমিচাঁদের বাগানবাড়ী হয় ও অন্যান্যের সঙ্গে ইংরেজরা ঐ অংশে আমোদপ্রমোদে মত্ত হয়।

ঐ বছরই লালদীঘির মিঠা পানির সুখ্যাতি ছড়ায় এবং সেই জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করা হয়। সে সময় কোম্পানীর সাহেবদের বড়ই দুরবস্থা। অস্বাস্থ্যকর জায়গা। রোগের প্রাদুর্ভাব। চতুর্দিকে জঙ্গলে ভর্তি। বাঘ, কুমীর, রাত্রে মশা তার ওপর খাদ্যহীন দেশ। সে এক প্রচণ্ড দুঃসময় গেছে

কোম্পানীর। দুর্গ তৈরী করলে কি হবে, তার মধ্যে ভাল পানীয় জল কোথায়? দুর্গে হাসপাতাল হয়েছিল, তবে হাসপাতালে ডাক্তার ওষুধ ছিল না। তখন এ সহরে অসুখও যেমন বেশী, ডাক্তার, ওষুধ তেমন ছিল না।

সেই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হঠাৎ সেই লালদীঘির আবিষ্কার যেন কোম্পানীর কর্মচারীদের হাতে স্বর্গ এলো। শুধু দীঘির জলই সুস্বাদু নয়, তার চতুর্দিকের পরিবেশও মনোরম।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণী পরিষ্কার হয়ে গেল। পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে ফুল ও ফলের বৃক্ষাদি রোপণ করে শোভা সন্দর্শন হল। কমলালেবুর গাছ লাগানো হল। শাক-সব্জীর গাছ ও ফুলের গাছ লাগিয়ে কঙ্করমণ্ডিত পথ তৈরী হয়ে গেল। আর তার নাম দেওয়া হল, Green before the Fort। কিন্তু লালদীঘি নাম কবে হয়েছিল তার কোন ইতিহাস নেই!

সুমিষ্ট পানীয় জল, পুকুরের মাছ গাছের ফল প্রচুর পরিমাণে ফোর্টের লোকের চাহিদা মেটাতে লাগলো। তারপর তো আছেই বেড়ানোর জন্য সুন্দর সাজানো কুঞ্জবন। তখনকার দিনে ইংরেজের কাছে এই লালদীঘি ও তার বাগান যেন একটি স্বর্গ হয়ে উঠলো।

আর সাধারণ লোকেরা শুধু হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। লালদীঘির সুন্দরী দেহ স্পর্শ করবার কোন অধিকারই তাদের ছিল না। তখন কোথায় ছিল ইডেন-উদ্যান আর বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই লালদীঘি নিয়মিত পরিষ্কারের জন্য মাসিক একটা বরাদ্দ ঠিক হয়েছিল। তার মধ্যে বাগানটি পরিষ্কার রাখার জন্য দশ টাকা, শোভা বর্ধনের জন্য চৌত্রিশ টাকা ও পঙ্কোদ্ধার ও শৈবালাদি পরিষ্কারের জন্য কুড়ি টাকা।

লালদীঘি তারপর থেকে যেন ইংরেজদেরই চিরকালের সম্পত্তি হয়ে উঠলো। ওর ধারে কাছে কেউ গেলে বন্দুকের গুতোর ভয় থাকতো। সর্বদা সৈনিক টহল দিত লালদীঘিকে বেষ্টন করে।

মনে হয়, এই সময়ই ঐ বিখ্যাত দীঘির নাম হয়েছিল, লালদীঘি। তবে শ্যাম রায় দোল খেলতে এলে এর জল লাল হত বলে তার নামকরণ ঐ রকম হওয়াও সম্ভব। তবে ইংরেজরা লালের পূজারী, লালদীঘিকে ভালবেসে যদি ঐ নাম দিয়ে থাকে, তাহলেও কিছু বলবার নেই।

সেই লালদীঘি আজও আছে।

ইংরেজ চলে গেছে। ভালবাসার লোক অন্তর্হিত। তাই লালদীঘি আজ সৌন্দর্য হারিয়ে পথিকের কৃপা কুড়িয়ে চলেছে।

এই স্মৃতিময় দীঘির জীবনের আর একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। আর সেটি লিপিবদ্ধ না করলে এই বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ সেই উল্লেখযোগ্য বছর। বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে যুদ্ধসাজ পরে সংগে অগণিত সৈন্য নিয়ে এই লালদিঘীর পাড়ে এসে ইংরেজ দুর্গ আক্রমণ করেছিলেন। সেদিন এই লালদীঘি শুধু গোলাবারুদের তীর্থক্ষেত্র হয়েছিল আর মানুষ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আর্তনাদ করে এই দীঘির জলে মুখ লুকাতে চেষ্টা করেছিল।

তখন ফোর্টের তত্বাবধানে গবর্ণর জেনারেল ডেক সাহেব। সঙ্গে ছিলেন কাপ্তেন গ্রাণ্ট, সেনাপতি মিনাচন ও হলওয়েল। হঠাৎ একদিন অতর্কিতে সিরাজ তাঁর দলবল নিয়ে আক্রমণ করলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ঐ ফোর্ট। ইংরেজের যা-কিছু সঞ্চিত ধনসম্পত্তি সব ঐ ফোর্টের মধ্যে। তুমুল যুদ্ধ সুরু হল। আর সে যুদ্ধক্ষেত্রে সৃষ্টি হল প্রধানতঃ এই লালদীঘির চারিদিক ঘিরে। তখন এই লালদীঘির চারদিকে এত বাড়ীঘর ছিল না। যে কটি বাড়ী তখন উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজরা কামান দাগার অসুবিধার জন্য তাও ভূমিসাৎ করে দিল। লালদীঘির চতুর্দিকে কয়েকটি তোপমঞ্চ তৈরী হ'ল, সেই তোপখানা থেকে নবাব সৈন্য বিতারনের জন্য মুহুর্মুহু কামানের গোলাবর্ষণ চললো। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় সারা কলকাতা ছেয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দের ঐক্যতানে আর মানুষের মরণ আর্তনাদে চারদিক মুখরিত হয়ে উঠলো।

আজকের এই কলকাতায় লালদীঘির পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একবার সেই অতীতের সিরাজ আক্রমণের মুহূর্তটিতে চলে যান। তাহলে দেখতে পাবেন, সেদিন সেই সুরম্য উদ্যানক্ষেত্র বিধ্বস্ত হয়ে দামামা বাজছে। দুই দলের তোপমঞ্চ থেকে বড় বড় কামানের গোলা এসে এই লালদীঘির উদ্যানক্ষেত্র অগ্নি-উৎসব সুরু করেছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের উৎসব চালিয়ে সিরাজ জিতে নিয়েছিলেন কলকাতা সহর। গবর্ণর ডেক সাহেব প্রাণ ভয়ে পালালেন। নবাব পুরনো ফোর্ট অধিকার করলেন। ইংরেজরা কলকাতায় পালালো।

তারপরের কাহিনীর জন্যে অবশ্য ভিন্ন ইতিহাস সাক্ষ্য। এখানে শুধু বলা যায়, পরবর্তী ষড়যন্ত্র অন্ধরূপ হত্যার কাহিনী। আর স্বনামধন্য হলওয়েল সাহেব এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে বিশ্ববাসীকে চমকিত করেছিলেন।

তিনি করেছিলেন, যা নাকি মানুষের আচরণের বাইরে। অকল্পিত। হলওয়েলের বর্ণিত কাহিনীতে বিশ্ববাসী শিউরে উঠেছিল।

যাই হক, পরে অবশ্য এ কাহিনী মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

সিরাজ তবু বিশ্ববাসীর চোখে জিজ্ঞাসাই রয়ে গেলেন। সিরাজ এই কলকাতা জয় করে তার নাম দিয়েছিলেন 'আলিনগর'। পরে ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফরের গোপন চুক্তির বলে এই নাম অপসারিত হয়েছিল। এখন অবশ্য তার অপভ্রংশ আলিপুর নাম ধারণ করে আছে।

বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব ম্যাগাজিন
১৯৬৩-৬৪ দ্বিতীয় সংখ্যা

গ্রন্থ-তালিকা

[রাজনারায়ণের কলকাতার নিবন্ধগুলি লিখতে গিয়ে যে সব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]

কলিকাতার সেকালের একালের কথা—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার কথা—প্রমথনাথ মল্লিক

সিরাজউদ্দৌলা—অক্ষয়কুমার মৈত্র

কলিকাতার ইতিহাস—রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী

কালীক্ষেত্র দীপিকা

বাজারের লড়াই—শিশিরকুমার ঘোষ

বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়

বিশ্বকোষ—

সংবাদপত্রের সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ কৌমুদী—

Calcutta Old and New—H. E. A. Cotton
Echoes from Old Calcutta—Dr. Busteed
Good old days of John Company—W. H. Carey
Calcutta Gazette—1784 to 1823
History of Bengal—A. K. Roy
Sheriffs of Calcutta—Charles Moore
Hartly House—Miss Goldbourne
Early Annals of the English in Bengal—C. R. Wilson
Census of India—Vol. VII
Englishman Patrika—1873, 1879, 1880
Municipal Calcutta—S. W. Goode
Calcutta Review—18 Vol. in 1852
Souvenir, India Government Mint, Alipore Impey's Memoirs
One hundred and Seventy five years at the old Mission Church—Edited by—Rev. G. F. Westcott
Imperial Gazetteer—Hunter
Annal of the college of Fort William Robinson —Roebuch

The Trade of the East Indian Company—F. P.
History of the Military Transaction of the British Nation in Indostan—Orme
History of Bengal—Stewart
History of Calcutta—A. K. Roy.
Memoirs of a young Civilian in Bengal (1805)
Memoirs of the Supreme Court—H. E. A. Cotton
Old Calcutta Cameos—B. V. Roy.

ভ্রম-সংশোধন

আইন ও আদালত : কলকাতা শিরোনামায় পড়তে হবে সেদিনের আইন ও আদালত। পৃষ্ঠা ৯।

কলকাতার নাম ছিল আলিনগর লেখাটি দু ভাগে ছাপা হয়েছে। আলিনগর না কলকাতা সেটি একভাগে পড়তে হবে। পৃষ্ঠা ৩৯ ও ৪২

শ্যামরায়ের দোল উৎসবে এণ্টনি চার্ণকের সংঘর্ষ দু ভাগে ছাপা হয়েছে। পরের ভাগটি শ্যামরায়ের দোল উৎসবে এণ্টনি। একসঙ্গে পড়তে হবে। পৃষ্ঠা ৬১ ও ৬৪

কড়ি নিবন্ধের প্রথম শুরুর এক লাইন 'এখন নয়া পয়সার যুগ। রূপোর টাকার বদলে কাগজের নোট।' ৮৪ পৃষ্ঠায় ভুলবশত ছাপা হয়েছে, এটি পড়তে হবে কড়ির শুরুতে। পৃষ্ঠা ৮৫।

'রাইটারদের রাইটাস' বিল্ডিং' নিবন্ধে পড়তে হবে, 'এত করেও কিন্তু সেকালের উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির রাইটারদের কামপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি করা গেল না। কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য নারী-প্রীতি এত বেড়ে গিয়েছিল যে তাঁদের কথা আজ ভাবলেও ভয়ে আঁতকে উঠতে হয়।' পৃষ্ঠা ১০৩।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের বেতনের টাকা বর্তমানের নয়া পয়সায় ছাপা হয়েছে, সেটি সিক্কা টাকা হিসাবে পরতে হবে। পৃষ্ঠা ১০৪

প্রেমে পড়লে জবচার্ণক নয়, প্রেমে পড়লেন জবচার্ণক। পৃষ্ঠা ১৩৭।

বিঃ দ্রঃ প্রতিটি নিবন্ধই যে কোন পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে : গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় অসাবধানতা বশত কোন কোন নিবন্ধের শেষে পত্রিকার নাম ছাপা হয় নাই বা কোন নিবন্ধের শেষে পত্রিকার নাম ছাপা হয়েছে, কবে ছাপা হয়েছে, তার তারিখ নেই। এই ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনীয়।

সম্পাদিকা

আমাদের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

গরীবি হঠাও—বরুণ সেন	১৫।০০
কালো টাকা—বরুণ সেন	১০।০০
চট্টগ্রাম একাত্তর—বরুণ সেন	১২।০০
সমুদ্রের চোখ—সমরজিৎ কর	১২।০০
পদ্মা আমার মা গঙ্গা আমার মা—চিরঞ্জীব	১২।০০
খেলাধূলার নেপথ্যে—চিরঞ্জীব	১০।০০
হেড লাইন—চিরঞ্জীব সেন	১২।০০
বাবু গৌরবের কলকাতা—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬।০০
ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে—বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	১৩।০০
মানবতাবাদ ও সমাজচেতনার ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক —বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২০।০০
জয়প্রকাশ—নিশীথ দে	৬।০০